পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস

(প্রথম ভাগ)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—সেপ্টেম্বর ১৯৭০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

প্রকাশক : স্বামী প্রশান্তানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

মুদ্রক : শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানস-পুত্র

'রাজা মহারাজ'

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের

পুণ্য-পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

'পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস' (প্রথম ভাগ)

অর্পিত হোল।

॥ ভূমিকা ॥

'পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস' তথা 'বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস' (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হোল। তিনটি ভাগে বা খণ্ডে এ'পুস্তক প্রকাশিত হবে। প্রথম ভাগ পরবর্তী দুটি ভাগের পরিপূরক ও দিকদর্শক। পরবর্তী দুটি ভাগে পদাবলীকীর্তনের সাহিত্য, দর্শনতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, বস্তুতত্ত্ব, পালাগান ও পালা-বিভাগ ও তাদের পিছনে মনোবৈজ্ঞানিকী নীতি, রাগ, তাল, আখরবৈশিষ্ট্য প্রভৃতির আলোচনা থাকবে। মোটামুটি পদাবলীকীর্তন-সম্পর্কে সকল বিষয়বস্তুর আলোচনা স্থান পাবে।

'পদাবলীকীর্তন' শুধুই ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গীত-জগতে একটি অনবদ্য ও অনন্যসাধারণ দান। কীর্তনের সাহিত্যসম্পদ তথা পদের রসায়িত ব্রজবুলি ভাষা ও ছন্দায়িত রচনা বিশ্বের সমাজে অননুকরণীয়। রস, ভাব ও ছন্দের তা ত্রিবেণীধারা। পদাবলীকীর্তন বাঙালীমাত্রের ও ভারতের সঙ্গীত-সাধকমাত্রেরই আদরের বস্তু। দক্ষিণ-ভারতে ও মহারাষ্ট্রে ভক্তিভাবনিঃস্রাত পদকীর্তনের প্রচলন থাকলেও শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণ-প্রতিপাদিত বৈষ্ণবদর্শনতত্ত্বের সহযোগে বাঙলাদেশে বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের রূপ, বিশেষ শৈলী ও বিকাশ অননুকরণীয় ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে—যার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে মেলে না। উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতপদ্ধতিতে তালের যে বিকাশ, কিংবা দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গীতপদ্ধতিতে বিচিত্র তালের যে অনুশীলন এখনও বর্তমান আছে, বাঙলার বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনে তালের বিকাশ তাদের চেয়ে অনেক বেশী ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাঙলার পদাবলীকীর্তন 'ক্ল্যাসিকাল' সঙ্গীতপদ্ধতির অন্যতম। প্রাণবান ও রসায়িত এই সঙ্গীত। দুঃখের বিষয়, অভিজাত ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের যাঁরা ধারক ও সাধক, তাঁদের দৃষ্টি এখনও বাঙলার এই নিজস্ব সম্পদ ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট নয়। এ' সকলের বেলায় দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গীতজ্ঞানী ও সঙ্গীত-শিল্পীদের জাতীয় সম্পদ ও নিজস্ব অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টির নিদর্শনের আমরা প্রশংসা করি। রসানুভূতিই সঙ্গীতের প্রাণবস্তু। বাঙলার পদাবলীকীর্তনে অনবদ্য ও অপার্থিব রসের আস্বাদন

সহজেই পাওয়া যায় এবং তারই জন্য বৈষ্ণবশিরোমণি ঠাকুর নরোত্তমদাস পদাবলীকীর্তনকে 'রসকীর্তন' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাছাড়া অসাম্প্রদায়িক উদারতা সর্বজনসমাদৃত হলেও বিশ্বের প্রতিটি জাতি তাঁর সাজাত্যবোধ ও জাতীয় সমৃদ্ধিরূপ শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি একান্ত নিষ্ঠাকে নিয়েই বিশ্বের দরবারে গৌরব ও সমাদরের আসন লাভ করে, জাতীয়তাকে ও জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতিকে অবমাননা কিংবা অনাদর ক'রে তা পাওয়া যায় না। তাই ভারতের ও বিশেষ করে বাঙলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পসম্পদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান রেখে সংস্কৃতিসেবী মনীষীরা বাঙলার পদাবলীকীর্তনের মান ও মাধুর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবেন আশা করি।

পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস-রচনার পিছনে যাঁরা বিশেষভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের আমি শ্রদ্ধাবনতি জানাই। আমার গুরুভ্রাতা, শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ. এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ ভাগ দেখে দিয়ে সাহায্য করায় আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। প্রকাশক স্বামী প্রশান্তানন্দকে আমি ধন্যবাদ জানাই তাঁর সর্বপ্রকারে সহায়তার জন্য। এই গ্রন্থের প্রুফ প্রভৃতি দেখে দিয়ে ও নানাভাবে সাহায্য ক'রেছে আমার স্নেহভাজন শ্রীদেবাশীষ হোড়, আমি তাকে স্নেহাশির্বাদ জানাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পুস্তক-বিভাগ গ্রন্থটি প্রকাশ ক'রে বাঙলাদেশের অমূল্য সম্পদকে সংস্কৃতিবান সকল মানুষের নিকট উপস্থাপন করার সুযোগ দান করায় আমি মঠের কর্তৃপক্ষদের নিকট কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পুস্তক-প্রকাশন-ভাণ্ডারে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য সংস্কৃতিসম্পন্ন গ্রন্থের মুদ্রনে ও প্রকাশে ব্যয়িত হবে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিষয় পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট



॥ পূর্বাভাস ॥

বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তন নদীমাতৃকা সুজলা সফলা বাঙলাদেশের হৃদয় তন্ত্রীর সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাঙলার পদাবলীকীর্তন বাঙালী-জাতির রসভাবসম্পৃক্ত হৃদয়াবেগ ও নিবিড় অন্তরানুভূতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। রসভাবসমৃদ্ধ ব্রজবুলিভাষা যেদিন বাঙলার বৈষ্ণব-পদাবলীসাহিত্যের সবল সাবলীল বহিরাবরণ বা অলঙ্করণ সৃষ্টি ক'রে ভাববিদগ্ধ প্রেরণা বৃহত্তর বাঙলার জনগণের অন্তরে সচল প্রবাহ এনে দিয়েছিল, শাস্ত্রীয় রাগ, তাল ও বিচিত্র ছন্দের সম্ভার নিয়ে পরমনায়ক ও পরমনায়িকা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার অপার্থিব মধুর চরিত্র বাঙালীজাতির চিত্তকে যেদিন মথিত ও উদ্বেলিত করেছিল ও বাঙলার প্রেমের অবতার সর্বভাবঘনমূর্তি শ্রীচৈতন্যের নামকীর্তন বাঙলাদেশের আবালবৃদ্ধবণিতার মনকে যেদিন রসাস্বাদনে নিবিষ্ট ক'রে ধূলিধূসরিত পৃথিবীর বহুউর্ধে শাশ্বত আনন্দলোকে বিধৃত করেছিল, ঠিক সেদিন হতেই স্বর্গীয় পদাবলীকীর্তনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল সাহিত্য ও সঙ্গীতরসপিয়াসী বাঙালীজাতির অন্তররাজ্যে ও দিব্যভাবের সাধনা ও লীলাক্ষেত্র রচিত হয়েছিল এই বাঙলাদেশের শ্যামল বক্ষে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার বিচিত্র আখ্যান ও প্রেমলীলার কাহিনী খ্রীষ্টীয় শতকের সূচনা থেকেই প্রাকৃত লৌকিক সাহিত্য ও সঙ্গীতের সামগ্রীকে নিয়ে দক্ষিণ-দেশের আল্‌বার বা আড্‌বার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ও পশ্চিম-বাঙলার স্থানে স্থানে ভক্তিভাবসম্পৃক্ত অনুন্নত ও অশিক্ষিত বাঙালীজাতির সমাজেও যে বিকাশলাভ করেছিল তার প্রমাণের অভাব নেই।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযতীন্দ্ররামানুজদাস 'আড্‌বার' ও 'সহস্রপদাবলী' গ্রন্থে সংগৃহীত

এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য-কর্তৃক রচিত সুবৃহৎ 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত-রত্নাকর'-গ্রন্থে সংকলিত গানগুলির মধ্যে সময় বা রচনাকালের যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও বাঙলাদেশে অভিজাত রাগ ও তাল-সমন্বিত গান যে বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের সৃষ্টি ও বিকাশের বহুপূর্বেই বর্তমান ছিল তা আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষকদের অনুসারে খ্রীষ্টীয় ১ম থেকে ৫ম শতকে দক্ষিণদেশীয় আড়্‌বার-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি-'দিব্যপ্রবন্ধ' এবং পশ্চিম বাঙলার পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁশপাহাড়ী, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে সংগৃহীত ঝুমুরগানগুলির গঠনশৈলী ও প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের দানস্বরূপ 'লোকসঙ্গীত-রত্নাকর'-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত ক'রে বলি: "কালক্রমে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর লৌকিক ধারাটি বৈষ্ণব-পদাবলী দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৈষ্ণব-পদাবলীর ধারার মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যাইতে পারে নাই (নিবেদন)।" "লৌকিক প্রেমসঙ্গীত একদিন প্রচলিত ছিল, তাহাতে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বিস্তারিত হইবার ফলে রাধাকৃষ্ণের নাম গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।" "মহাজন-পদাবলী রচনার অনুকরণে এক শ্রেণীর লৌকিক পদাবলী রচিত হইয়াছিল, তাহাও ঝুমুর নামেই সাধারণভাবে পরিচিত ছিল। আদিবাসীর সঙ্গীতের নাম ঝুমুর। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের বিষয়ক লৌকিক পদাবলীর সঙ্গে আদিবাসীর ঝুমুর অন্তর ও বহির্মুখী নানা পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তাহা ঝুমুর বলিয়াই পরিচয় লাভ করিল। ক্রমে দেখিতে পাওয়া গেল, বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী রচনার যে একটি বিশিষ্ট রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাতেও বাহিরের দিক হইতে সেই রীতিকে অনুসরণ করা হইতেছে।" "এই ভাবে এই অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এক নূতন পদাবলী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল।" "ইহা বৈষ্ণব-পদাবলীর যথার্থ উত্তরাধিকারী নহে * * বৈষ্ণব-পদাবলীতে যে ব্রজবুলিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে তাহা ব্যবহৃত হয় নাই * * ।" পরিশেষে ডক্টর ভট্টাচার্য লিখেছেন: "কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র অনুযায়ী ইহা রচিত হয় নাই, সুতরাং গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ, অনুরাগ বলিতে বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র যাহা বুঝিয়াছে, ইহাতে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।"

কিন্তু সে যাই হোক, বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর) থেকে সংগৃহীত 'গৌর-চন্দ্রিকায়'—

"এসো গৌর হে, গৌর হে, গৌর হে,
তোমার ভাই নিতাইকে
সঙ্গে লয়ে একবার এসো হে।"

ইত্যাদি গানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া 'বংশীখণ্ড', 'শ্রীরাধার পূর্ববাগ', 'শ্রীবাধার অনুরাগ' 'বাসকসজ্জা', 'খণ্ডিতা' শীর্ষক ঝুমুরগানেরও উল্লেখ দেখা যায়। ঠিক সেভাবেই শ্রদ্ধেয় শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস দক্ষিণ-দেশীয় (South Indian) বৈষ্ণব-সাধকসম্প্রদায় 'আড্‌বার'-দের গানযুক্ত 'সহস্র-পদাবলী' নামে যে সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশ কবেছেন তার পরিশেষেও 'অভিসারোৎকণ্ঠা', 'অভিসাবিকা', 'মান', 'কলহান্তরিতা', 'গোষ্ঠকালীন বিরহ' প্রভৃতি পালাগান এবং মায়ুর, ববাড়ি, বিহগ্‌ড়া, বেহাগ, মল্লাব প্রভৃতি শাস্ত্রীয় রাগ এবং ডাঁসপেড়ে, জপতাল, কাটাদশকুশী, একতাল, ছুটা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কীর্তনাঙ্গ তালেব সমাবেশ দেখা যায়। অবশ্য এ'ধরনের রাগ ও তাল-সমাবেশেব পূর্বাপরসম্পর্ক উভয় গীতশ্রেণীর (বাঙলার বৈষ্ণব-পদাবলী ও দক্ষিণদেশীয় আড্‌বারদের ভক্তিপদাবলীর) মধ্যে কতটুকু ও কীভাবে আছে তা নির্ণয়সাপেক্ষ। তবে সকল বাদানুবাদ ও পরীক্ষা-নিবীক্ষাব কথা ছেড়ে দিলেও উভয় দেশের শ্রীকৃষ্ণলীলাকাহিনীর মধ্যে ভাব, রস ও মাধুর্য-উপলব্ধির নিদর্শনের অভাব নাই। বর্তমান 'পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস'-গ্রন্থে ঐ সকল-কিছুর সমাবেশ থাকবে তুলনামূলক আলোচনার শৈলী অনুসরণ ক'রে।

পরিশেষে একথা সত্য যে, বাঙলার বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তন কেবলই রসমাধুর্যপূর্ণ ছন্দায়িত রাগ ও তালের এবং সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনগানের সামগ্রীক আঙ্গিকের সমাবেশপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাব অপার্থিব প্রেমলীলা ও প্রেমাস্বাদনের রূপায়ণই সব-কিছু নয়, পরন্তু এই পদকীর্তন সাহিত্য, ছন্দ, রাগ তাল, রস ও ভাবসম্পদের সমাবেশের সঙ্গে গৌড়ীয় মহাজন ও বৈষ্ণবাচার্য-গণের রচিত গান বা কীর্তন যে অধ্যাত্মসাধনা ও রসানুভূতির অপূর্ব অবদান একথা স্বীকার করতেই হবে। সেজন্য কীর্তনপদাবলীর অপার্থিব নায়ক-নায়িকা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার বিচিত্র লীলাচরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সেই লীলাচরিত্রকে

সাধক-হৃদয়ের নিবিড় অন্তরানুভূতি দিয়ে গ্রহণ করতে হবে, সুতরাং গ্রহণ করার কাহিনীকেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবপ্রেমসাধনা ও বৈষ্ণবদর্শনতত্ত্বের মধ্য দিয়ে পদাবলীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট করার সার্থকতা অবশ্যই থাকবে। মোটকথা বাঙলার বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের রস ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবসাধক মরমিয়া মহাজনগণের ও পদকর্তাদের প্রেমনিবিড় জীবনানুভূতির দিব্যস্পর্শই পদাবলীকীর্তনের ইতিহাসকে সার্থক ক'রে তুলবে, কেননা পরম-রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানেরই নিবিড়ানুভূতির প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিধ্বনিমাত্র এই পদাবলীকীর্তন। সকল আঙ্গিক, সাহিত্য, লীলাকাহিনী এবং রাগ ও তালের সমাবেশ ইহবাহ্য, প্রেমানুভূতি ও কীর্তনের রসানুভূতিই পদাবলী-কীর্তনের প্রাণকেন্দ্র ও ইহসর্বস্ব, সুতরাং কীর্তনের ইতিহাসের পাতায় সে সকল সাক্ষ্যই বাঙলার সরস ও প্রেমনিবিড় মরমী অন্তরের পরিচয় দান করবে।



প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ কীর্তনগানের প্রসঙ্গে ॥

বাঙলাদেশের নিজস্ব সম্পদ পদাবলীকীর্তন ভারতীয় অভিজাত বা ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতধারার এক অপরিচ্ছেদ্য রূপ। এর গীতরীতি, সাহিত্য ও সুরবিকাশের পিছনে ক্রমবিকাশ ও ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারা কিভাবে লীলায়িত তা সঙ্গীত-অনুসন্ধিৎসুমাত্রেরই জানার বিষয়। বিভিন্ন শ্রেণীর পদের সংগ্রহগ্রন্থের অসচ্ছলতা নেই, প্রতিটি পদের সঙ্গে সাহিত্য, সুর, তাল ও ছন্দের সমাবেশ সুস্পষ্ট এবং সেই সমাবেশের মধ্যে তাদের পারস্পবিক সঙ্গতিও লক্ষ্য করার বিষয়। বর্তমানে বিচিত্র শৈলীর কীর্তনগান তাদের পূর্ববিকাশভঙ্গী থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন একথা যদি ধরে নেওয়া যায়, তাহলেও আসল কীর্তনগীতি-রূপের বিলাস ও সমাদর বাঙলার সমাজে আজও অব্যাহত আছে এবং চিরদিন থাকবে বলে বিশ্বাস করি। তবে সাধারণে তো বটেই, বিদগ্ধসমাজেও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কীর্তনকে আলোচনা ক'রে দেখার আগ্রহের এখনো অভাব আছে বলে মনে করি। কেননা সেভাবে আলোচনার আগ্রহ অব্যাহত থাকলে সঙ্গীত-সমীক্ষকগণের সমাজে আজ কীর্তন কোন্ জাতির বা কোন্ শ্রেণীর, অভিজাত—কি দেশী এ'ধরনের সন্দেহের অবকাশ কোনক্রমেই থাকত না।

পদাবলীকীর্তন বাঙলাদেশের নিজস্ব সম্পদ, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্মস্থান ও দেবায়তনগুলিকে কেন্দ্র ক'রে ভক্তিরসাত্মক 'কীর্তি'-গাথারূপ কীর্তনগানের প্রচলন এখনো অব্যাহত রয়েছে। বাঙলাদেশের কীর্তনের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণলীলা কথা বা কাহিনীর অনুরূপ ঐ সকল কীর্তনগানের

সাহিত্যও রসভাবসমৃদ্ধ। উৎকলে বা উড়িষ্যায়, মহারাষ্ট্রে, রাজস্থানে, মধ্য-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও দক্ষিণ-ভারতে কীর্তনগানের যথেষ্ট প্রচলন আছে। তবে বাঙলাদেশের বৈষ্ণব-পদকীর্তন বা পদাবলীকীর্তনের ধারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কীর্তনগান থেকে বেশ স্বতন্ত্র। মণিপুরে নৃত্যছন্দের সঙ্গে কীর্তনের প্রচলন আছে এবং তার সাহিত্যসম্পদও রাধাকৃষ্ণলীলামাধুর্যে রসায়িত। অনেকের অভিমতে, মণিপুরীকীর্তনের শৈলী ও উপাদান অনেক পরিমাণে ঋণী বাঙলার ঠাকুর নরোত্তমদাসের কাছে এবং তা অসম্ভবও নয় এজন্য যে, তখন বৃহত্তরবঙ্গের চতুঃসীমা ছিল অখণ্ড বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও সমগ্র আসাম ও তীবৃহুত প্রভৃতিকে নিয়ে বিস্তৃত। কিন্তু একথা সত্য যে, বর্তমান রীতির মণিপুরীকীর্তন ঠাকুর নরোত্তম-প্রবর্তিত রীতি ও রূপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে সকল দেশের কীর্তনের আবেদন যে সমান ও সর্বজনীন একথা সত্য।

বৈষ্ণব-পদাবলীকে সাধারণভাবে বলে গীতিকবিতা, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বৈষ্ণব-কবিতাকে সুরে ছড়ার মতো করে আবৃত্তি করা হয়। পদাবলী আসলে গান, গীতি বা সঙ্গীত। তাছাড়া পদের মুখ্য অর্থই গান। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'পদ'-শব্দে গান বা গীতিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব চারশো-দু'শো শতকের মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে এবং এমনকি খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথম ভাগের পঞ্চরাত্র-সংহিতা ও পুরাণ-সাহিত্যগুলিতে গান বা গীতির দ্যোতক 'পদ'-শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। রামায়ণে (বালকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ) 'বিচিত্রার্থপদং সম্যগ্‌ গায়কৌ সমচোদয়ৎ' বা 'অবগাযতাং মার্গবিধানসংপদা' শ্লোকাংশে 'পদ'-শব্দে গানকে বুঝিয়েছে। রামায়ণে পাঠ্য ও গান্ধর্ব-শব্দ-দু'টিও গান বা গীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: 'পাঠ্যে চ মধুরম্' (১।৪।৮), 'তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ' (১।৪।১০)। নাট্যশাস্ত্রে নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ কিংবা সতাল ও অতাল পদগুলি গান বা গীতি অর্থেই ব্যবহৃত। যেমন—

যৎকিঞ্চিদক্ষরকৃতং তৎসর্বং পদসংজ্ঞিতম্।
নিবদ্ধঞ্চানিবদ্ধঞ্চ তৎপদং দ্বিবিধং স্মৃতম্॥
অতালঞ্চ সতালঞ্চ দ্বিপ্রকারঞ্চ তদ্ভবেৎ।

* * *

অতালমণিবদ্ধঞ্চ পদং তু জ্ঞেয়মেব চ ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩২।২৬-২৮

অথবা— গান্ধর্বং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতালপদাত্মকম্।
পদং তস্য ভবেদ্বস্তুঃস্বরতালানুভাবকম্ ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩২।২৪

তাছাড়া আচার্য ভরত নাট্যশাস্ত্রের ২৮ অধ্যায়ে (কাশী সং) 'গান্ধর্বমিতি-বিজ্ঞেয় স্বরতালপদাশ্রয়ম্'[১] ও 'গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্'[২] শ্লোকাংশ-দুটিতেও গীতির অবয়ব বা গীতি অর্থে গ্রন্থকার 'পদ'-শব্দ ব্যবহার করেছেন। স্বর, তাল ও পদ এই তিন রকম আকারে ভরত গান্ধর্বগানের প্রকাশ ও অনুশীলন স্বীকার করেছেন ও তারি জন্য তিনি বলেছেন : 'গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ,'—যদিও পদের বিশ্লেষণ করতে গিযে তিনি পুনরায় বলেছেন : 'ব্যঞ্জনানি স্বরাবর্ণাঃ * * ছন্দো বৃত্তানি জাত্যশ্চ নিত্যং পদগতাত্মকাঃ'।

অনেকে ভরতোক্ত 'স্বরতালপদাশ্রয়ম্' শ্লোকাংশের 'পদ'-শব্দকে ছন্দায়িত নৃত্যের প্রতিফলন বলেন। কিন্তু 'পদ' অর্থে নৃত্য না বোঝানোই সঙ্গত। আর যদিই বা 'পদ' অর্থে লাক্ষণিকভাবে 'নৃত্য'-শব্দ বোঝায়, তাহলেও নৃত্য ত্রৌর্যত্রিক সঙ্গীতেরই অবিচ্ছেদ্য বা অপরিহার্য অংশ, সুতরাং 'পদ'-শব্দ গীতের অনুবর্তী বা গীতির অবয়ব অথবা গানেরই দ্যোতক। কবি কালিদাসের (খ্রীষ্টীয় ১ম-৪র্থ শতক) কাব্য ও নাটক-গ্রন্থগুলির অনেক জায়গায় 'পদ'-শব্দে গান, গীতি বা সঙ্গীত অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। মেঘদূতে (উত্তরমেঘ ৯১ শ্লোক) বিয়োগবিধুরা যক্ষপত্নী যখন বীণার তন্ত্রীতে গোত্রাঙ্কিত মূর্ছনার প্রয়োগ ক'রে আলাপ করতে উদ্যতা তখন সেই অভিচারিক প্রয়োগ নিষ্ফল হয়েছিল তাঁর চোখের জলে বীণার তন্ত্রী সিক্ত হ'য়ে। কালিদাস বীণাশব্দের প্রসঙ্গেই 'পদ'-শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তা গান, সুর বা সঙ্গীতের প্রকাশক। টীকাকার মল্লিনাথও সেকথা স্বীকার করেছেন। মেঘদূতে কালিদাসের বর্ণনা হোল,

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা।

১। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং), ২৮।৮
২। ঐ, ২৮।১২

তন্ত্রীরার্দ্রা নয়ন-সলিলৈঃ সারয়িত্বা কথংচি—
দ্ভূয়ো ভূয়ঃ স্বয়মধিকৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরয়ন্তী ॥

মল্লিনাথ টীকায় প্রকাশ করেছেন যে, গন্ধর্বকুলসম্ভূতা যক্ষপত্নী গান্ধারগ্রামের প্রযোগরহস্য অবগত ছিলেন। 'বিরচিতপদং' শব্দের বিশ্লেষণ ক'রে তাই তিনি বলেছেন :" "বিরচিতানি পদানি যস্য তত্তথোক্তং গেয়ং গানার্হং প্রবন্ধাদি। * * দেবযোনিত্বাদ্‌গান্ধারগ্রামেণ গাতুকামেত্যর্থঃ"। তাছাড়া অন্যত্র কালিদাস 'পদ'-শব্দ গান বা গীতির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন : 'ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিত-পদম্‌'। মল্লিনাথ টীকায় 'পদ' অর্থে বলেছেন 'প্রবন্ধ'[৩] বা প্রবন্ধগান বা গান।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের রচিত নাথগীতি গাথা-প্রবন্ধগানের নিদর্শন : 'আর্যা গাথাদ্বিপথকঃ'।[৪] শার্ঙ্গদেব সূঢ়, আলি বা আলিসংশ্রয় ও বিপ্রকীর্ণ এই তিন রকম প্রবন্ধের মধ্যে বর্ণ, বর্ণস্বর, তাল প্রভৃতি ভেদে আলি বা আলিসংশ্রয়-প্রবন্ধগানের রূপ চব্বিশ রকম বলেছেন : 'বর্ণাদয়স্তালার্ণবান্তাশ্চ-তুর্বিংশতিঃ'।[৫] সুতরাং মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যোগীসাধক-রচিত নাথগীতি অভিজাত প্রবন্ধগানেরই রূপ।

বাংলাসাহিত্যে পদাবলীপ্রসঙ্গে আমরা দু'রকম ধারার সন্ধান পাই : একটি অধ্যাত্মগীতি ও অপরটি নাথগীতি। নাথগীতির পর বজ্রযানী বৌদ্ধ-চর্যাপদগুলি আধ্যাত্মগীতির নিদর্শন। সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেব বলেছেন : 'অধ্যাত্মগোচরা চর্যা' (৪।২৯২)। নাথগীতির কিছুটা নিদর্শন পাই কবি জয়দেবের অষ্টপদীপ্রবন্ধে বা গীতিগোবিন্দগানে। পরবর্তী রাগাত্মিক গান, বাউল এবং কর্তাভজাদি গানও অধ্যাত্মশ্রেণীর। দাশরথি রায়ের পাঁচালী, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা এবং মধুসূদন কিন্নর বা মধুকানের ঢপ্‌-কীর্তন পদাবলীকীর্তনভাঙা, কাহিনীমূলক নাটগানের নিদর্শন হলেও সেগুলি ভক্তিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণ-লীলাগান ছাড়া অন্য কিছু নয়, সুতরাং অধ্যাত্মগীতি-শ্রেণীর অন্তর্গত। খ্রীষ্টীয় ১১শ-১২শ থেকে ১৮শ-১৯ শতকে রচিত এ' ধরনের বিচিত্র শ্রেণীর বাংলাগানকে অধ্যাত্মগীতির পর্যায়ভুক্ত করা অসঙ্গত নয়।

৩। প্রবন্ধ বা প্রবন্ধগান অর্থে অঙ্গনিবদ্ধ গান। সিংহভূপাল বলেছেন : "চতুর্ভির্ধাতুভিঃ ষড়্‌ভিশ্চাঙ্গৈর্যস্মাৎপ্রবধ্যতে তস্মাৎপ্রবন্ধঃ কথিতো গীতলক্ষণকোবিদৈঃ"।

৪। শার্ঙ্গদেব-রচিত সঙ্গীতরত্নাকর ৪।২৬ এবং ৪।২৩৩

৫। সিংহভূপালের টীকা দ্রষ্টব্য। আসলে চর্যা 'পদ' নয়—'গান' এবং গান ও পদ সমানার্থক নয়। তবে সঙ্গীতে পদ গান অর্থেও ব্যবহৃত হয়।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ পদ ও পদাবলী ॥

'পদ' শব্দে গান বা গীতিকবিতা বোঝায় কিনা এ' প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেন : "বৈষ্ণব-গীতিকবিতাকে এখন 'পদ' বলা হয়। এই অর্থ অষ্টাদশ শতকের পূর্বে প্রচলিত হয় নাই। আগে 'পদ' বলিতে দুই ছত্রের গান অথবা গানের দুই ছত্র বুঝাইত। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতিতে 'তথাহি পদম' বলিয়া সাধারণত দুই ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।"[১] সঙ্গীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতকের প্রথমার্ধ) 'পদ'-শব্দকে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, অর্থপ্রকাশক শব্দ-বিশেষের নামও 'পদ' হতে পারে : "তাতাহন্যদ্বাচকং পদম" (রত্নাকর ৪।১৬)। টীকাকার মল্লিনাথ ঐ প্রসঙ্গে বলেছেন : 'অর্থপ্রকাশকং পদম্,'—অর্থাৎ যা অর্থ প্রকাশ করে তাই পদ। কিন্তু শার্ঙ্গদেব ও মল্লিনাথ বা সঙ্গীত-রত্নাকরের অন্যান্য টিকাকারবা এই 'পদ' শব্দের অর্থ-বিশ্লেষণ করেছেন রত্নাকরের প্রবন্ধ তথা প্রবন্ধগানের অধ্যায়ে। প্রবন্ধে ছ'টি অঙ্গের মধ্যে 'পদ' একটি অঙ্গ। সুতরাং 'পদ' শব্দ বা অঙ্গ সেখানে গানের প্রকৃতি-নির্দেশক, সুতরাং গানাঙ্গ তথা গান —একথাই বোঝা যায়।

'পদাবলী' শব্দ প্রসঙ্গেও ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন : 'পদাবলী'-শব্দটির প্রথম ব্যবহার পাই গীতগোবিন্দে—'মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা

১। ডঃ সেন : 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, ১৩৪৭ সাল, পৃঃ ২৭৮

জয়দেবসরস্বতীম্'।[২] পরে যখন 'পদাবলী'-শব্দের অর্থ দাঁড়াইল গীতিকবিতার সমষ্টি, তাহার পূর্বে 'পদ'-শব্দের অর্থ-পরিবর্তন ঘটিযাছে। বৈষ্ণব-গীতি-কবিদেব অধিকাংশই 'মহাজন' বা 'মহান্ত' (অর্থাৎ সাধু-পুরুষ বা গুরু) ছিলেন। এইজন্য অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে বৈষ্ণব-গীতিকবিতা 'মহাজন-পদাবলী' নামে খ্যাত হয।"[৩]

পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণব-পদাবলীকে চাব ভাগে বিভক্ত করা হযেছে: (১) রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী, (২) গৌর-পদাবলী, (৩) ভজন-পদাবলী, (৪) রাগাত্মিক-পদাবলা। সুতরাং 'পদাবলী'-শব্দটিব বিশেষভাবে প্রচলন হয সম্ভবত চর্যাপদগীতিব কিছু পবে খ্রীষ্টীয ৯ম-১২শ শতকে। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মোট ১৫৪ জন মহাজনের (পদকর্তার) নাম উল্লেখ কবেছেন। তাদেব মধ্যে এগার জন মুসলমান কবি ও তিনজন মহিলা কবি। এই ১৫৪ জন হিন্দুপদকর্তা মহাজনদের মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, লোচনদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, যদুনন্দনদাস, যদুনন্দন চক্রবর্তী, প্রেমদাস, বসন্তরায, রায় বামানন্দ, বায় শেখব, বাসু ঘোষ, শশিশেখর প্রভৃতি আছেন।

এখন বাংলাসাহিত্যেব ক্রমবিকাশেব দিক থেকে 'পদ' শব্দে হযতো ১০ম-১১শ শতকেও couplet অর্থাৎ গানের মাত্র দুটি ছত্র (লাইন) বোঝাতো ও তা গীতি বা গানেব বোধক হযেছিল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ১২ শতকের গোড়াব দিকে এবং তখনই ঠিক পরিপূর্ণভাবে 'পদ'-শব্দে গীতিকবিতা ও গানকে বোঝাত। কিন্তু আমরা পূর্বেই আলোচনা কবেছি যে, খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে নাট্যশাস্ত্রকাব ভরত 'পদ'-শব্দে গীতি বা গানকে বুঝিয়েছেন (যদিও অবশ্য গীতি ও গান এই শব্দ-দুটির মধ্যে কিছু অর্থগত পার্থক্য আছে)। অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের 'অভিনবভারতী'-টীকায় 'পদ' অর্থে গানকে লক্ষ্য করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও নাটকগুলিতে 'পদ' শব্দে অধিকাংশ স্থানেই গানকে বুঝিয়েছে। সুতবাং প্রাচীন ধারার অনুবর্তনকারী বাঙলার সাহিত্যিক ও কাব্যরচয়িতারা অন্ততঃ ৯ম-১২শ শতকের চর্যাপদ-

২। শ্রদ্ধেয হবিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায-সংকলিত 'বঙ্গীয-শব্দকোষ' (শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত, ১৩৫১ সাল) গ্রন্থেও পদাবলীপ্রসঙ্গে গীতগোবিন্দেব এই শ্লোকাংশটি উদ্ধৃত হযেছে। পৃঃ ১৭৩৪

৩। 'বাঙ্গালা-সাহিত্যেব ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৮

গুলিকে 'গীতি'-পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন বলে মনে হয়। হতে পারে যে, বাংলাসাহিত্যের গতি ও রূপায়ণভঙ্গি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, কাব্য ও সাহিত্যগুলির রচনাশৈলী ও প্রকৃতি থেকে বেশ একটু ভিন্ন এবং তারই জন্য ১০ম-১১শ শতকের অথবা তারও পূর্ববর্তী বাংলাসাহিত্যের রচয়িতারা নূতনতার স্রষ্টা ও পথিকৃৎ হিসাবে পুরোপুরিভাবে প্রাচীনতার অনুসরণ করেন নি। কিন্তু ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষণে বিচার করলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, 'পদ'-শব্দের সাঙ্গীতিক দ্যোতনা পূর্বে একবার ভারতীয় সাহিত্যে, কাব্যে বা নাটকে প্রচলিত হয়ে থাকলে পরে তার অনুবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। তবে বাঙলার সাহিত্যরচনার দৃষ্টি, সাহিত্যচিন্তা ও সাহিত্য-মন যে কিছুটা বৈশিষ্ট্যাবগাহী হবে না তা আমাদের বক্তব্য নয়।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নবম-দ্বাদশ শতকে চর্যাপদরচনা পদসাহিত্যের জগতে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। বাংলাসাহিত্য-বিকাশের তা চলমান যুগ। প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত-সাহিত্যেরও অপ্রাচুর্য ছিল না। বাংলাভাষার রূপসজ্জায় স্মৃতিসংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বাংলা সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থ, অলংকারশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি ছাড়াও সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' বা রামপালচরিত, গোবর্ধন আচার্য-রচিত 'আর্যাসপ্তশতী' ও শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। হাল-রচিত 'গাথাসপ্তশতী' খ্রীষ্টীয় ১ম বা ১ম-২য় শতকের গ্রন্থ। ন্যায়াচার্য ও বেদান্তবিদ্‌দের রচিত ন্যায়দর্শন ও বেদান্তদর্শনের গ্রন্থ যেমন একদিকে প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন-রীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল, তেমনি অপরদিকে নব্য-সাহিত্য ও দর্শন-আলোচনা বাঙলার সাংস্কৃতিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছিল। গুপ্ত ও পালযুগে বৌদ্ধসাহিত্য ও বৌদ্ধধর্মের প্লাবন ও বিস্তৃতি বাঙলার সংস্কৃতি-প্রতিভায়, শিক্ষায়, ধর্মে ও অধ্যাত্ম-জীবনে এক নূতন উজ্জীবন ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। একথা সত্য যে, গৌতম-বুদ্ধের পরিনির্বাণের অনেক পরে বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মমত ও সাধন-ধারার সৃষ্টি হয়েছিল বুদ্ধ-আদর্শ ও বুদ্ধবাণীকে কেন্দ্র ক'রে। সৃষ্টি হয়েছিল বোধিসত্ত্বযান ও বুদ্ধযান প্রভৃতি তত্ত্বমার্গ বুদ্ধ-জীবন বা বুদ্ধ-ব্যক্তিত্বকেই লক্ষ্য ক'রে। সৃষ্টি হয়েছিল হীনযান ও মহাযান ধর্মমতদুটি মহারাজ কণিষ্কের সময়ে

চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতির অধিবেশনকালে এবং উদ্ভূত হয়েছিল বিচিত্র দর্শনমত, আচার-বিচার, ধর্মানুষ্ঠান ও সাধনা। হীনযানের ছায়াতলে দেখা দিল একদিকে যেমন বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক দর্শনমতবাদ, অপরদিকে তেমনি মহাযানের অনুসরণে আবির্ভূত হয়েছিল মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শনমত। এই সকল দার্শনিক মতবাদের বৌদ্ধিক বিচার ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ববিশ্লেষণের পশ্চাতে একদিকে মহাযান-ধর্মমতে দেখা দিল যেমন বিচিত্র দেবদেবী, তাদের ধ্যানচিন্তা, আচার-উপাসনাপদ্ধতি ও তত্ত্ববোধপ্রবৃত্তি, অপরদিকে তেমনি হিন্দু-পুরাণ, তন্ত্র ও শৈবশাস্ত্রসমর্থিত দেবদেবী এবং তাদের আচার ও সাধনতত্ত্বের হোল উদ্ভব প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক এক সংঘাত সৃষ্টি ক'রে। ক্রমে আত্মপ্রকাশ করলো মন্ত্রযান ও তার শাখা কালচক্রযান, বজ্রযান প্রভৃতি। হিন্দুতন্ত্রের মন্ত্র ও আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণে নববৌদ্ধধর্মে প্রবর্তিত হোল দেবদেবীদের পূজা-অর্চনা ও তত্ত্বচিন্তা। বৈদিক ওঙ্কারের পাশাপাশি হূং প্রভৃতি তান্ত্রিক মন্ত্রবীজের সহযোগে জপ, অষ্টাঙ্গযোগসাধনা ও ধ্যানের অন্তর্প্রবেশ ঘটলো। বাঙলার সাধক-সমাজে ও দার্শনিক-সমাজেও দেখা দিল এক অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা। তবে এই দ্বন্দ্বপ্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার আবির্ভূত হোল হিন্দু ও বৌদ্ধ-সমাজে এক পারস্পরিক সমন্বয়ী দৃষ্টি ও মৈত্রীভাব। ক্রমে আত্মপ্রসারণের পথ ও প্রবৃত্তি হোল প্রশস্ত। ফলে বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবেশ করলো যেমন হিন্দুধর্মের সূক্ষ্ম ও স্থূল অনেক উপাদান, হিন্দুধর্মও আত্মসাৎ করেছিল তেমনি বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধতন্ত্রের কিছু কিছু সামগ্রী। অবশ্য এই গ্রহণপ্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল উভয়েরই মধ্যে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মতে, হিন্দুধর্মই নাকি পরিপুষ্ট করেছিল তার কলেবর বৌদ্ধধর্ম থেকে বিচিত্র তত্ত্ব ও উপাদান আহরণ ক'রে। তাঁদের মতে, ছদ্মবেশী হিন্দু-দেবদেবীরা বেশীর ভাগই ছিলেন বৌদ্ধদেবদেবী। হিন্দুদের সরস্বতী, কালী, বজ্রবারাহী, গণেশ, অপরাজিতা-দুর্গা প্রভৃতি তার নিদর্শন।

অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করার পক্ষে ও বিপক্ষে নূতন ক'রে অনুশীলন ও বিচার করার দিন আবার এসেছে বলেই আমরা মনে করি, কেননা হিন্দু-তন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি ঠিক একই সময়ে হয় নি, বরং ঐতিহাসিক তথ্য যে, হিন্দুতন্ত্রের বহুকাল পরে বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল সমাজে প্রচলিত হিন্দু-

ধর্মচিন্তার প্রতিক্রিয়ারূপে। হিন্দুতন্ত্র বেদের সমসাময়িক না হলেও বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানই ভিন্নভাবে তন্ত্রাচাররূপে তন্ত্রসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বৈদিক ধর্মাচাব ও দেবদেবী যেমন পুবাণের যুগে কিছুটা ভিন্নভাবে রূপগ্রহণ কবেছিল, তেমনি প্রকাশ্য বৈদিক যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ও তার সিদ্ধিসাফল্যও বৈদিকোত্তর যুগে অপ্রকাশ্য গুপ্তানুষ্ঠান ও শক্তিসিদ্ধিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বেদ ও হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে তখন এতটুকু বিরোধচিন্তা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, ববং ছিল মৈত্রীসম্পর্কেরই বন্ধন। বৌদ্ধতন্ত্রের আচাব-অনুষ্ঠান ও দেবদেবীচিন্তাব বিকাশ হিন্দু-আচাব ও দেবদেবীচিন্তারই অনেকটা প্রতিকূল এবং বৌদ্ধতন্ত্রে সিদ্ধিনাশক গণেশ ও হিন্দুতন্ত্রের সিদ্ধিদাতা গণেশই তাব সামান্য একটি নিদর্শন। তবে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের ইঙ্গিতও যে ছিল না, তা নয়, কেননা হিন্দুতন্ত্রের মন্ত্র, যন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডলের অনুরূপ প্রতিকৃতি ও অনুষ্ঠানই পাই আবাব বৌদ্ধতন্ত্রের ভিতর।

হিন্দুতন্ত্রেব মতো বৌদ্ধতন্ত্রেব উদ্দেশ্যও ছিল ঐহিক সিদ্ধিলাভেব মতো পারলৌকিক পরমসিদ্ধিলাভ, তা সে সামবস্য শিবশক্তি-সাযুজ্যই হোক, শিবত্ব-প্রাপ্তিরূপ ব্রহ্মজ্ঞানস্থিতিই হোক, অথবা নির্বাণ বা শূণ্যতায় প্রতিষ্ঠালাভই হোক। বজ্রাচার্যগণ বজ্রবাবাহীর কিংবা শূণ্যতার প্রতিফলন অবধূতিকা নৈরাত্মাদেবীর উপাসনার অঙ্গরূপে সন্ধা বা অভিসন্ধিসূচক ভাষায় রচনা করেছিলেন বজ্রগীতি ও চর্যাগীতি।[৪] চর্যা ও বজ্র গান-রচনার পটভূমিকায় বিচিত্র বৌদ্ধধর্মমত ও বৌদ্ধসাধনচিন্তার একটি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই স্বীকার্য। সমাজে, জীবনে, সকল রকম চিন্তায়, ধর্মে কর্মে ও দর্শন-চিন্তায় যেমন দেখা যায় একটি প্রভাব ও সামঞ্জস্য, তেমনি আবার ধর্মে ও দর্শনচিন্তাব উপরও দেখা যায় সমাজ, সামাজিক ধর্মসংস্কার ও মানুষের জীবনচিন্তার একটি প্রভাব। পারস্পরিক এই আদান-প্রদান বা দেওয়া-নেওয়ার ভিতর দিয়েই চিরদিন মানুষের বাহ্যিক ও আন্তর-জীবনের হয় সংগঠন ও শুদ্ধপরিণতি সমাজে।

শোনা যায়, তিব্বতের সিদ্ধাচার্যরাই ছিলেন বৌদ্ধ-সহজযানের প্রবর্তক ও প্রচারক এবং খ্রীষ্টীয় ৯ম-১২শ শতকে বা তার পূর্বে বৃহত্তর-বাঙলায় ঐ সহজ-যান-মতবাদের হয়েছিল অনুপ্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে,

৪। প্রকৃতপক্ষে বজ্রযানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল চর্যা ও বজ্র-গীতি।

বৃহত্তর-বঙ্গের চতুঃসীমা ছিল তখন অখণ্ড বঙ্গদেশ বা বাঙলা, গিরিব্রজ বা বিহার, উৎকল বা উড়িষ্যা ও কামরূপ বা আসামকে নিয়ে সার্থক। বৃহত্তর-বাঙলার সমাজ-বিবর্তনে, ধর্মাচারে ও দৈনন্দিন জীবনচর্যায়, সাহিত্যে, নাটকে, কাব্যে, দর্শনচিন্তায় ও এমন কি অধ্যাত্মসাধনায় সহজযান-ধর্মমত এনেছিল এক নূতন আলোড়ন ও প্রেরণা। যদিও সেই আলোড়ন ও প্রেরণা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল বৌদ্ধ-সাধনাশ্রয়ী আচার্যদেরই ভিতর, তবুও হিন্দু-সর্বসাধারণের জীবনে, মনে ও তত্ত্বচিন্তায় সৃষ্টি হয়েছিল এক বিবর্তনী প্রবৃত্তি। ফলে হিন্দুসমাজ-মানসের কোন কোন অংশে প্রবেশলাভ করেছিল সেই বৌদ্ধ-সহজযান-ধর্মচিন্তা ও ধর্মসাধনার উপাদান ও সৃষ্টি হয়েছিল ক্রমে বৈষ্ণব-সহজিয়া, বাউল, গুরুসত্য, কর্তাভজা প্রভৃতি গুরুবাদী কায়-সাধকদের ধর্মমত ও সাধনা।[৫] আচারী তান্ত্রিক বজ্রযানী ও সহজযানী আচার্যদের পদগানের (চর্যা ও বজ্র-গীতির) বহিরঙ্গ স্থূলচিত্রকল্পের অনুরূপ আন্তর ও রহস্যময় গুপ্তসাধনা ও তত্ত্ব-বোধের অন্তর্নিবেশও ঘটেছিল সহজ সরল সাধারণ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব-সহজিয়া, বাউল ও কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের ভিতর। বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় রচয়িতাদের গূঢ়-দ্বৈতার্থবোধক পদ ও গানের ভাষা ছিল তাই প্রায় একই ধরনের। যেমন লুইপাদ রচিত পদ—

মূল—কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা (বা পইঠো) কাল॥
দিঢ় (বা দিট) করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান॥—প্রভৃতি

অনুবাদ—(কায়ারূপ তরুবর পাঁচ তার ডাল।
চঞ্চল চিত-মাঝে পশে আসি কাল॥
দৃঢ় করি মহাসুখ কর পরিমাণ।
লুই ভণে গুরুকে পুছিয়া ইহা জান॥)—প্রভৃতি

৫। (ক) ডঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত *Obscure Religious Cults* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৬), পৃঃ ১৮৭—২০২ এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৩২—১৮২

(খ) ডঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ 'বাংলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম খণ্ড, ১৯৫৯, পৃঃ ১৪৯—১৫৬

কথবা গুণ্ডরীপাদ-রচিত—

মূল—তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘান্টি (বা ঘান্ট) করহু বিআলী॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমী॥—প্রভৃতি

অনুবাদ—(ত্রিনাড়ী যোগিনী চাপি দেয় অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ যোগ করহ বিকালী॥
তোমা বিনা যোগিনি গো, ক্ষণ নাহি জীব।
তোর মুখ চুম্বি রস কমলের পিব॥)—প্রভৃতি

বাউল-কবি-রচিত পদগান—

(আট) কুঠারি নয় দরজা আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা।
(তার) উপরে আছে সদর-কোঠা
আয়না-মহল তায়।
খাঁচার মাঝে অচিন-পাখি
ক্যামনে আসে যায়॥—প্রভৃতি

তান্ত্রিক আচারী বৌদ্ধসাধনাত্মক গানদুটির অন্তবার্থ বা সাধনমর্মকথা প্রায় একই রকমের। চর্যাগানে 'ডোম্বী' 'বহুড়ী,' 'জোইনী বা 'যোগিনী' প্রভৃতি শব্দে নৈরাত্মাদেবী।[৬] পরিশুদ্ধ অবধূতিকা নৈরাত্মাদেবী শূন্যতা কিংবা সত্তাপক্ষে তথতার প্রতিচ্ছবি। বাউলগানের অচিনপাখী ভগবানও সহজ-মানুষ। বাউল ও চর্যা-সাধনতত্ত্বে সহজ-মানুষ সর্বমলনির্মুক্ত দেহবাসী পরিপূর্ণ মানুষ এবং এই পরিপূর্ণ বা সহজ-মানুষই ভগবান কিংবা আত্মা বা পরমাত্মা। কায়-সাধনায় স্থূলশরীরের মধ্যেই অচিন-পাখি সহজ-মানুষের (সহজানন্দের) আসন প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কায়াকে বা স্থূল রক্তমাংসের

৬। এখানে অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসুর চর্যাপদ-টীকা থেকে 'বহুড়ী' শব্দের অর্থ উদ্ধৃত হল: "বহুড়ী: 'অবধূতিশব্দসন্ধ্যায়া'—টীকা। অভিপ্রায় বা অভিসন্ধিসূচক সন্ধাভাষায় নৈরাত্মা-অবধূতিকাকেই বহুড়ী বা 'বধূ' বলা হইয়াছে। অন্যত্র তাঁহাকে 'যোগীন্দ্রস্য গৃহিনী নৈরাত্মা' বলা হইয়াছে। তিনিই 'অনাদিভববিকল্পঞ্চ ধূত্বা প্রকৃতিপরিশুদ্ধাবধূতিরূপেন অহর্নিশ জাগরণং কুর্বন্তি।'

শরীরকে পরিশুদ্ধ ক'রে শরীরের দুঃখ-দৈন্য-জরা-মরণ-বিহীন যে সহজ আনন্দ তার প্রতিষ্ঠা বা প্রাপ্তিই সহজিয়া-সাধক বাউলের উদ্দেশ্য। সহজদেবতাই সাধককে পরমপরিশুদ্ধির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। চর্যাগানে বৌদ্ধ সহজিয়া-সাধকদের উদ্দেশ্যেও বলা হয়েছে : "পরিশুদ্ধ-অবধূতিকা নৈরাত্মার প্রকৃতি এই যে, তিনি ললনা-রসনা-অবধূতিকা নাম্নী শরীরের মধ্যে প্রধান তিনটি নাড়ীকে চাপিয়া নিরাভাস করিয়া অর্থাৎ গ্রাহ্য-গ্রাহক-গ্রহণ-ভাব বিলীন করিয়া সাধককে নিজের অভিজ্ঞান অর্থাৎ নৈরাত্মতা প্রদান করেন।" যোগ ও বেদান্ত-সাধনায় মুক্তির সঙ্গে সহজসাধনার নৈরাত্মাপ্রাপ্তির অনৈক্য সামান্য।

চর্যাগীতির ভাষা, শব্দযোজনা ও ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, তা প্রাচীন বাংলাভাষা। অনেকের মতে, সংস্কৃত ও অবহট্‌ঠ্-প্রভাবিত প্রাকৃত-বাঙলাই চর্যার ভাষা। অনেকে আবার বলেন, চর্যা গৌড়-বঙ্গ বা শৌরসেনী-অপভ্রংশ-পদগীতির নিদর্শন। কিন্তু একথা মোটেই অস্বীকার করার উপায় নাই যে, বর্তমান বাংলাসাহিত্যের মার্জিত বা সুসংস্কৃত ভাষার পূর্ব বা প্রাচীন রূপই চর্যাপদ বা চর্যাকবিতা অথবা চর্যাগান।

পদাবলীকীর্তনের ঐতিহাসিক বিকাশসম্পর্কে বৌদ্ধ-বজ্রযান ও সহজযান-প্রভাবিত চর্যাগানের আলোচনায় আমরা চর্যার গায়নরীতি ও রাগরূপেরও পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ চর্যা ও নাথ-গীতি ॥

(এক)

খ্রীষ্ট্রীয় ১০ম-১১শ শতকে ধর্মে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও অধ্যাত্মসাধনায় যে বৌদ্ধ-বজ্রযান ও সহজযান-সম্প্রদায়ের প্রভাব ও ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বাঙলার সমাজে যে এক নূতন চিন্তাপ্লাবনের সৃষ্টি করেছিল সেকথা পূর্বে কিছু আলোচনা করেছি। ঐ নূতন প্লাবন বা বিবর্তনের ফলস্বরূপ বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও সহজিয়া, বাউল, কর্তাভজা, গুরুসত্য প্রভৃতি সাধনমার্গে অধ্যাত্ম-পদগানের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম জীবনালেখ্য-রচয়িতা ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ[১] বাঙলার ধর্মসাধনায় বৌদ্ধ-সহজযান-ধর্মমতের অনুপ্রবেশ-সম্বন্ধে যেকথা বলেছেন এখানে তার উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি—যদিও মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। তিনি বলেছেন : "কর্তাভজা ও বাউল-সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোক (শক্তি) লইয়া সাধনা সহজিয়া-বৈষ্ণবমতেরই অনুকরণ। আবার সহজিয়ামত বৌদ্ধ-তান্ত্রিকমতের রূপান্তরমাত্র। মহাযানমতাবলম্বী শূণ্যবাদী বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও তাহাদের এক শাখা মহাযান-ধর্মসেবীরা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের সাকারমূর্তির পূজা করিত। আবার মহাযানের আর এক সম্প্রদায় মন্ত্রযান বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের এক একটি দিব্যশক্তিকল্পনা করিয়া শক্তিপূজার প্রচলন করিয়াছিল। এই শক্তিপূজা হইতেই বৌদ্ধতান্ত্রিকতার আরম্ভ।" প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনাপ্রসঙ্গে অনেকটা অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন।

১। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের পরমসান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

তিনি বলেছেন : "Thus Dr. Waddel says : 'This intense mysticism of the Mahayana let about the fifth century, to the importation into Buddhism of the pantheistic idea of the soul (*atman*) and Yoga or the ecstatic union of the individual with the universal spirit—a doctrine which had been introduced into Hinduism by Patanjali (*Hathayoga-pradipika*)'. The Yogachara school also, in its later development, received and assimilated some magic circles with mantras or spells about 700 A.D., and hence received the new appellation of Mantrayana. But the Mahayana School did not stop there. Having once commenced the work of importation and assimilation, it went on with it, with all its zeal and vigour, and was before long almost a new thing. About the seventh century A.D. the development of the infatuating Tantrikism, which practically verges on sorcery claiming a religious basis, attracted the notice of the Mahayna School, and ere long the idolatrous cult of female energies was found grafted upon the theistic Mahayana and the pantheistic mysticism of Yoga. And this Tantrika phase of the Mahayana School reached its climax when it adopted and assimlated with itse'f the theory of the Kalachakra. * * It wants to establish a mysterious union between the terrible goddess Kali of the Tantrika system, and the Dhyani and Buddhas—the Adi-Buddha himself, of the Buddhistic system and attempts to explain creation and the secret agencies of nature in the light of this union. In the tenth century, the Kalachakra system of the Mantrayana School, as the result of further and further retrograde developments, passed into the system of the Vajrayana of the thunderbolt-vechile. This is the most depraved form, that Buddhistic doctrine on its downward course of

importation, assimilation and compromise, had ever assumed".[২]

বুদ্ধদেবের সময়েই স্ত্রীলোকদিগকে সন্ন্যাসে অধিকার দেওয়া হয়। "কালক্রমে সকল বৌদ্ধমঠে সহস্র সহস্র মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণ ও শ্রমণীগণের অবাধ একত্র অবস্থানের কুফল উৎপন্ন হইয়াছিল। শীঘ্রই ইহাদিগের ভিতর বজ্রযান নামে নব-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। ইহারা এই মত গোপনে প্রচার করিলেন যে, তাঁহাদিগের সাধনপথে ভোগসুখ উপভোগ করিয়া সহজে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * * কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত সাধারণের আসক্তির অনুরূপ নির্বাণ লাভের এই 'সহজতত্ত্ব' তাঁহাদিগের উপাস্য ভগবান বজ্রসত্ত্ব ও তাঁহার শক্তি বজ্রেশ্বরী একীভূত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বজ্রযান-সম্প্রদায় নানা 'সহজ'-মতের তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার করিলেন।"[৩] মোটকথা মহাযানের অন্তর্গত মন্ত্রনয় অথবা মন্ত্রযান-সম্প্রদায়ই বৌদ্ধতন্ত্রবাদের প্রবর্তন করে। মন্ত্রযানের অপরাপর শাখাই বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান প্রভৃতি।

এখানে মনে রাখা উচিত যে, গৌতম-বুদ্ধের জীবদ্দশায়ই বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের মতো তাঁদের নিজেদের একটি পৃথক সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছিলেন। বুদ্ধদেবের কঠোর অনুজ্ঞা ও অনুশাসন ছিল যে, কোন ভিক্ষুণীই কোনদিন কোন ভিক্ষুর সঙ্গে একত্র বিহার, একত্র কথোপকথন ও একত্র বাস করতে পারবে না।[৪] কিন্তু বুদ্ধদেবের তিরোভাবের বহু পরে কঠোর শাসননীতির বজ্রবাঁধন কিছুটা শিথিল হয়েছিল এবং সেই শৈথিল্যের ফলে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-সমাজে অবাধ মেলামেশায় সুযোগ দেখা দিয়েছিল। 'ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ'-গ্রন্থে এই অবাধমিলনের কলঙ্ক-পরিণতির সাক্ষ্য আছে। হিন্দুতন্ত্রের বামাচার-অনুপ্রবেশের ইতিকথাও তাই। তবে স্বেচ্ছাচারমূলক বামাচার

2. *The Archaeological Survey of Mayurabhanja*, vol. 1 (1911), pp. cvi-cvil.

৩। ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ : শ্রীরামকৃষ্ণদেব (উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত), পৃঃ ৬১০-৬১১। অবশ্য এ'সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ আছে। পরে এ'সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

৪। ডঃ হারম্যান ওল্ডেনবার্গরচিত Buddha, His Life, His Doctrine, His Order-গ্রন্থে The Orders of Nuns শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৭৭—৩৮১

হিন্দুতন্ত্রে আসল সাধনমার্গ নয়, তা অধ্যাত্মসাধনার বিকৃত রূপমাত্র। পরশুরামকল্পসূত্র, কৌলাবলীতন্ত্র, কৌল-উপনিষৎ, কুলার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রে বামাচারকে 'বাম' অর্থে কালী, সুতরাং আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালীর আচার বা উপাসনাবিধি বলা হয়েছে। মহাকালী মহাশক্তির আরাধনা ও উপাসনা-বিধিই আসলে বামাচার নামে প্রচলিত।

ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ তাঁর আলোচনাপ্রসঙ্গে পুনরায় বলেছেন: "সহজিয়া-বৈষ্ণবগণ বজ্রযানের বজ্রেশ্বরীকে 'বাশুলী' নামে পূজা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীরাধারাণীর যুগলরূপ শক্তি বা নায়িকাতে অধিষ্ঠিত বিশ্বাস করিয়া পরকীয়াসাধনাই প্রবল রাখিলেন। ইহাদের মতে, মনুষ্যভজনই সাধনের প্রধান অঙ্গ। প্রথমে একটি পরকীয়া রমণী গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সেই নায়িকার দেহই শ্রীবৃন্দাবন্ এবং তাঁহাতেই শ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীরাধারাণী বিরাজিত ভাবিয়া থাকেন। নায়িকাতে দেহ ও মন আরোপ করিয়া সাধন করিলে অচিরাৎ প্রেমরসসাধনে সিদ্ধিলাভ হয়। সহজিয়ারা আপনাদিগকে রসমার্গের পথিক রসিক ভক্ত বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে, বিল্বমঙ্গল, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব গোস্বামী, রায় রামানন্দ—এই পাঁচজন রসিক ভক্ত সহজিয়াধর্ম সাধন করিয়াছিলেন।"[৫]

অনেকের অভিমত যে, বৌদ্ধ-পালরাজাদের আমলে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের পূর্ণ-প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল। বাঙলার ইতিহাস থেকে একথাও আবার সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, অষ্টম শতকের শেষভাগে ধর্মপাল (১ম) গৌড়ের মসনদে যখন আরোহণ করেন তখন ধর্মাচারের মধ্যে অনেক-কিছু মালিন্য তিনি দূর করে-ছিলেন নূতন পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে। খ্রীষ্টীয় ১০১৫ থেকে ১০৬০ শতকে বাঙলার সমাজে ধর্মপাল (২য়), মহীপাল (১ম) ও নয়পাল প্রভৃতি পালরাজ-গণের যখন প্রভাব বিস্তৃত, তখন ধর্মের পরিবেশ বেশ শান্ত ও পবিত্র ছিল। শ্রীজ্ঞান-দীপঙ্কর বা অতিশ-দীপঙ্কর, রামাই পণ্ডিত, হাড়ি-পা বা হাঁড়িসিদ্ধ, কমলাকুশিল, নরেন্দ্র-শ্রীজ্ঞান, দান-রক্ষিত প্রভৃতি সাধকের সংস্পর্শে বৌদ্ধতন্ত্রাচার তখন সুনিয়ন্ত্রিত। বৌদ্ধতন্ত্রে প্রবৃত্তিমার্গের ধারা তখন বর্তমান থাকলেও নিবৃত্তির প্রসন্নতা ধীরে ধীরে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। নেপালের বৌদ্ধগণ বজ্রযানমতাবলম্বী ছিলেন। তিব্বতে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকা-

৫। 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব'—(উদ্বোধন' পৃঃ ৩১২)।

চারেরই বিশেষ প্রভাব ছিল। বাঙলাদেশেও তান্ত্রিক বামাচারের পাশাপাশি সিদ্ধান্তাচার, কুলাচার ও দিব্যাচার ও অন্যান্য তন্ত্রাচারের প্রবর্তন হয়। আচারবিলাসী তন্ত্রশাস্ত্র ছাড়া বেদান্তের সমপর্যায়ভুক্ত 'মহানির্বাণতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থও সে'সময়ে লিখিত ও প্রচারিত হয়। ক্রমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কিছুটা স্তিমিত হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয় দেখা দিলেও বৌদ্ধতন্ত্রের সাধন ও চিন্তাধারা হিন্দুসমাজের শিরায় শিরায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। ফলে নূতন রূপ ও নাম নিয়ে বৈষ্ণব-সহজিয়া, বাউল, গুরুসত্য, কর্তাভজা তথা মানুষরূপে গুরুপূজা কায বা কায়াসাধন প্রভৃতি সাধনতত্ত্বের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল একথা আগেই বলেছি। খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকের চর্যা ও বজ্রগীতির রচয়িতা সহজযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধসাধকরাও ছিলেন ঐ রহস্যসাধনারই পথচারী এবং বাঙলার পরবর্তী বৈষ্ণব-সহজিয়া-সাধনচারীরাও ঐ বজ্রযানী ও সহজযানী বৌদ্ধসাধকদের কতকাংশে অথবা বহু অংশে অনুসারী ছিলেন।

ঐ সময়ে যোগপন্থানুসারী নাথধর্মও স্বতন্ত্রভাবে বাঙলার সর্বত্র বিস্তারলাভ করেছিল বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবকে অতিক্রম না করেও। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "But there were other forms of religions which the Buddhist community absorbed in itself. One of these is the *Nath-marga* or Nathism. * * Thus the Nathism of Matsyendra arose outside Buddhism, but was at last absorbed into it. On the otherhand, Ramana Vajra was a Buddhist of the Varayana School, but when he became Goraksanath, and was regarded as a hertic by Buddhists, so Goraksa's Nathism was originally within Buddhism, but it was not incorporated into it".[6]

আসলে গুরু গোরক্ষনাথ, মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য নাথ আচার্যদের প্রবর্তিত যোগসাধন, কায়াসাধন ও উল্টাসাধন প্রভৃতিও বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মে প্রবেশ লাভ করেছিল। "গোরক্ষসম্প্রদায়ে প্রচলিত হঠযোগের

6. **Vide Introduction to the Modern Buddhism and Its Followers in Orissa, p. 89.**

গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত একটি কষ্টসাধ্য আসন ও তাহার ফলের কথা আছে, যথা—

বামোরুমূলার্পিতদক্ষপাদং
জানোর্বহির্বেষ্টিতবামপাদম্।
প্রগৃহ্য তিষ্ঠেৎ পরিবর্তিতাঙ্গঃ
শ্রীমৎস্যনাথোদিতমাসনং স্যাৎ॥

—হঠযোগপ্রদীপিকা ১।২৬

*   *   *

"আদিনাথ শঙ্কর হঠযোগের উপদেষ্টা : "আদিনাথ শিবঃ সর্বেষাং নাথনাং প্রথমো নাথঃ। * * মৎস্যেন্দ্রাখ্যশ্চ আদিনাথ-শিষ্য।" * * গোরক্ষ-সংহিতায় গোরক্ষনাথের উপদেশ 'আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারাশ্চ ধারণা' এবং 'যোগশাস্ত্রঞ্চ পরমং যোগিণাং সিদ্ধিদায়কম্।' এতদ্ব্যতীত গোরক্ষনাথ কায় বা কায়সাধনের প্রধান নেতা ছিলেন, যোগের কঠোর নিয়ম দ্বারা দেহসংযম ও চিত্তবৃত্তিনিরোধ ছিল মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষের পন্থা।"[৭] এ' থেকে প্রমাণ হয় যে, গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নাথাচার্যদের যোগ পদ্ধতি বৌদ্ধধর্ম-সাধনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং চর্যারচয়িতা সিদ্ধাচার্যরাও সেই যোগপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

পরে খ্রীষ্টীয় নবম শতকে সহজিয়াসম্প্রদায় যখন বৌদ্ধ-বজ্রযানধর্মমতের অনুসরণ করেছিল তখন কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদ (কাহ্ন-পাদ) প্রভৃতি গাথা বা পদ-রচয়িতারা যে বহু সহজিয়াগান রচনা ক'রে বাঙলার গীতিভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন বাঙলার ইতিহাস তার সাক্ষ্য দান করে। অচ্যুতানন্দের শূণ্যসংহিতায়ও আমরা এর কিছুটা প্রমাণ পাই। শূণ্যসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে,

নাগান্তক বেদান্তক যোগান্তক জেতে।
নানা প্রতি বিধিরে কহিলে তোষ চিতে॥
গোরক্ষনাথঙ্ক বিদ্যা বীরসিংহ আজ্ঞা।
মল্লিকানাথঙ্ক যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞ॥

৭। ডক্টর কল্যাণী মল্লিক : 'নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী' (১৯৫০), পৃঃ ৬৫

লোহিদাস কপিলঙ্ক সাক্ষিসন্ত্র জেতে।
কহিলে জে যেমন্ত সে হোইক্কি গুপতে ॥

অর্থাৎ নাগার্জুনের অনুসারী নাগান্তক বা সৌত্রান্তিক, যোগান্তিক বা যোগাচার প্রভৃতি বৌদ্ধসম্প্রদায় তাঁদেব আপনাপন নিয়মপদ্ধতিকে অনুসরণ করেও স্বধর্মে ও বিশ্বাসে নিষ্ঠ ছিলেন। তাছাড়া বীরসিংহের অনুশাসনে গোরক্ষনাথের ধর্মমত ও যোগানুষ্ঠান, মল্লিকানাথের যোগসাধন, বাউলী বা বাউলধর্ম এবং লোহিদাস ও কপিলেব সাক্ষীমণ্ডল ছিল সর্বসাধারণের লোকচক্ষেব অন্তরালে গুপ্ত ও বহস্যময়। আচার্য মীননাথের মন্ত্রশিষ্য গুরু গোবক্ষনাথ পরে মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তিব্বতের ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায়, গোরক্ষনাথ তিব্বতের বৌদ্ধসম্প্রদায়ে বিশেষভাবে পূজিত ছিলেন। ঐতিহাসিক লামা তারানাথেব বিবরণ থেকেও জানা যায়, খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকে গোরক্ষনাথ শৈবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তারজন্য তাঁব প্রবর্তিত যোগীসম্প্রদায়ের কাছে তিনি 'শিবাবতাব' বলে পরিচিত ও পূজিত ছিলেন। অচ্যুতানন্দ তাঁব শূণ্যসংহিতায় গোরক্ষনাথ ও মল্লিকানাথকে বৌদ্ধ-যোগাচাবধর্মমতেব অনুসাবী ছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন।

(দুই)

পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, চর্যা ও বজ্র-গীতি নির্দিষ্ট তালে ও রাগে গীত হোত এবং তাল ও রাগগুলি ছিল শাস্ত্রীয় অভিজাত সঙ্গীতপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন: "চৈতন্যদেবের অন্ততঃ ছয় শত বৎসর পূর্বে ভারতে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণ সংকীর্তনের গান[৮] বাঁধিয়া ও নানা রাগ-রাগিণীতে ঐ সমস্ত গান গাহিয়া ভারতবাসীব মন বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহারা সচরাচর যে সমস্ত রাগিণীতে গান গাহিতেন তাহাদের নাম পঠমঞ্জরী, গবডা, অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধনেশ্রী, রামক্রী, বরাড়ি, শীবরী (সাবেরী), মল্লারি,

৮। 'সংকীর্তন' শব্দটিব প্রযোগ ঠিক নয, কেননা চযাগুলি ছিল গীতি বা গান, বৈষ্ণব-পদকীর্তন বা সংকীর্তন থেকে তাবা প্রকাশে ও গঠনে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

মালশ্রী, কহ্নু, গুঞ্জরী, বাংগলা প্রভৃতি।"[৯] অবশ্য চর্যায় অনেক বিকৃত রাগ-নামের উল্লেখ আছে, যেগুলির সুসংস্কৃত নাম সঙ্গীতশাস্ত্রে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় বলেছেন যে, বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা অনেক সময় গাথা রচনা করতেন এবং গাথা বা গাথাগান রচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা ছিল।

কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত যে, বৌদ্ধ-ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের অচরণমুলক অথবা আচরণের উদ্দেশ্য রচিত গাথাগানই চর্যাগীতি। 'চর্যা'-শব্দটির আভিধানিক অর্থ আচরণ (চর্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন), পালন, রক্ষণ, অনুষ্ঠান প্রভৃতি ; যেমন ধর্মচর্যা, দেহচর্যা, ব্রতচর্যা। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 'ঐ 'চর্যা' শব্দ থেকেই তপস্বীব আচরণ—তপশ্চর্যা, নটের আচরণ—নটচর্যা শব্দগুলির সৃষ্টি। এথেকে অনুমান হয় যে, খ্রীষ্টীয় ১০-১১শ শতকের বাঙলার বৌদ্ধ-সমাজে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ধর্মাচরণমূলক বা অধ্যাত্মকর্ম-আচরণের উদ্দেশ্য রচিত গাথাগানই চর্যাগীতি'। এখানে 'গাথা' গানেরই প্রতিশব্দ। বৈদিক যুগে যজ্ঞানুষ্ঠান বা যজ্ঞকর্মে 'গাথা-নারশাংসী' গান করা হোত। ঠিক ঐ রকমভাবে বৌদ্ধযুগে নিষ্ঠাচারী ভিক্ষু ও নিষ্ঠাচারিণী ভিক্ষুণীরা অসংখ্য গাথা বা পদ রচনা ক'রে শাস্ত্রীয রাগে ও তালে তাদের সম্পৃক্ত ক'রে বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে ও উৎসব-ব্যাপারে গান করতেন। তাছাড়া অধ্যাত্ম সাধনচর্যার গানের বিধি তো ছিলই।[১০] অনেকে বলেন, চর্যাগীতিগুলি প্রধানত উৎসবে বা অবসর-বিনোদনে গান করা হোত। কিন্তু অবসর-বিনোদনের কথা বাদ দিলে উৎসব-প্রসঙ্গে গীত হলেও চর্যাগীতি যে পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টর কারণ হোত তা 'উৎসব'-শব্দ থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ হয়।

আসলে চর্যা ও বজ্র-গীতিগুলি ছিল নিছক অধ্যাত্মপরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। চর্যা সহজিয়া ও বজ্রযান এই দুই বৌদ্ধ-সাধকসম্প্রদায়ের নির্ধারিত গীতি। কথিত যে, বজ্রগীতি গুহ্য যৌগিক ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে মণ্ডলচক্রে গীত হোত। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, এই মণ্ডলচক্র ছিল অনেকটা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের যোগিনীচক্রের সমপর্যায়ভুক্ত। বৌদ্ধ-যোগিনীচক্র বা মণ্ডল-চক্রের অনুষ্ঠানে বজ্রগীতি গান ক'রে বজ্রধর হেরুককে জাগ্রত করা হোত। এরই জন্য চর্যাগীতি বজ্রগীতি থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। চর্যার

৯। 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' (১৩২৩ সাল), পৃঃ ৬

১০। লেখকের 'রাগ ও রূপ", ১ম ভাগ (৩য় সংস্করণ), পৃঃ ৭৮ দ্রষ্টব্য।

সাহিত্যরচনা প্রায় সম্পূর্ণ হোত যদি তার শেষপদে ও তৃতীয় পদে অথবা দ্বিতীয় পদরূপ ধ্রুবপদে ভণিতা সন্নিবেশিত থাকত। তবে এই ধ্রুবপদ 'ধ্রুবপদের তস্যানুৎপাদং সূচয়তি,' 'ধ্রুবপদের তমেবার্থমভিদ্যোতয়তি', 'ধ্রুবপদেনাসংগপরিহারং করোতি' প্রভৃতি নিবদ্ধ প্রবন্ধগীতিরূপ ধ্রুবপদ নয়, এটি গান বা পদের অংশ বা ধাতু। কারু কারু মতে, চর্যাগীতির ভাষায় দু'রকম অর্থের দ্যোতনা পাওয়া যায়। অদ্বয়বজ্র ও মুনিদত্তের ভাষ্যে এই দ্ব্যর্থক ভাষাকে বলা হয়েছে 'সন্ধাভাষা', বা 'সন্ধাসংকেত' বা 'সন্ধাবচন'।[১১] যেমন (১) যথা বালৈঃ সন্ধাভাষণম-জনদভিমর্নপবনাদিনিরোধমাশ্রযঃ কল্পিতঃ; (২) বারুনীতি সন্ধাবচনেন * * (৩) 'দুলি সন্ধাসংকেতে বোদ্ধব্যম্' প্রভৃতি।

(তিন)

চর্যাগীতিব প্রকৃতি, রচনা ও গীতরীতি বা গায়নশৈলীর ধারা আমরা পরবর্তী সঙ্গীতগ্রন্থগুলিব মধ্যেও পাই। পূর্বেই বলেছি যে, খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকের সঙ্গীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেবেব "সঙ্গীত-রত্নাকর' এবং ১৬শ শতকের গুণী বেঙ্কটমখীর 'চতুদণ্ডীপ্রকাশিকা'-গ্রন্থে চর্যার গীতি ও গায়নশৈলীর পরিচয় আছে সম্পূর্ণ ক্ল্যাসিক্যাল-পরিবেশ নিয়ে। হোতে পারে যে, ৯ম-১১শ শতকের চর্যা-গীতির গীতিরীতি হয়তো ১৩শ বা ১৬শ শতকের চর্যার উন্নত গীতিরীতির ঠিক সমপর্যায়ভুক্ত ছিল না। কিন্তু তাহলেও সঙ্গীত-রত্নাকর ও চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকায় বিশ্লেষিত চর্যার রূপ ও শৈলী থেকে ৯ম-১১শ শতকের সমাজে গীত চর্যার রূপ ও গায়নশৈলীর কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া একথা সত্য যে, খ্রীষ্টীয় শতকের আরম্ভ থেকে প্রায় ১৭শ-১৮শ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরূপ তার মূলনিয়ন্ত্রক রাগ বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড-স্কেল অনুযায়ী বর্তমান রাগরূপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, আর তারিজন্য প্রাচীন গানে বা পদে রাগনামের উল্লেখ থাকলেই যে তা ঠিক বর্তমান রাগরূপ অনুযায়ী গীত হবে এমন কোন নিয়ম নেই। যেমন, সঙ্গীতশিক্ষাবিদ্-মাত্রেই জানেন যে, নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের

১১। সন্ধ্যাভাষার মধ্যে 'সন্ধ্যা' শব্দটির মার্জিত রূপ 'সন্ধা' (সম্+ধা=সন্ধা), অর্থাৎ যা অভিসন্ধিসূচক বা আভিপ্রায়িক ভাষা তাই 'সন্ধাভাষা'।

সময়ে মূলনিয়ন্ত্রক রাগ বা থাট (standard scale) ছিল অনেকটা এখনকার কাফীরাগ-অনুযায়ী অর্থাৎ স রি জ্ঞ ম প ধ ণ (=গান্ধার ও নিষাদ কোমল বা বিকৃত) এবং এই নিয়ন্ত্রক রাগ বা থাটরূপের প্রচলন ছিল প্রায় ১৭শ-১৮শ শতক পর্যন্ত। বিদ্যারণ্য মুনি ছিলেন যেমন বিদগ্ধ দার্শনিক, তেমনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞানী। বিদ্যারণ্য মুনির আবির্ভাব-কাল খ্রীষ্টীয় ১৪শ-১৫শ শতক। তাঁর মতে, তদানীন্তন সকল রাগের মূলনিয়ামক রাগ বা থাট ছিল মুখারী—যার স্বররূপ ছিল এখনকারই কাফীরাগের (থাটের) মতো—স রি জ্ঞ ম প ধ ণ। অথচ ১৯শ শতকের শেষভাগ অথবা ২০শ শতকের প্রথম ভাগে সকল রাগের মূলনিয়ন্ত্রক বা নিয়ামক-রাগরূপে আত্মপ্রকাশ করলো বিলাবলরাগ বা বিলাবলথাট,—যার সকল স্বররূপ—স রি গ ম প ধ ন (অর্থাৎ সকল স্বরই শুদ্ধ)। সুতরাং প্রাচীন রাগগুলিকে পদ বা গানের রূপে প্রকাশ করতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন হয় স্বররূপের পরিবর্তন। যেমন, দ্বারভাঙ্গার রাগ-তরঙ্গিণীকার লোচন কবি (১৬৫০ খ্রীস্টাব্দ)[১২] ভৈরবরাগকে গৌরীসংস্থান বা গৌরীমেলের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। গৌরীমেলের রূপ বর্তমান হিন্দুস্থানী-পদ্ধতির ভৈরবীমেলের মতো অর্থাৎ স ঋ জ্ঞ ম প দ ণ (ঋষভ, গান্ধার, বৈধত ও নিষাদ কোমল বা বিকৃত)। কিন্তু ৯ম-১১শ শতকের সঙ্গীতশাস্ত্রী জৈন পার্শ্বদেব বলেছেন: ভৈরব-শ্রীরাগৌ-রি-প-হীনৌ * * রাগাংগানি বিদুর্বুধাঃ।" সুতরাং ভৈরব ও শ্রীরাগ পাঁচস্বরের ঔড়বজাতির রাগ। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতির ভৈরব সম্পূর্ণজাতির। সুতরাং এ'থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন কালে বর্ণিত (খ্রীষ্টীয় ১ম-১৩শ অথবা তারও বেশী) রাগরূপগুলি হুবহু প্রাচীনের মতো প্রকাশ করতে গেলে অনেক সময় তা অসমীচীন হবে। তাছাড়া প্রাচীন মূলনিয়ন্ত্রক রাগ বা মেলে ক্রমিক মূর্ছনার পরিবর্তন থেকে আমরা ভৈরবী, কল্যাণ, খামাজ (খম্বাজ বা খাম্বাজ বা খামাইচ্), আঁসাবরী, বিলাবল (বর্তমান পদ্ধতির) রাগগুলিরও রূপবিকাশ পেতে পারি। অবশ্য এ' সমস্তই সঙ্গীতে গাণিতিক বিশ্লেষণের পরিণতি, সুতরাং সাধারণের পক্ষে তা সহজবোধ্য নয় বলে তার আলোচনা থেকে বিরত হলাম। কিন্তু চর্যাগীতিতে

১২। অনেকে দারভাঙ্গা-সংস্করণে উল্লেখ অনুযায়ী রাগতরঙ্গিণীর রচনাকাল নির্ণয় করেন ১১শ শতকে, কিন্তু তা ঠিক নয়। রাগতরঙ্গিণীর আলোচনাভঙ্গি ও রাগরূপসমাবেশ লক্ষ্য করলে তাকে খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের মধ্যভাগের গ্রন্থ বলেই প্রতিপন্ন করা উচিত।

যে সমস্ত শাস্ত্রীয় রাগের উল্লেখ আছে, সেগুলি নিশ্চয়ই সাধক-শিল্পীরা সার্থক-ভাবে প্রকাশ করতেন তাদের রাগে, তালে, রসে ও ভাবে সম্পৃক্ত ক'রে। বর্তমানে ঐ প্রাচীন কালের তথা ৯ম-১১শ শতকের চর্যা ও বজ্র-গীতিগুলিকে গানে প্রকাশ করতে গেলে একটি নিয়মকে আমাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রেই এ' সকল প্রাচীন ও নবীন সঙ্গীতপদ্ধতি তথা রাগপদ্ধতির আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।[১৩] সুতরাং সহজ-বোধ্যভাবে 'গীতগোবিন্দ'-পদগীতিতে রাগরূপের প্রসঙ্গে এগুলির আলোচনা করার চেষ্টা করব।

তবে একথা সত্য যে, প্রাচীন ভারতেও শাস্ত্রীয় রাগ ও তাল সম্পৃক্ত ক'রে যে সকল গান গাওয়া হোত তারা বেশীর ভাগই ছিল নিবদ্ধ-প্রবন্ধশ্রেণীর গান। চর্যাসম্বন্ধেও ঠিক একথা বলা চলে। চর্যাপদগীতি সত্যই নিবদ্ধ, সতাল, ধাতুবদ্ধ ও রাগযুক্ত ছিল। শার্ঙ্গদেব ও বেঙ্কটমখী 'চর্যা'-প্রবন্ধগানকে অঙ্গযুক্ত তারাবলীজাতির গান বলেছেন: "চর্যা রাহড়ী * *। তারাবলী-জাতিমন্তঃ প্রবন্ধাঃ পরিকীর্তিতাঃ।" চর্যাপ্রবন্ধগীতির পরিচয়প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

> পদ্ধড়ীপ্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পাদান্তপ্রাসশোভিতাঃ।
> অধ্যাত্মগোচরা চর্যা স্যাদ্‌দ্বিতীয়াদিতালতঃ॥
> সা দ্বিধা ছন্দসঃ পূর্ত্যা পূর্ণাপূর্ণাত্বপূর্তিতঃ।
> সমধ্রুবা চ বিষয়ধ্রুবেত্যেষা পুনর্দ্বিধা॥ [১৪]

সিংহভূপাল টীকায় বলেছেন: "পদ্ধড়ীতি রাহড়ীমুখ্যানি ছন্দাংসি। যস্যাং পাদানামন্তেঽনুপ্রাসযুক্তঃ; অধ্যাত্ম-বাচকৈঃ পদৈরুপনিবদ্ধা সা চর্যা। দ্বিতীয়াদিতালৈঃ সা কর্তব্যা। তৃতীয়াবহুবচনার্থে তল্‌প্রত্যয়। সা দ্বিপ্রকারা—ছন্দঃপূর্তৌ পূর্ণা; অপূর্তাবপূর্ণঃ। পুনরপি দ্বিধা। সর্বেষাং পাদানামাবৃত্তৌ সমধ্রুবা, ধ্রুবস্যৈবাবৃত্তৌ বিষমধ্রুবেতি।"[১৫] 'কলানিধি'-টীকায় কল্লিনাথ

১৩। এ'সম্বন্ধে লেখকের 'রাগ ও রূপ', ১ম ভাগ, (৩য় সংস্করণ), পৃঃ ৮১ দ্রষ্টব্য।

১৪। সঙ্গীত-রত্নাকর (আডেয়ার সংস্করণ), ২য় ভাগ, পৃঃ ৩০৩-৩০৪

শ্লোকে 'পাদান্ত প্রাসশোভিতাঃ শব্দ হবে 'পাদান্তে অনুপ্রাস-শোভিত'। অবশ্য টীকায় এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

১৫। (ক) ঐ, পৃঃ, ৩০৪,

(খ) লেখকের 'রাগ ও রূপ', ১ম ভাগ (৩য় সংস্করণ), পৃঃ ৮০

আরও বিশদভাবে অর্থ দিয়েছেন। মোটকথা, পদ্ধড়ি, রাহড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত চর্যাগীতির পাদের শেষে অনুপ্রাস থাকে। চর্যা পদনিবদ্ধ ও দ্বিতীয়াদি তালযুক্ত। পূর্ণ ও অপূর্ণভেদে চর্যা আবার দু'রকব ছিল। তাছাড়া সমধ্রুবা বিষমধ্রুবাভেদে চর্যা দু'শ্রেণীর ছিল। সকল পদ আবৃত্তিযুক্ত গীত হলে সমধ্রুবা এবং কেবল ধ্রুব বা ধ্রুবাধাতুর আবৃত্তি থাকলে বিষমধ্রুবাশ্রেণীর চর্যা বলা হোত। চর্যায় বীরবসেব সমাবেশ করতে গেলে রাহড়ীছন্দে পদ তথা গীত রচনা করা হত : "যত্র বীররসেন স্যাৎ * * রাহড়ী পরিকীর্তিতা"। পদ্ধড়ীতে বিরুদ, স্বব ও পাট এই তিনটি অঙ্গ থাকত, আর তারিজন্য চর্যা পদ্ধড়ীছন্দযুক্ত এবং তিন ধাতুযুক্ত ছিল। কল্লিনাথ সেজন্য বলেছেন : "তেনায়ং ত্রিধাতুঃ ছন্দস্তালনিয়মান্নির্যুক্তঃ ; পদতালবদ্ধত্বাদ্দ্যঙ্গ তারাবলীজাতিমান্"। "নির্যুক্ত' বলতে অঙ্গবদ্ধ তথা নিবদ্ধ-প্রবন্ধগীতশ্রেণীর ছিল চর্যাগীতি।

শার্ঙ্গদেব ও বেঙ্কটমখীর এই বিববণ থেকে একথাই প্রমাণিত হয যে, ৯ম-১১শ শতকের বাঙলাদেশে বৌদ্ধ-চর্যাগীতিগুলিও ক্ল্যাসিক্যাল তথা শাস্ত্রীয় ও ট্র্যাডিসনাল শ্রেণীভুক্ত ছিল। হতে পাবে যে, ১৩শ থেকে ১৬শ শতকে গীত চর্যাগীতরীতি গঠনে ও প্রকাশভঙ্গিতে ছিল অনেকটা সহজ সরল, কিন্তু তা যে ৯ম-১১শ শতকের গীতিরূপ ও গীতশৈলীকে ভিত্তি ক'রেই বিকাশলাভ কবেছিল একথা সত্য। ৯ম-১১শ শতকেব পরবর্তী 'গীতগোবিন্দ'-পদগান বা অষ্টপদীগান, কৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলগান, নামকীর্তন, পদাবলীকীর্তন ও অন্যান্য ভক্তিমূলক অভিজাত গানেব যোগসূত্রও চর্যাগীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। মোটকথা চর্যাব গীতরীতি ও প্রেরণাই পরবর্তীকালে সকল গীতিশ্রেণীর সমৃদ্ধির পথে পাথেয়।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ চর্যাগীতির গঠন ও গায়নশৈলী ॥

চর্যাগীতির পরবর্তী পদগান অষ্টপদী বা গীতগোবিন্দ প্রবন্ধশ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত এবং এ'কথা কবি জয়দেবও নিজে স্বীকার ক'রে বলেছেন : "শ্রীবাসুদেবরতি-কেলিকথাসমেনমেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্" (১ম সর্গ, ২য় শ্লোক)। 'বালবোধিনী'-টীকাকার পূজারী গোস্বামীও সে'কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন : "এতৎ শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যা প্রবন্ধং প্রকর্ষেণ বাধ্যতে শ্রোতৃণাং হৃদয়মস্মিন্নিতি প্রবন্ধস্তং করোতি প্রকাশয়তি"। অবশ্য গীতগোবিন্দগানের আলোচনার সময়ে এ'সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। পূর্বেই বলেছি যে, পদাবলীকীর্তনের গীতিরূপ ও গাতশৈলীর যথাযথ আলোচনা করতে হলে খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথম থেকে ১৫শ-১৬শ শতকের বাংলাসাহিত্যে গাথা, গীতিরূপ ও বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক ধারা এবং পরিবেশের আমাদের কিছুটা অনুশীলন করা উচিত, কেননা দীর্ঘ সময়-ব্যবধানের মধ্যে যতগুলি পদসাহিত্য, গীতিরূপ ও কাব্যসম্ভারের সৃষ্টি হয়েছে বাঙলাদেশে—তারাই বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনে যথেষ্ট পরিমাণে উপাদান ও প্রেরণা যুগিয়েছে।

চর্যা ও গীতগোবিন্দ-পদগানের 'পদ'-শব্দটি আবার বিশেষ অর্থবোধক। আমরা খ্রীষ্টীয় ৭ম থেকে ১৪শ শতকের মধ্যে রচিত সঙ্গীতশাস্ত্রগুলি থেকে জানতে পারি যে, 'পদ'-শব্দটি প্রবন্ধ বা প্রবন্ধগানের একটি অঙ্গবিশেষ। পার্শ্বদেব শার্ঙ্গদের ও অন্যান্য সঙ্গীতশাস্ত্রীরা প্রবন্ধের অপরিহার্য 'পদ'-অঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় সকল শ্রেণীর গান বা গীতিরূপকেই প্রবন্ধগানের পর্যায়ভুক্ত

বলেছেন। সেদিক থেকে চর্যা, বজ্র, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গীতি বা গানগুলি প্রবন্ধশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ১৩শ শতকের সঙ্গীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেব, ১৭শ শতকের সঙ্গীতশাস্ত্রী তাঞ্জোবের রঘুনাথ নায়ক ও দক্ষিণ-ভারতের পণ্ডিত বেঙ্কটমখী 'সঙ্গীত-রত্নাকর', 'সঙ্গীতসুধা' ও 'চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা' গ্রন্থগুলিতে চর্যাকে নিঃশংসয়ে প্রবন্ধগীতির পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শার্ঙ্গদেব প্রবন্ধাধ্যায়ে বলেছেন : 'অধ্যাত্মগোচরা চর্যা' (২।২৯৬), অর্থাৎ চর্যাগীতি অধ্যাত্মপ্রকৃতির পবিচায়ক। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-বত্নাকরেব চতুর্থ অধ্যায়ে বিপ্রকীর্ণপ্রবন্ধেব প্রসঙ্গে বলেছেন : "বদনং চর্চ্চরী চর্যা পদ্ধড়ী বাহুডী তথা" (৪।৩২)। শার্ঙ্গদেবের মতো ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ষট্‌পদী,চতুর্মুখ, হংসীলীল, চর্চরী, মঙ্গল, ধবল প্রভৃতিব মতো চর্যাও প্রবন্ধগান। চর্যার প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক গীতিরূপ ও গীতিশৈলী সম্ভবতঃ সহজ সাধারণ হলেও সাধক-শিল্পীদেব সৃষ্টিপ্রতিভায় ক্রমশঃ তা প্রবন্ধরূপ পরিগ্রহ করেছিল। শার্ঙ্গদেব চর্যাগীতির সঠিক রূপ, প্রকৃতি ও গায়নশৈলীর পরিচয় দিয়ে যা বলেছেন তার পরিচয় আমবা পুর্বেই দিয়েছি। মোটকথা পদ্ধড়ী, রাহুডী প্রভৃতি প্রধান ছন্দে চর্যাপদ রচিত হোত এবং তাতে দ্বিতীয়াদি তালের সমাবেশ থাকত (এদেব বিশেষ পরিচয় সঙ্গীত-বত্নাকরে দেওয়া আছে)। সাধারণতঃ সেই গান বা গীতি ছিল দু'রকম : ছন্দপ্রধান ও ছন্দ-অপ্রধান। ছন্দপ্রধান হলে তাকে বলা হোত 'পূর্ণ' এবং ছন্দের প্রাধান্য না থাকলে বলা হোত 'অপূর্ণ'। তারা ছিল আবার সমধ্রুবা ও অসমধ্রুবা-রূপে দু'ভাগে বিভক্ত। সমধ্রুবায় গানে সমগ্র পদের আবৃত্তি করা হোত, আর কেবল ধ্রুবাংশটি আবৃত্তি ক'রে গাওয়া হলে তাকে বলা হোত অসম বা বিষমধ্রুবা ; চর্যায় ধ্রুব ও উদ্‌গ্রাহ ধাতু-দু'টি যখন উদ্‌গ্রাহধাতু অপেক্ষা ধ্রুবধাতুর[১] প্রয়োগ কম হোত তখন তাকে

১। 'ধ্রুব'-শব্দটি বিচিত্র অর্থবোধক। ধ্রুব পদ বা গানের ধাতু, অংশ বা ভাগ। ধ্রুব প্রবন্ধ-হিসাবে ধ্রুবপদপ্রবন্ধ বা ধ্রুপদ। ধ্রুবপ্রবন্ধ বা ধ্রুবপদ(ধ্রুপদ) শাস্ত্রের দৃষ্টিতে সালগ-সূড়-শ্রেণীর। নাট্যশাস্ত্রে 'ধ্রুবা'-নাট্যগীতিব পবিচয় আছে। প্রাচীন নাটকে জাতিরাগেব সঙ্গে ছন্দ, অক্ষর, তাল প্রভৃতি সম্পৃক্ত হয়ে নাট্যগীতি ধ্রুবার ব্যবহাব হোত। তবে মনে রাখতে হবে যে, নাট্যগীতি ধ্রুবা ও ধ্রুবাপ্রবন্ধ জাতিতে ও শ্রেণীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেকেই নাট্যগীতি ধ্রুবাকে ধ্রুবপ্রবন্ধেব সমগোত্রীয় বলে ভুল করেন। আসলে নাট্যধ্রুবা প্রবন্ধজাতীয় ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ থেকে পৃথক।

বলা হোত বিষমধ্রুবাজাতীয় চর্যা। চতুর্থ অভোগধাতুকে পৃথকভাবেই ব্যবহার করা হোত। উদ্‌গ্রাহক, ধ্রুব ও আভোগ এই তিন ধাতুর ব্যবহারে সমগ্র গান বা গীতির প্রকাশ হোত বলে চর্যাপদকে (চর্যাপ্রবন্ধগানকে) 'ত্রিধাতুক' বলা হোত। ত্রিধাতুক চর্যায় মেলাপকধাতুর ব্যবহাব হোত না। অনেক সময় মেলাপক ও আভোগকে বাদ দিয়ে মাত্র উদ্‌গ্রাহ ও ধ্রুব এই দু'টি ধাতুতেই চর্যাগীতি গান কবা হোত। পদ ও তাল এই দু'টি অঙ্গযুক্ত বলে চর্যাকে বলা হোত তারাবলীজাতীয গান বা গীতি ('পদতালবদ্ধত্বাদ্ব্যঙ্গস্তারাবলীজাতীমান্') সেকথা পূর্বেই বলেছি।

এ তো গেল চর্যার গঠন ও গায়নশৈলীব কথা, কিন্তু চর্যায যে সকল রাগের ব্যবহাব হোত তাদেব গঠন ও বিকাশধারার কথাও এখানে কিছুটা আলোচনা কবা উচিত। প্রাচীন ভারতে রাগেব গঠনপ্রকৃতি নির্ধাবিত হোত সাতটি স্বরসম্বন্ধ গ্রামকে নিযে। স্বরসম্বন্ধ গ্রাম ছিল তিনটি—ষড্‌জ, গান্ধার ও মধ্যম। ঐ প্রচলিত রীতি বা ধাবার মধ্যে এলো ক্রমে পরিবর্তন। রাগগুলিব নিযামকরূপে দেখা দিল মূর্ছনা। মূর্ছনার মধ্যেও সাতটি স্বরের দেখি সজ্জা বা বিকাশ। প্রতিটি গ্রামে মূর্ছনা সাতটি ক'বে, সুতরাং তিন গ্রামের মূর্ছনাসংখ্যা একুশটি। গ্রাম তিনটি, সুতরাং মূর্ছনাব সংখ্যা একুশটি (৭ × ৩ = ২১)ব'লে বিচিত্র বাগগুলিকে নিয়মিত কবার রীতি মূর্ছনার সংস্থান মাধ্যমেই প্রচলিত হোল। ক্রমে মূর্ছনার স্থান অধিকার করলো 'থাট' বা ঠাট শব্দ। 'থাট'-শব্দটির ব্যহার ১৭শ শতকের গোডাকাব দিকে পণ্ডিত সোমনাথের 'রাগবিবোধ'-গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'ঠাট' পারসিক শব্দ। এই উভয়ের অর্থই 'গটন' বা 'কাঠামো'। গ্রাম ও মূর্ছনার মতো সাত স্বরের লীলায়ন থাকে থাটেও। সুতরাং ৯ম-১১শ শতকের বজ্র ও চর্যা-গানে যে ভৈরবী, গুর্জরী, বসন্ত, গুণক্রী প্রভৃতি শাস্ত্রীয় রাগের ব্যবহার ছিল সেগুলির একটি নির্দিষ্ট নিয়ামক (Standard) থাট অবশ্যই ছিল একথা সঙ্গীতশাস্ত্রীরা স্বীকার করেন। প্রাচীন ভারতে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় সঙ্গীতধারায় রাগের মূল-নিয়ামক বা নির্ধারক হিসাবে গ্রাম ও মূর্ছনা এই উভয়েরই প্রচলন ছিল। ভরত নাট্যশাস্ত্রে গ্রাম ও মূর্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ভরতের সময়ে (খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে)[২] গ্রাম ছিল

২। নাট্যশাস্ত্রকে অনেকে খৃষ্টপূর্ব যুগে রচিত বলেন। নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন ভরত।

মাত্র দু'টি—ষড্‌জ ও মধ্যম। নানান্ কারণে (সেই বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে) গান্ধারগ্রামের প্রচলন লোপ পেল। সুতরাং গান্ধারগ্রানের সাতটি মূর্ছনার বিলুপ্তিও ঐ সঙ্গে ঘটলো। খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের গ্রন্থ নারদীশিক্ষায় (১ম নারদ-রচিত 'শিক্ষাশাস্ত্রে') গান্ধারগ্রামের সাতটি মূর্ছনাব উল্লেখ আছে। অনেকের মতে, গ্রাম ও মূর্ছনা-সঙ্কটের জন্য তখন থেকেই এক ধরনের শুদ্ধথাটের প্রচলন হোল—যার স্বরবিকাশ ছিল বর্তমান কালেব কাফীরাগের বা থাটের স্বরসজ্জার মতো। বিদ্যারণ্য মুনি-নির্দেশিত শুদ্ধথাট মুখারীর স্বরূপও অনেকটা তাই ছিল। তবে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নির্দিষ্ট কোন শুদ্ধথাটের উল্লেখ নেই। বলা যায় যে, আমাদের প্রাচীন রাগগুলিকে নিরূপণ বা নির্ধারণ করার সুবিধার জন্যই আমরা রাগ-নিয়ামক একটি শুদ্ধথাটের প্রচলন মেনে নিয়েছি এবং সেদিক থেকে খ্রীষ্টীয় ৯ম-১১শ শতকের প্রবন্ধশ্রেণীভুক্ত বজ্র ও চর্যা-গীতিদুটির নির্দিষ্ট নিয়ামক-রূপে একটি শুদ্ধথাটের অস্তিত্বও কল্পনা করা অসমীচীন নয়। তার স্বরবিকাশ ছিল বর্তমান উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতপদ্ধতিব কাফীরাগেব বা থাটেব অনুযায়ী। কিন্তু বর্তমানে বিলাবলকে আমরা বাগ-নিয়ামক শুদ্ধথাট বলে স্বীকার করি। উল্লেখযোগ্য যে, এই শুদ্ধথাটরূপেব বিপর্যয় বা বিবর্তনের জন্য বর্তমানে সকল রাগরূপেও পবিবর্তন দেখা দিয়েছে, আব তারি জন্য প্রাচীন রাগরূপের সঙ্গে বর্তমান বা নবীন বাগরূপের ঠিক মিল পাওয়া যায় না।

পদাবলীকীর্তনের অন্যতম পটভূমিকা চর্যাগীতির আলোচনাব পর অষ্টপদী বা গীতগোবিন্দপদের বিশেষ আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হব। কিন্তু তার আগে 'প্রবন্ধ'-বস্তুসম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমাদের থাকা উচিত। পূর্বেই বলেছি যে, 'পদ' অর্থে গান ছাড়াও প্রবন্ধগানের একটি অঙ্গকে বোঝায়। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীরা বিচিত্র প্রবন্ধগানের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। 'সঙ্গীত-রত্নাকর'-গ্রন্থে প্রবন্ধের পরিচয় দিযে শার্ঙ্গদেব বলেছেন, প্রবন্ধ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—সূড, আলি বা আলিসংশ্রয় ও বিপ্রকীর্ণ। অঙ্গ, তাল, ধাতু

'ভরত' সংজ্ঞা একটি 'পদবী'ও 'ভরত' পদবী বা উপাধিকারী ভবত ছিল প্রায় পাঁচজন। বৃদ্ধ, কোহল, দত্তিল, মতঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্রকারদেব উপাধিও ভরত ছিল। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতকে তাই 'মুনিভরত' বলা-হোত।

প্রভৃতি উপাদানে প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধ হয়ে গান প্রকাশ পেলেই তাকে 'প্রবন্ধ' বলা হোত। শার্ঙ্গদেব বলেছেন : "প্রবন্ধাস্ত্রিবিধা : সূডস্থা আলিসংশ্রয়াঃ বিপ্রকীর্ণাশ্চি" (রত্নাকর ৪।২২-২৩)। তাছাড়া দ্বিধাতু, ত্রিধাতু ও চতুর্ধাতুভেদে প্রবন্ধ আবার তিন রকম। প্রবন্ধের ছয়টি অঙ্গ : "প্রবন্ধোঽঙ্গানি ষট্"। এই ছয়টি অঙ্গের নাম—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট ও তাল। 'স্বর' ষড়্‌জাদি সাত স্বর। 'বিরুদ' অর্থে গুণ বা প্রশংসাবাচক শব্দ : "বিরুদং গুণনাম স্যাৎ"। এই বিরুদ গদ্যে ও পদ্যে রচিত শৌর্য, গুণ, প্রশংসা, ধৈর্য, স্তুতিপ্রকাশক : "তেন স্যান্মঙ্গলার্থপ্রকাশকঃ"। বিরুদের অর্থ-সার্থকতার সঙ্গে কীর্তনের কীর্তি-গাথাগান কীর্তনের অর্থের বা অর্থ-সার্থকতার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তবে প্রবন্ধাঙ্গ বিরুদ ও প্রবন্ধরূপে কীর্তন এক বস্তু নয়। 'পাট' অর্থে বাদ্যের বোলা—যেগুলি মুখে মুখে উচ্চারণ করা হোত : "পাটো বাদ্যোক্ষারোৎকরঃ" এবং 'তাল' মাত্রার সমষ্টি ও গানের সঙ্গতির থাক। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থের সঙ্গীতাংশে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই অঙ্গগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

স্বর বিরুদ পদ তেনক পাঠ তাল।
এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল॥
স্বর স রি গ ম প ধা দিক নিরূপয়।
গুণ-নাম-যুক্ত মতে বিরুদ কহয়॥
পদ শব্দ বাচক প্রকার বহু ইথে।
তেনা তেনাদিক শব্দ মঙ্গল নিমিত্তে॥
পাট বাদ্যোদ্ভবাক্ষর ধা ধা ধিলঙ্গাদি।
তাল চচ্চাৎপুট যত্যাদিক যথাবিধি॥
এ' ষডঙ্গ প্রাচীন আচার্য নিরূপয়।
বাক্য স্বর তাল তেনা চারি কেহ কয়॥

প্রবন্ধগানের জাতি আছে ও সে' জাতি পাঁচটি। যেমন,

মেদিন্যাথানন্দিনী স্যাদ্দীপনী ভাবনী তথা॥
তারাবলীতি পঞ্চ স্যুঃ প্রবন্ধানাঞ্চ্তু জাতয়॥[৩]

৩। ঘনশ্যাম নরহরি চক্রবর্তী লিখিত 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' ও 'গীত-চন্দ্রোদয়' গ্রন্থদুটিও দ্রষ্টব্য। লেখক কর্তৃক সম্পাদিত সংস্কৃত 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে

অর্থাৎ মেদিনী, আনন্দিনী, দীপনী, ভাবনী ও তারাবলী এই পাঁচটি জাতি। এদের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে রত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল বলেছেন : "ষড়্ভিরঙ্গৈরূপনিবদ্ধা মেদিনীত্যুচ্যতে ; পঞ্চভিরঙ্গৈরুপানিবদ্ধা আনন্দিনী ; চতুর্ভিরঙ্গৈরূপনিবদ্ধা দীপনী ; ত্রিভিরঙ্গৈরূপনিবদ্ধাভাবনী ; দ্বাভ্যামঙ্গাভ্যামুপনিবদ্ধা তারাবলীতি" ; অর্থাৎ ছয়টি অঙ্গ প্রবন্ধের নাম মেদিনী, পাঁচ অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধ আনন্দিনী, চার অঙ্গযুক্ত দীপনী, তিন অঙ্গযুক্ত ভাবনী ও দু'টি অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধ ছিল তারাবলীজাতি। শার্ঙ্গদেব "কেষাংচন মতে" বলে অন্য মতানুযায়ী শ্রুতি, নীতি, সেনা, কবিতা ও চম্পূ এই পাঁচটি জাতির নামও উল্লেখ করেছেন। এই অন্য মতের জাতিগুলিও মেদিনী প্রভৃতির মতো সমান অঙ্গযুক্ত। শেষোক্ত চম্পূজাতি গদ্য ও পদ্যযুক্ত পদের সমজাতীয়। প্রবন্ধগান আবার নির্যুক্ত ও অনিযুক্ত ভেদে দুরকম। অনির্যুক্ত প্রবন্ধ ছন্দ, তাল প্রভৃতির নিয়মাধীন নয়, কিন্তু নির্যুক্তপ্রবন্ধে যথারীতি ছন্দ ও তালের সমাবেশ থাকে।

(দুই)

চর্যা-সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনার প্রয়োজন, কেননা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের অভিমত : "বৌদ্ধগানগুলিই (চর্যা)[৪] পরবর্তীকালের মহাজন-পদাবলী ও মুসলমানি মারফতী-গানের পূর্বরূপ (proto-type)। এক সময়ে নাথগণের চর্যাগীতি সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পারস্য-সাহিত্যের গজলগীতিরও পূর্বরূপ চর্যাগীতি। পরবর্তীকালে হিন্দী ভাষায় দোহা রচনা তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতি দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।"[৫] তিনি পুনরায় লিখেছেন: "আমরা দেখিয়াছি যে, গীতগোবিন্দ, বৌদ্ধগান (চর্যা) দ্বারা প্রভাবান্বিত। আর এই গীতগোবিন্দই বৈষ্ণব-পদাবলীর আদিম আদর্শ। জয়দেব স্বয়ং 'পদাবলী'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—

প্রকাশিত এবং 'গীতচন্দ্রোদয়' লেখকের 'রাগ ও রূপ' গ্রন্থের ২য় ভাগে অন্তর্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

৪। অনেকে লিখেন 'চর্য্যা', কিন্তু 'চর্যা' শব্দই ঠিক।

৫। 'বাঙলা সাহিত্যের কথা' (১ম খণ্ড, ঢাকা ১৯৫৩), পৃঃ ৯

মধুর কোমল-কান্ত-পদাবলীং,
শৃনু তদা জয়দেবী-সরস্বতীম্।

পদাবলীর কবিগণের মধ্যে সর্বপ্রাচীন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (যাহার আদি নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ') আমরা পাইয়াছি।* * বৌদ্ধগানের 'শূন্যতা' বৈষ্ণব-পদাবলীতে 'রাধা' হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন রাগ ও ভণিতা একরূপই আছে। কাজেই আমরা বলিতে পারি যে, বৌদ্ধগানই (চর্যা ও বজ্রগীতি) যেমন একদিকে গজলের, তেমনি অন্যদিকে বৈষ্ণব-পদাবলীর মূল-উৎস। ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই দিক দিয়া বৌদ্ধ-চর্যাগানের এক বিশেষ মূল্য আছে।'[৬]

চর্যা বা চর্যাগীতির ভাষা-সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেছেন 'সন্ধ্যাভাষা'—যা আলো-আঁধারি ভাষা,—কিছু বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর *An Introduction to Buddhist Esoterism* (p. 32)-গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন: "They (Vajrayani Mahasiddhas) wrote (*gitis* or songs) in a language which was designated by them as the Sandhyābhāsā, or the twilight language, meaning these by that the contents may be explained either by the light of day, or by the darkness of night. The songs composed by the Mahasiddhas were all written in this language, which had always a hidden or a mystic meaning";[7] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর *Buddhist Mystic Songs*-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "The original text with its Sanskrit commentary was edited by M.M. Haraprasad Shastri from a unique MS. obtained from Nepal. It was published in Bengali character under the title '*Charyūcharya-Vinishchaya*' in a volume with other works entitled *Banddha Gān-O-Dohū* by the Vangiya Sahitya

৬। ঐ, পৃ: ১৬
7. p. 35.

Parishat of Calcutta in 1323 B. E (=1916 A D.)।"[8] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, চর্য্যা, (চর্যা) আলো-আঁধারি ভাষায় লেখা মন্তব্য-সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী বলেছেন, ভাষাটি মূলে সন্ধ্যাভাষা নয়, পরন্তু সন্ধাভাষা (সম্+ধা)—একটি বিশেষ অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় নিয়ে প্রয়োগ করা ভাষা, সুতরাং অশিক্ষিত লিপিকারগণের ভ্রম বা প্রমাদবশতই 'সন্ধাভাষা' পরবর্তীকালে বিকৃত সন্ধ্যাভাষায় রূপান্তরিত হওয়া স্বাভাবিক।[৯] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'-গ্রন্থে লিখেছেন : "সহজিয়া ধর্মের সকল বইই সন্ধ্যাভাষায় লিখা। সন্ধ্যাভাষার মানে, আলো আঁধারি ভাষা—কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। অর্থাৎ এই সকল উচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে" (পৃঃ ৮)। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন : "আমার মনে হয়, সন্ধাভাষা কথাটিই পরবর্তীকালে আভিপ্রায়িক অর্থ হইতে অস্পষ্ট আলো-আঁধারি ভাষার একটা অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই ভাবেই সন্ধাভাষা সন্ধ্যাভাষাতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।"[১০]

ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, কতকগুলি চর্যাগীতিতে তত্ত্ব-উপদেশ ও সাধনার ইঙ্গিত সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হইয়াছে বাহ্য অর্থের ঢাকনায়। এই ধরনের চর্যায় এমন শব্দ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করা হইয়াছে যাহার দুইটি অর্থ একটি অর্থ—সাধারণের ভাষা, অপর অর্থ—চর্যাকর্তাদের সাধনার পারিভাষিক, যেন তাঁহাদেরই প্রাইভেট কোড্। এইরূপ দ্ব্যর্থ শব্দ ও প্রকাশরীতিকে সরহের দোহাকোষের 'পঞ্জিকা'-কার অদ্বয়বজ্র এবং চর্যগীতিকোষের বৃত্তিকার মুনিদত্ত বলিয়াছেন সন্ধ্যাভাষা (সন্ধাভাষা), সন্ধ্যাভাষা, সন্ধ্যাবচন, সন্ধ্যাসংকেত, অথবা শুধু সন্ধ্যা। ডক্টর সুকুমার সেন মঃমঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য খণ্ডন ক'রে লিখেছেন : "একথা ঠিক নয়। সন্ধ্যা

8. Published in the *Dacca University Studies*, Vol. IV January, 1940, No. II.

৯। Vide (a) Sastri : *Sandhabhasa* (in the Indian Historical Quaterly, Vol. IV, 1928 ; (b) Dr. P. C. Bagchi : *Sandhabhasa* and *Sandhavachana* (in Studies in Tanra, 1939).

১০। বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি (১৩৬৩), পৃঃ ১৩২

(সন্ধা) ভাষাব কোন সম্পর্ক নাই দিবাবাত্রিব মোহানাব সঙ্গে। * * যে ভাষার বা শব্দেব অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয়, অথবা যে ভাষাব শব্দেব অর্থ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, তাহাই সন্ধ্যা (সন্ধা) ভাষা।"[১১] অধ্যাপক তাবাপদ মুখোপাধ্যায় আব একটু সুচিন্তিতভাবে বিচার ক'বে বলেছেন : "তান্ত্রিক বৌদ্ধ যোগীদের সাধনপদ্ধতি গুহ্য ব্যাপার। সাধনাব এই গুহ্যত্ব বজায় বাখবাব উদ্দেশ্যে তাঁবা কতকগুলি কায়িক এবং বাচনিক সংকেত সৃষ্টি কবেছিলেন। * * এই সংকেতেব তাৎপর্য কেবলমাত্র যোগীদেবই বোধগম্য ছিল। * * হেবজ্রব্যাখ্যাবিববণে আরও বলা হয়েছে, চর্যাবত যোগী যখন পীঠ এবং ক্ষেত্রে যোগিনীব সন্ধানে ঘুবে বেড়াবে তখন কায়িক সংকেতেব দ্বাবাই যোগিনীব সঙ্গে ভাবেব আদান-প্রদান কববে।[১২] 'হেবজ্রতন্ত্র'-গ্রন্থেব ১ম খণ্ডেব ৭ম পটলে ও ২য় খণ্ডেব ৩য় পটলে বিভিন্ন অঙ্গুলি ও দৃষ্টি-সংকেতেব প্রকাশই ছোম্বা বা কায়িক সংকেত। এই সংকেত বা ভাষাব বহস্য শ্রাবকবাই ভেদ কবতে পাবত।"[১৩]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধতন্ত্রেব মতো হিন্দুতন্ত্রেও সাংকেতিক ও দ্ব্যর্থ ভাষাব প্রচলন ছিল। কৌলোপনিষদে "প্রাকট্যং ন কুর্যাৎ" (২৭) "আত্মবহস্যং ন বদেৎ (৩১), "গুপ্তা কুলবধূবিব", "পীত্বা পীত্বা পুন পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে" প্রভৃতি। পবশুবামকল্পসূত্রে এদেব দুটি অর্থেব বিশ্লেষণ আছে।

চর্যার অর্থ আচাব বা আচবণ। এগুলি গান করা হোত। 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়'-গ্রন্থে যে চর্যাব উল্লেখ আছে : "শৃণু ত্বং বীবচামুণ্ডে পাত্রাণাং চর্য্যলক্ষণম্" (১২।৩)—এব অর্থ বহস্যমূলক আচবণ (mystic practice)। চর্যাকে তাই গেয় গাথা বা সাহিত্য বলা যায়। চর্যাগীতিগুলি একই সময়ে রচিত হয় নি। বহুকাল ধবে এগুলি মুখে মুখে প্রচলিত ছিল ও গান করা হোত। বৈষ্ণব-পদাবলীর মতো চর্যাগীতিতে ভণিতা আছে ও কবির নাম ভণিতায় উল্লিখিত। গান বা গীতিগুলি অধ্যাত্ম-সহজসাধনার অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হোত এবং সে' গানগুলি ছিল গুপ্তসাধনার জন্য অভিপ্রেত এবং বৌদ্ধ-অধ্যাত্মসাধনার

১১। চর্যাগীতি-পদাবলী (১৯৫৬), পৃঃ ২৩—২৪

১২। চর্যাগীতি (বিশ্বভারতী, ১৩৭২), পৃঃ ৩৮

১৩। ঐ, পৃঃ ৩৮

উদ্বোধক ও পথনির্দেশক। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়'-গ্রন্থের অন্তর্গত অকুলবীরতন্ত্রে বজ্রযোগ ও সহজানন্দ-রূপ সামরস্য বা মুক্তির কথা আছে,

সর্বজ্ঞং সর্বমাসৃত্য সর্বতো হিতলক্ষণম্।

* * *

ভাবাভাববিনির্মুক্ত উদয়াস্তমনবর্জিতঃ।

স্বভাবমতিমতং শান্তং মনো যস্য মনোময়ম্॥ ১১-১৪

যখন সাধক সহজ-সাধনায় কৃতকার্য হন, তখন তাঁর অবস্থা হয়—

কার্যকারণনির্মুক্তমচিন্ত্যকমনামযম্।

মায়াতীতং নিরালম্বং ব্যাপকং সর্বতোমুখম্॥

সমত্বঞ্চ একভূতঞ্চ * * *। ৩৩।৩৪

বৌদ্ধ-বজ্রযানী সাধকরা চর্যাগীতির ব্যবহার করতেন তাঁদের অধ্যাত্মসাধনার অনুকূলে এবং সাধকরা প্রভাস্বর মহাসুখময় সহজানন্দকে লাভ ক'রে কৃত-কৃতার্থ হতেন। অকুলবীরতন্ত্রে (বৌদ্ধ-বজ্রযানীদের তন্ত্র) এই সহজানন্দের বর্ণনা এরূপ—

দগ্ধবীজস্য সংভূতির্যথা নৈব প্রপদ্যতে॥ '

মূলচ্ছিন্নো যথা বৃক্ষঃ প্ররোহন্নৈব বিদ্যতে।

অকুলবীরস্য বৈ তদ্বদ্ন পুনর্ভববন্ধনম্॥ ৮৩-৮৪

সহজকামী বৌদ্ধসাধকগণ ভব বা অস্তিত্ব (বাসনা) ও নির্বাণ বা অনস্তিত্বের (নির্বাসনা) পারে—ইতি ও নেতির পারে অবধূতিকা পথে ঊর্ধে স্থিত হয়ে অদ্বয় বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ-রূপ মহাসুখ লাভ করেন।

চর্যাগীতির অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে চর্যা-রচয়িতা বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্যদের সাধনতত্ত্ব ও অনুভূতিতত্ত্বেরও কিছুটা অনুশীলন করা দরকার, কেননা চর্যা-গীতি যেমন ভাবসিদ্ধ অনুভূতির দ্বারা প্রদীপ্ত, চর্যার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বৈষ্ণব-পদাবলীগুলিও তেমনি অনুভূতিরসে নিবিড়ভাবে সিক্ত। চর্যাগীতি মন্ত্রশক্তির মতো বজ্রযানী সাধকদের চিত্তকে সংযত ও জ্ঞানলাভের পথে প্রবুদ্ধ করত। অবধূতিকা-পথে চর্যা ছিল প্রেরণাদানের উৎসস্বরূপ।

এক্ষণে দেখা যাক্, বজ্রযানী বৌদ্ধ-সিদ্ধসাধকগণের সাধনতত্ত্বের রূপ কি ছিল—যে রূপকে গ্রহণ ও অনুভব ক'রে তাঁরা সহজানন্দ লাভ করতেন। বাঙালাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ঘটে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং

চর্যাকারগণ সকলেই ছিলেন সহজিয়া-সাধক। সহজিয়া-বৌদ্ধধর্মের বিকাশ মহাযান-ধর্মমত থেকে। মহাযান মতে, শূন্যতার সঙ্গে মহাকরুণার মিলন অবিচ্ছেদ্যভাবে। করুণার বিশুদ্ধির জন্যই শূন্যতার সার্থকতা ও সেজন্য চর্যাগানগুলিতে বা তান্ত্রিক দোঁহাগীতিগুলিতে করুণার স্পর্শ পাই আমরা বিশেষভাবে। মহাযানীদের মধ্যে যারা আবার মন্ত্রনয়ের উপর বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা মুদ্রা, মণ্ডল, মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী প্রভৃতির প্রচলন ক'রে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে বজ্রযান রূপে রূপায়িত করেন। 'বজ্র' শব্দের অর্থ 'শূন্যতা' ও সেজন্য বজ্রযানের মূল অর্থ 'শূন্যতাযান'। তাই' বজ্রযানের পূজাবিধি, মন্ত্র, দেবদেবী, সাধনতত্ত্ব ও সাধনসামগ্রী সমস্তই বজ্রচিহ্নিত ছিল। নেপালে বজ্রযান থেকে ক্রমশঃ কালচক্রযানের উদ্ভব হোল। কালচক্রযানের সাধনবৈশিষ্ট্য হোল শ্বাসপ্রশ্বাসধারার উপর আধিপত্য করা ও শ্বাসপ্রশ্বাসকে নিরুদ্ধ ক'রে কালচক্রকে অতিক্রম করা। সহজযানী সাধকরা বজ্রযানী ও কালচক্রযানীদেরই সমন্বিত রূপ। সহজযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার্যদের সাধ্য ও সাধন উভয়ই ছিল 'সহজ' এবং এই 'সহজ'-স্বরূপই চিরপরিবর্তনের মধ্যে এক অপরিবর্তনীয় অদ্বয় রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং এই অদ্বয়রূপে আসীন হওয়ার নামই মহাসুখ বা সহজানন্দ লাভ।[১৪]

বৌদ্ধ-সহজিয়া বা বৌদ্ধ সহজযান মতাবলম্বীদের মহাসুখতত্ত্ব-সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন: "* * Sunyavada of Nagarjuna was supplemented by that of the Vijnanavada of Maitreya, but to some minds there is little difference between the two. * * So another idea was thought in, and that is the idea of Mahasukha. * * But what is Mahasukha? It is a result of the union of two principles, existence in one principle and the existence is another principle, but they are one and the same, * * The Bodhi is pleasure, because without pleasure

১৪। এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা (ক) ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-লিখিত *Buddhist Esoterism*, chapt. III (খ) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-লিখিত 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ' গ্রন্থের Introduction এবং (গ) ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত-লিখিত 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি' দ্রষ্টব্য।

there is no Bodhi"। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' বা তথাগতগুহ্যকতন্ত্রের ইংরাজী ভূমিকায়ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ-দেবদেবী ও পূজাবিধির উল্লেখ করেছেন। 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ৩য় শতকে আচার্য অসঙ্গ রচনা করেন। গুহ্যসমাজতন্ত্রের পূর্বে খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামে তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিত হয় এবং 'জ্ঞানসিদ্ধি'-গ্রন্থকার ইন্দ্রভূতি ঐ দুটি তন্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন। গুহ্যসমাজতন্ত্রের রচয়িতা অসঙ্গ যোগাচারী ছিলেন এবং সম্ভবত এই অসঙ্গ 'পারমিতা-সাধনা'র প্রবর্তক অসঙ্গ থেকে ভিন্ন ব্যক্তি। অবশ্য এটি নিয়ে মতভেদ আছে। তবে বজ্রযানী সাধকদের মধ্যে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ ও বুদ্ধশক্তি এবং ধারণী, মণ্ডল, মন্ত্র প্রভৃতির প্রবর্তন করে বিশেষভাবে গুহ্যসমাজতন্ত্র। শুদ্ধচিত্ত বৌদ্ধযোগীরা মন্ত্রে মন নিবিষ্ট করেন ও তখনই সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ সংবৃতি বা মায়ায় পরিণত হয় ও মনের বা চিত্তের বা বোধির তখন স্থিতি হয় অদ্বয়তত্ত্বে। তখন বাহ্য ও অন্তর বিশুদ্ধতা-রূপ অদ্বয়তত্ত্বে ও সত্যে প্রজ্ঞা ও উপায়ের (শিব ও শক্তির বা বিন্দু ও নাদের) লয় হয় সিদ্ধযোগী 'মহাসুখ' উপলব্ধি করেন।[১৫]

ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধধর্মের বিকাশ-সম্পর্কে বলেছেন, যোগাচারী বৌদ্ধরা মাধ্যমিকদের শূন্যতার সত্তাকে বাদ না দিয়ে শূন্যতার সঙ্গে বিজ্ঞানের সহচারিতা স্বীকার করেন। তখন মাধ্যমিকদের 'শূন্যতা' সত্তাসমপন্ন 'তথতা'-য় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং যোগাচারের পাশাপাশি মহাসুখবাদের অভ্যুত্থান হয় ও নাম গ্রহণ করে, বজ্রযান বা 'the ament-vehicle'। বজ্রযানের মধ্যে নির্বাণ রূপ পেল শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ এই ত্রিতত্ত্বের রূপ নিয়ে এবং এই ত্রিত্ত্বকেই বজ্রযানীরা নাম দিলেন 'বজ্র' নামে, কেননা এই বজ্রের স্বরূপ ও প্রকৃতি স্থির, অবিনশ্বর ও অচ্ছেদ্য।

দৃঢ়ং সারমসৌশীর্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অনাদি অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্রমুচ্যতে ॥[১৬]

বজ্রযানী বৌদ্ধসাধকরা কল্পনা করলেন শূন্যই নৈরাত্মাদেবী—যাঁর অনন্ত গর্ভে ব্যষ্টিচিত্ত-রূপ বোধিচিত্ত বা বিজ্ঞানের বিকাশ অক্ষুণ্ণ থাকে। ক্রমে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মরূপ বজ্রযানের মধ্যে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন, রত্নসম্ভব,

১৫। Introduction to *Advayavaja-samgraha*, pp. XXXII—XXXIII.

১৬। অদ্বয়বজ্রসংগ্রহে পঞ্চতথাগতমুদ্রাবিবরণম, (বরোদা সং), পৃঃ ২৩

অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্যের কল্পনা হোল।[১৭] সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হোল দেহশুদ্ধি, কায়া বা কায়-সাধনের তত্ত্ব, কেননা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দেহের মধ্যে পঞ্চ স্কন্ধাত্মক পাঁচটি নাড়ী ও পাঁচটি তথাগত বা ধ্যানীবুদ্ধের কল্পনার সংক্রমণ অপরিহার্য হোল। তাই একটি চর্যাগীতিতেও উল্লেখ দেখি—

পঞ্চ তথাগত কিঅ কেডুআল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল।
* *
চিঅ কণ্ণহার সুণত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে॥

ধ্যানীবুদ্ধগণের সঙ্গে পঞ্চশক্তিরও কল্পনা করা হয়েছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সাধনায়।

মোটকথা সহজিয়া-সাধনায় সমরস বা সামরস্য-রূপ সহজানন্দ লাভ করাই ছিল বৌদ্ধ-চর্যারচয়িতা সহজ-সাধকদের উদ্দেশ্য। সরহপাদ একটি দোঁহাতে বলেছেন,

সঙ্কপাস তোড়হু গুরুবঅণেঁ
ণ্ন সুনই সোণউ দীসই ন অণেঁ॥
* * *
ণউ বট্টই ণ তনুন্তে ণ বজ্জই।
সমরস সহজাণন্দ জাণিজ্জই॥

সহজই সহজানন্দ এবং সহজকে উপলব্ধি করতে পারলেই নির্বিকল্প পরমানন্দ লাভ হয়। পরমানন্দস্বরূপ সহজানন্দ অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য —যেভাবে আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'-গ্রন্থে শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন: "সহজধর্মে বাচ্য নাই, বাচক নাই এবং ইহাদের সম্বন্ধও নাই। যে যে উপায়ে মুক্তির উপায় করুক না কেন, শেষে সকলকে সহজপথেই আসিতে হইবে। * * ভাবও নাই, অভাবও নাই; সকলই শূন্যরূপ, অর্থাৎ ভব ও নির্বাণে কোন ভেদ নাই, দুই এক সুতরাং সহজিয়ারা অদ্বয়বাদী" (পৃঃ ৮)। এই সহজ বা সহজানন্দকে বৌদ্ধতন্ত্রে

১৭। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্য্যাগীতি' পৃঃ ৬৫-৬৬ দ্রষ্টব্য।

মহাসুখ নৈরাত্মা বলা হয়েছে এবং 'জ্ঞানসিদ্ধি'-গ্রন্থের ৭ম পরিচ্ছেদে এই মহাসুখবাদের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়েছে।[১৮] অবশ্য সুত্তনিপাতে, ধম্মপদে, অঙ্গুত্তর-নিকায়ে নিব্বাণ বা নির্বাণকেই 'পরমসুখ' বা সহজানন্দ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—"নিব্বাণং পরমং সুখম্'।

এখানে মনে রাখা উচিত যে, বৌদ্ধ-তন্ত্রসাধনা হিন্দু ও নাথধর্মের যোগা-নুষ্ঠানপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল[১৯] এবং চর্যাপদে যোগশাস্ত্রের মতো ইডা, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর উল্লেখ আছে, নদীর উজান প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এখানে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'বৌদ্ধগান চর্যাগীতি' গ্রন্থ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিলাম বিষয়টি বিশেষভাবে বোধগম্যের জন্য। তিনি লিখেছেন: "যোগ-সাধনার দিক হইতে দেখিতে পাইব, আমাদের দেহের মধ্যে তিনটি প্রধান নাড়ী আছে: একটি বামগা—শ্বাসবাহী নাড়ী বা প্রাণবাহী নাড়ী, অপরটি হইল দক্ষিণগা—প্রশ্বাসবাহী নাড়ী বা আপনবাহী নাড়া: এই দুই হইল দেহ-মধ্যে সর্বপ্রকার দ্বৈততত্ত্বের প্রতীক বা প্রতিনিধি, আর একটি নাড়ী আছে মধ্যগা নাড়ী,—তাহাকে বৌদ্ধতন্ত্রে বলা হয় অবধূতি বা অবধূতিকা। * * তাহাদের স্বাভাবিক নিম্নগা ধারাকে অবধূতিকা-পথে উর্ধ্বগা করিতে পারিলে অদ্বয়বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ-রূপ মহাসুখ লাভ হয়।[২০]

সিদ্ধাচার্য সরহপাদ যোগসাধনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

> এথু সে সুরসরি জমুণা
> এথু সে গঙ্গাসাঅরু।
> এথু পআগ বণারসি
> এথু সে চন্দ দিবাঅরু॥ প্রভৃতি

এথু অর্থে এখানে বা এই দেহেই সুরসরি বা সুরসরিৎ গঙ্গা ও জমুণা বা যমুণা এবং এখানে বা এই দেহেই গঙ্গাসাগর, প্রয়াগ ও বারাণসী, চন্দ্র, সূর্য

১৮। Vide *Two Vajrayana Works*, G.O.S , No. XLIV, p. 57, and vide also *Advayavayaja-samgraha*, p. XXXVIII.

১৯। অবশ্য মঃমঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকের অভিমত যে, হিন্দুতন্ত্রই বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী, অথবা বৌদ্ধতন্ত্রের আচার, পূজানুষ্ঠান, মন্ত্র, যন্ত্র ও দেবদেবীরা হিন্দুতন্ত্রে অনুপ্রবেশ করেছিল। অবশ্য এই মতবাদের অনেকেই পক্ষপাতী নন।

২০। পৃঃ ৯৫

(দিবাঅরু) প্রভৃতি বিরাজিত। সুতরাং সকল তীর্থে ভ্রমণ ক'রে শান্তি নাই, আছে সহজানন্দে সুখ ও শান্তি। সরহপাদের এই চর্যাগীতি সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন, কাশী কাঞ্চী সবই আছে শ্যামা-মার চরণতলে ও কমলাকান্ত বলেছেন—

তীর্থভ্রমণ দুঃখগমন, মন-উচাটন হয়ো নারে।
আনন্দে ত্রিবেণী স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে॥

ত্রিবেণী কিনা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী তথা ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সঙ্গম রূপ। তিনটি নাড়ীই মূলাধারে ও সহস্রারে মিশ্রিত এবং মূলাধার ও সহস্রারই শক্তি ও শিবের স্থান এবং সামরস্য-আনন্দ ঐ দুটি স্থানেই সম্ভব হতে পারে। হটযোগপ্রদীপিকা, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র প্রভৃতিতে শিবশক্তিসামরস্যের উল্লেখ আছে এবং বৌদ্ধতন্ত্রেও আছে। শিবকে বিন্দুরূপে ও শক্তিকে নাদ-রূপে তন্ত্রে কল্পনা করা হয়েছে। শিব নিবৃত্তিতত্ত্ব ও ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি প্রবৃত্তিতত্ত্ব। এই নিবৃত্তি-প্রবৃত্তিতত্ত্বের নিম্নগা ধারায় সংবৃতি, মায়া বা ভব (সংসারপ্রবাহ ও প্রবৃত্তি) এবং এদের মিলনের উর্ধ্বগা ধারায় অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠা, এবং সহজানন্দ বা মহাসুখপ্রাপ্তি। বৌদ্ধতন্ত্রমতে, বিন্দু—প্রজ্ঞা এবং নাদ —উপায়, সুতরাং বিন্দু ও নাদ বা প্রজ্ঞা ও উপায়ের উর্ধধারার-মিলনে 'অবধূতিকামার্গ'। এই মার্গ অনুসরণ ক'রে স্রোতে উজান দিয়ে উল্টাসাধন করলে মহাসুখ, সহজানন্দ বা সামরস্য লাভ হয়। এই সামরস্য দেহের মধ্যেই থাকে, এজন্য বৌদ্ধ-বজ্রযানী সিদ্ধাচার্যগণ, সহজিয়াগন ও বাউল-সাধকগণ, কায়া বা কায়সাধন ও উল্টাসাধনের পক্ষপাতী। উল্টাসাধনায় চর্যারচয়িতা বৌদ্ধসাধকরা অবধূতি বা অবধূতিকাকে বা নৈরাত্মাদেবীকে লাভ করেন সহজানন্দ লাভের জন্য। চর্যাগীতির তত্ত্বকথা ও মর্মকথা তাই। চর্যাগীতি অধ্যাত্মসাধনার গান এবং 'গীতগোবিন্দ'-পদগান ও বৈষ্ণব-পদাবলী-কীর্তনের প্রতিষ্ঠা বা পাদভূমি। চর্যার অবধূতিকাই গীত-গোবিন্দ ও পদাবলীকীর্তনের শ্রীরাধা এবং পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ-রাধার সমন্বয়মূর্তি রসভাবঘন শ্রীচৈতন্য বা শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ বাঙলাদেশ সঙ্গীতের দেশ ॥

বাংলা-সাহিত্য ও পদাবলীকীর্তনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সীমা ও পরিবেশ এবং তার সঙ্গীতের ইতিহাস কী ধরনের ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা পরিচয় থাকা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিকাশ-ধারার ইতিবৃত্তও আমাদের জানা সমীচীন।

বাঙলাদেশ সঙ্গীতের দেশ। বাঙলার নগর ও পল্লী (নাগর ও গ্রামীন) এই উভয় সমাজেই মানবজীবনযাত্রার প্রতিটি গতি ও ছন্দের সঙ্গে নৃত্য-গীত-বাদ্য বা সঙ্গীতের নিবিড় সম্পর্ক ছিল এবং এখনও আছে। বৃহত্তর-বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ ও উপাদানই ছিল গীতি বা গান—তা সে ছড়ার আকারেই হোক, হেঁয়ালী বা প্রবাদের আকারেই হোক, ব্রতানুষ্ঠান, বিবাহ ও অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানসম্পর্কেই হোক। গিরিব্রজ বা বিহার, কলিঙ্গ বা উড়িষ্যা এবং কামরূপ বা আসাম নিয়ে অখণ্ড বাঙলাদেশ ছিল বৃহত্তর-বাঙলার রূপ সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মিথিলা ছিল তখন বৃহৎ-বঙ্গের অপরিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং দ্বার-বঙ্গ (দ্বারভাঙ্গা) ছিল বাঙলাদেশের প্রবেশপথ। উৎকল বা উড়িষ্যার কথাও তাই। এমনকি চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বাঙলা ও উড়িষ্যার মধ্যে পৃথক কোন সীমারেখার অস্তিত্ব ছিল না। পঞ্চগৌড়ের মধ্যে কলিঙ্গ>উৎকল>উড়িষ্যা ছিল অন্যতম। দক্ষিণরাঢ়ের সিংহপুর ছিল একসময়ে বৃহৎ-উড়িষ্যার প্রধান রাষ্ট্রকেন্দ্র। গৌড়ের সীমারেখাও বিস্তৃত ছিল লক্ষ্মণাবতী বা বর্তমান মালদহ জলা পর্যন্ত। কামসূত্রের টীকাকার যশোধরের মতে, গৌড়-বঙ্গের

বিস্তৃতি ছিল কলিঙ্গদেশ বা উড়িষ্যা পর্যন্ত। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বঙ্গের বা গৌড়-বঙ্গের যে রূপের পরিচয় দেওয়া আছে তা থেকে জানা যায়, মধ্য ও পূর্ব-বাঙলা থেকে শুরু ক'রে ভুবনেশ্বর (উড়িষ্যা) পর্যন্ত বিশাল ভূমিখণ্ডই ছিল বঙ্গদেশ বা বাঙলা, কেননা পঞ্চগৌড় বলতে তখন বোঝাতো সারস্বত বা পূর্বপঞ্জাব, কান্যকুব্জ, মিথিলা (উত্তর-বিহার) ও উৎকল (উত্তর-উড়িষ্যা)। স্কন্দপুরাণাদিতেও এ'ধরনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

'বাঙলা' বা 'বঙ্গাল' শব্দ বা নামটি নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। 'আইন-ই-অকবরী'-গ্রন্থে আবুল ফজল 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' এই দু'টি শব্দেরই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "The original name of Bengal was Banga. Its former Rulers raised mounds, measuring ten yeards in height and twenty in breadth, throughout the province, which were called āl. From this suffix (āl), the name Bengal took its rise and currency" (English translation)। ভারতের ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবর ও লামা তারানাথের সময়ে 'আল'-শব্দটি অন্য নামে অর্থাৎ 'ভাটি' পরিচিত ছিল। দক্ষিণ-ভারতের ও অন্যান্য দেশের কতকগুলি তাম্রলিপি ও শিলা-লেখতে দেখা যায়, বঙ্গ ও বঙ্গলা (বাঙলা) এই শব্দ-দু'টিকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় এগারো শতকের পূর্বে বঙ্গ বা বঙ্গদেশ ঠিক বাঙ্গালা বা বাঙলা নামে পরিচিত ছিল কিনা তাঁর সুনির্দিষ্ট কোন ঐতি-হাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মনে করা যেতে পারে যে, ১১শ-১২শ শতকের বৃহৎ-বঙ্গের সীমানির্দেশ ছিল: উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণ তাম্রলিপ্তের (বর্তমান তমলুক) সীমাচুম্বিত বিশাল সমুদ্র, পূর্বে আরাকানের নিবিড় অরণ্য ও পশ্চিমে মগধের প্রান্তদেশে ছোটনাগপুরের বিস্তৃত অরণ্য। শোনা যায়, আরাকানের রাজ্যসভায় তখন বাঙালী কবি ও সাহিত্যিকদের আলোচনা-সভার আয়োজন হোত। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের সমন্বয়-নিদর্শনও বৃহৎ-বঙ্গের মধ্যে কম ছিল না।

শোনা যায়, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের আরবজাতীকে কেন্দ্র ক'রে ইস্‌লামীয় সুফীধর্মের সম্প্রসারন বাঙলার বুকে সম্ভব হয়েছিল। অনেকের মতে, পারস্য, বোখারা ও সমরকন্দে সুফীমতবাদের কেন্দ্র নির্দিষ্ট থাকলেও বাঙলায় প্রাচীন

বৈষ্ণবদেব আউল, বাউল, দববীশ ও সাঁই (স্বামী) প্রভৃতি সম্প্রদাযেব মধ্যে সুফীমতবাদেব কিছুটা অনুপ্রবেশ বা সংমিশ্রণ ঘটেছিল।[১] কথিত যে, মুসলমান দববীশদেব মাধ্যমে আববীয সুফীধর্মেব মিলন সংঘটিত হয়েছিল[২] বাঙলাব বিচিত্র ধর্মমতেব সঙ্গে এবং বিশেষ ক'বে চাবটি কেন্দ্রেব মাধ্যমে তা সম্ভবপব হয়েছিল সেই চাবটি কেন্দ্র হোল: (১) ববেন্দ্রভূমি তথা মালদহ, দিনাজপুব, বঙ্গপুব বা বঙ্‌পুব, পূর্ণিয, বাজমহল ও তাব চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল, (২) বাঢভূমি বা বর্ধমান, বীবভূমি বাকুডা ও হুগলী (৩) বঙ্গভূমি তথা পাবনা, বগুডা, বাজসাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ এবং (৪) চট্টলভূমি, বা চট্টগ্রাম, ত্রিপুবা ও নোযাখালী। অবশ্য এ' মতবাদেব সমীচীনতাও নির্ধাবণ কবা উচিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিব কষ্টিপাথবে। বৌদ্ধ যোগ, তন্ত্র (হিন্দু ও বৌদ্ধ) ও বৈদিকধর্মেব সংমিশ্রণে বাঙলাব বৈষ্ণবধর্মে যে এক পবিবর্তন সাধিত হযেছিল সে আলোচনা পূর্বেই কিছুটা কবেছি।

বৃহত্তব বঙ্গে এবং পববর্তীকালে খণ্ডিত বাঙলাযও সংস্কৃতচর্চা বনাম বিদ্যাচর্চাব বিশেষ প্রচলন ছিল। প্রাচীন ও নব্য ন্যায, মীমাংসা, স্মৃতি, অলংকাব, ব্যাকবণ প্রভৃতি শাস্ত্রেব কথা ছেডে দিলেও বাঙলাদেশেব সাবস্বত আচাব-ব্যবহাব ও সঙ্গে সঙ্গে দেশসমৃদ্ধিব পবিচাযকরূপে পুণ্ড্রবর্ধনেব অধিবাসী সন্ধ্যাকব নন্দী-বচিত 'বামচবিত' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'রামচবিত' গৌডবাজ বামপালদেব ও তদীয পুত্র মদনপালদেবের অবিস্মবণীয় কীর্তিগাথা ও অবদানেব ইতিকথা। এই ইতিকথাব পরিপ্রেক্ষিতে পালযুগে বাঙলার সামাজিক ও পবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক জীবনস্বাচ্ছন্দেবও সুস্পষ্ট পবিচয পাওযা যায়। নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুবী প্রভৃতি বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঐ সকল মহাশিক্ষাতীর্থসংলগ্ন বৃহৎ গ্রন্থশালাগুলিও পালযুগের শিক্ষা-সংস্কৃতিব জ্বলন্ত নিদর্শন। বাঙালী বৌদ্ধধর্মাচার্য ও সুপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কব, শীলভদ্র, শান্তিবক্ষিত ও অন্যান্য মনীষীদেব শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মেব অবদান বাঙলাব

১। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, খ্রীষ্টীয ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে সুহ্‌রববদীযহ-সম্প্রদাযভুক্ত শযখ জলালু-দ-দীন্ তব্‌বীযীর অভিযানেব পর থেকেই বাঙলাদেশে সুফীমতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। অবশ্য এ'সম্বন্ধে ভিন্ন মতেরও প্রচলন আছে।

২। এ'সম্বন্ধে এড্‌ওযার্ড জে. ব্রাউনের (E. J. Browne) *Dervish* গ্রন্থে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত করেছে। 'কবীন্দ্রসমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-গ্রন্থ-দু'টিতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের অনুলিখন ছাড়াও তদানীন্তন সমাজে আদি ও ভক্তিবসাত্মক ধর্মভাবসেবিত দৈনন্দিন জীবনচর্য্যার পরিচয় পাওয়া যায়। পালরাজাদের পূর্ববর্তী গুপ্ত ও সেন-রাজাদেব শাসনকাল বাঙলার সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সামাজিক জীবন দিনপঞ্জীপূর্ণ ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন ও শরণ এই পঞ্চরত্নের কাব্যপ্রতিভা দ্বাদশ শতকেব বাঙালাকে গৌরবোজ্জ্বল করেছিল।

ভক্তি ও ভক্তিবাদের প্রাণকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ-বাসুদেবকে অবলম্বন ক'রে কীভাবে বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের গোড়াপত্তন সম্ভব ও সার্থক হয়েছিল তার বিবরণ আমরা আরো কিছু পরে দেবার চেষ্টা করবো। বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের আলোচনায় ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তিরসকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণ-বাসুদেবের প্রসঙ্গও অপরিহার্য। আচার্য শঙ্করের প্রমাণিত ও প্রচারিত অদ্বৈতব্রহ্মবাদ (মায়াবাদ নয়) পূর্বমীমাংসাদর্শন-নির্দিষ্ট ধর্ম ও কর্ম এবং ভগবান বুদ্ধ ও পরবর্তী বৌদ্ধাচার্যগণ-প্রচারিত বৌদ্ধমতকে বিশেষভাবে নিরস্ত করলেও ভক্তিবাদের বিরুদ্ধে কোনদিন কেউ সংগ্রাম ঘোষণা করেন নি। বিশেষ ক'রে প্রখর জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সরস ভক্তিচর্চার স্পর্শ বাঙলার মানসক্ষেত্রে এক নূতন জীবনস্পন্দন সৃষ্টি করেছিল। আচার্য রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভাচার্য কিংবা দক্ষিণ-ভারতে আল্‌বার বা আলোয়ার-সম্প্রদায়-প্রচারিত ভক্তিবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম বাঙলার জনগণের মনে ততো প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হলেও শাণ্ডিল্যসূত্র, নারদীয়ভক্তিসূত্র, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাণকেন্দ্র বিভিন্ন পঞ্চরাত্রসংহিতা ও পুরাণসাহিত্য-প্রতিপাদিত ঈশ্বরপ্রেম ও ভক্তিধর্ম বাঙালীর সচল ও রসসিক্ত মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নবজন্ম তখনও বাঙলার বুকে সার্থক হয়ে ওঠে নি। বাঙলার ইতিহাসের পথযাত্রীমাত্রেরই জানা আছে যে, পরমভাগবত গুপ্তরাজাদের সময়ে বাঙলায় শিব, গণপতি ও কার্তিকেয়ের মন্দির এবং স্থানে স্থানে শক্তিপীঠ প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সাধারণ সমাজে বিষ্ণু-উপাসনার অনুষ্ঠান ও নিষ্ঠাই বৈষ্ণবধর্মের ভাবপ্রবাহকে অব্যাহত রেখেছিল। রাজ-তরঙ্গিণীকার কহ্লণের ঐতিহাসিক বিবরণে পাওয়া যায়, শিব ও কার্তিকেয়ের

বিভিন্ন মন্দিরে নৃত্য-গীত-অনুষ্ঠানের জন্য দেবদাসীরা নিযুক্ত থাকত এবং তাদের নৃত্যছন্দ ছিল সম্পূর্ণভাবে ভরতের নাট্যশাস্ত্র-অনুমোদিত।

গুপ্ত ও পালোত্তর সেন-রাজাদের মধ্যে শিব ও বিষ্ণু এই উভয় দেবতারই উপাসনা প্রচলিত ছিল। তবে রাজা লক্ষ্মণসেন নিজে ছিলেন পরমবৈষ্ণব ও বিষ্ণুর উপাসক। তাঁর রাজত্বকালে বাঙলার সমাজে যে রাধাকৃষ্ণলীলাসেবিত ভক্তিবাদের প্রচলন ছিল তা বাঙলার ইতিহাসই বিশেষভাবে প্রমাণ করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক মূর্তির নিদর্শন সেকথা আরো বিশেষভাবে প্রমাণ করে। অবশ্য পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত ধ্বংসস্তূপে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ছাড়াও বিষ্ণু, বলরাম, ত্রিশূলধারী শিব, গণেশ, ইন্দ্র, যমুনা ও রামায়ণকাহিনীর মূর্তি পাওয়া গেছে। রায় বাহাদুর কে. এন. দীক্ষিত ১৯২০-২১, ১৯২৬-২৭, এবং ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক প্রত্নতাত্ত্বিকী বিবরণীতে (*Annual Report of the Archaeological Survey of India* for 1920-21, 1926-27, 1927-28) পাহাড়পুর-স্তূপের ও স্তূপ থেকে আবিষ্কৃত বিচিত্র উপাদান-সামগ্রী ও মূর্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন (*Excavations of Paharpur, Bengal*, Memoirs, A S I. No. 55 দ্রষ্টব্য)। অধুনা ডঃ চারুচরণ দাশগুপ্ত *Paharpur and Its Monuments* (1961) নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কৃষ্ণ ও রাধাকৃষ্ণ-মূর্তির পরিচয়ে গোকুলে গিরিগোবর্ধনধারী কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি এবং বসুদেব ও শিশুকৃষ্ণমূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। রাধাকৃষ্ণের মূর্তিপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "In the wall on south-east angle facing south there is a sculpture which represents two standing figures—one, male and the other, a female (PL. VIII,b). The right arm of the male figure clasps the female figure whose left arm clasps the male figures. The female figure has a halo behind its head. This sculpture probably reprsents Radha and Krishna. It is undoubtedly one of the best sculptures that have been found at Paharpur" (p. 26)।[3]

3. অন্যান্য কৃষ্ণলীলাকাহিনীর মূর্তিসম্বন্ধে (Krishna-legend-scenes) *Paharpur and Its Monuments* (1961) pp. 25, 27. দ্রষ্টব্য। পাহাড়পুরের-স্তূপ থেকে আবিষ্কৃত বাদ্যযন্ত্রের যে বিচিত্র নিদর্শন পাওয়া গেছে সে' সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো।

পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মূর্তি প্রভৃতি ছাড়া মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে কবি জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ'-পদগান শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলামাধুর্যের বর্ণনায় মুখর। ডঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুলিখিত 'বাংলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'[8]-গ্রন্থে চৈতন্যপূর্ব যুগে বাঙলাদেশে যে সকল গ্রন্থ বৈষ্ণব-ধর্মানুপ্রবেশ ও তার পরিপুষ্টির পটভূমিকা রচনা করেছিল তাদের নামোল্লেখ করেছেন এবং সেগুলি হোলঃ "(ক) জয়দেবের গীতগোবিন্দ, (খ) বিল্বমঙ্গলের (লীলাশুক) কৃষ্ণকর্ণামৃত, (গ) ব্রহ্মসংহিতা, (ঘ) বোপদেবের মুক্তাফল, (ঙ) বিষ্ণুপুরীর শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী, (চ) লক্ষ্মীধরের ভগবন্নামকৌমুদী, (ছ) শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকা, (জ) ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণলীলামৃত"। অবশ্য এগুলি ছাড়া 'সংগীতমাধব', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

এখানে আলোচনার বিষয় হোল প্রাক্-জয়দেব যুগে রাধাকৃষ্ণ-লীলানুশীলনের মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্ম বাঙলাদেশে কতটুকু প্রসারতা লাভ করেছিল তা প্রতিপাদন করা এবং সেক্ষেত্রে 'গীতগোবিন্দ' বা অষ্টপদীর কথা বাদ দিলেও গীতা শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ-নির্দেশিত ভক্তিতত্ত্ব বাঙলার মানসক্ষেত্রকে বিশেষভাবে রসসিঞ্চিত ও প্রবুদ্ধ করেছিল। শোনা যায়, খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকে মাধবেন্দ্রপুরীই বাঙলাদেশে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করেছিলেন, সুতরাং 'শ্রীমদ্ভাগবত' লিখিত বা সংকলিত হয়েছিল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৩শ-১৪শ শতকের পূর্বে। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত রাধাকৃষ্ণের মূর্তিগুলি নিঃসংশয়ে বাঙলার ভাগবতধর্মের প্রভাব প্রমাণ করে একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে রচিত পুরাণগুলিতে বর্ণিত ভক্তিতত্ত্বও বাঙলার প্রেমধর্মপ্রেরণাকে প্রাণবান করেছিল। সাতবাহন নরপতি হালের 'গাথা-সপ্তশতী' গ্রন্থে (১ম বা ১ম-২য় শতক) রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর বর্ণনা আছে। কবি জয়দেবের আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় ১২শ-১৩শ শতকে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমনই এক সময়ে যখন বাঙলাদেশে ভাগবতধর্মের ছিল লীলাচঞ্চল যৌবনকাল। জয়দেব শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাতত্ত্বের প্রচারব্রত নিয়েই যেন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং একদিক থেকে বলা যায় বৈষ্ণব-পদাবলী-কীর্তনের পটভূমিকা-রচনার সূচনাও হয়েছিল ঠিক তখন থেকে বাঙলাদেশে।

8। বাংলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম খণ্ড (১৯৫৯), পৃ· ২৫৪। তাছাড়া তার 'বৈষ্ণব-ধর্মের ক্রমবিকাশধারা' আলোচিত অংশটি এ'প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য (৭ম অধ্যায়, পৃঃ ২৫৮ ২৭৮)।

যদিও চর্যাগীতির অবদান পদকীর্তনের ভাণ্ডারে কম নয়। সংস্কৃতায়িত বাংলা পদ্যছন্দে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের ছত্রে ছত্রে রাধাকৃষ্ণলীলাতত্ত্বগানই সুস্পষ্ট। কবি নিজে তার পরিচয় দিয়ে প্রথম সর্গের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু-কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

ভক্তজনচিত্তে কৃষ্ণভক্তিরতি সঞ্চারের জন্য যেন জয়দেব কবির পদ-রচনার প্রধান অভিপ্রায় ছিল। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সত্যই বলেছেন: "মহাভারতে, পুরাণে, বিশেষ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে যে গোবিন্দলীলা বর্ণিত হইয়াছে, কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দে সেই গোবিন্দের লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দই তাঁহার প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের আদ্যন্তে কীর্তিত হইয়াছেন।"

কাব্য ও সাহিত্যের দিক দিয়াও গীতগোবিন্দের একটি বিশেষ মূল্য আছে, —যদিও আখ্যান, নাটকীয়তা ও সঙ্গীত এই ত্রিবেণীসঙ্গমের মিলিত ধারা এর মধ্যে প্রবাহিত। তাঞ্জোরের সরস্বতী-মহল-গ্রন্থাগারে গীতগোবিন্দের একটি নাট্যরূপসম্বলিত পুঁথি পাওয়া গেছে এবং গ্রন্থাকারেও ছাপা হয়েছে। বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ গীতগোবিন্দের আখ্যানভাগ রচনা করেছে এবং বিচিত্র রাগ ও তাল এর সঙ্গীতরূপ সৃষ্টি করেছে। এজন্য অনেকে গীতগোবিন্দকে বাহ্যতঃ 'আখ্যানকেন্দ্রিক খণ্ডকাব্য' বা গীতিকাগ্রন্থ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তবে গীতগোবিন্দে সঙ্গীতাংশের যে যোজনা আছে ও বিশেষ ক'রে যে যে রাগগুলির পরিচয় দেওয়া আছে, গীতগোবিন্দে তাদের যাত্রা-পথে ভারতীয় প্রাচীন ও নবীন রাগরূপের একটি বিবর্তনময় ধারা লক্ষ্য করা যায় এবং সেই বিবর্তনের মুখে মেবারের রাণা কুম্ভা ১৫শ শতক 'সঙ্গীতরাজ'-গ্রন্থে গীতগোবিন্দের 'রসিকপ্রিয়া' টীকার রাগগঠনে বা রাগরূপের প্রকাশশৈলীতে কিছুটা নূতনতর বিকাশের পরিচয় দিয়েছেন। অনেকে আবার মধ্যযুগীয় সাধু-সম্প্রদায়ের ও বিশেষ কোরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আধার ও উৎসভূমি-রূপে গণ্য ক'রে গীতগোবিন্দকে 'ভক্তিকাব্য' বলেও অভিহিত করেন। মোট কথা রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক ও উজ্জ্বলরসাত্মক অপার্থিব লীলাবৈচিত্র্যের সাক্ষ্যবহনকারী এই 'গীতগোবিন্দ'-পদগান। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের

শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৫শ শতকে কলিঙ্গসম্রাট প্রতাপরুদ্রদেব (যিনি পরে শ্রীচৈতন্যের কৃপাশ্রিত হয়েছিলেন) গীতগোবিন্দগান জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে প্রচলন করেছিলেন। শোনা যায়, দেবদাসীদের নৃত্য-সম্বলিত হোয়ে মৃদঙ্গবাদ্যের সহযোগে জগন্নাথদেবের মন্দিরে গীতগোবিন্দ গান করা হোত।

লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থে পদগানের মাধুর্য নিয়ে আলোচনা করবো পরে। তবে 'গীতগোবিন্দ' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ভক্তিগ্রন্থদুটি নিয়ে মোটামুটিভাবে অনুশীলন করলে দেখা যায় যে, গীতগোবিন্দের রচয়িতা কবি জয়দেব বিল্বমঙ্গল-রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃতের ভাব ও কাব্যসম্পদ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ'প্রসঙ্গে লিখেছেন :" জয়দেব লীলাশুকের কৃষ্ণকর্ণামৃতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' জয়দেবের সময়ে নিতান্ত অপরিচিত ছিল না, কারণ শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃতে কৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে লীলাশুক যেমন সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন, জয়দেবের মধ্যে ঠিক সেই জাতীয় অনুভূতি পাওয়া যায় না। লীলাশুক আপনাকে কৃষ্ণলীলার সহায়তায়[৫] নিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু গীতগোবিন্দের কবির মধ্যে ঠিক সেই জাতীয় পরিকরবৃত্তি বা সখী সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।"[৬] যাহা হউক শ্রীচৈতন্য নিভৃতে নির্জনে গম্ভীরায় 'গীতগোবিন্দ' দিবারাত্র আস্বাদন করতেন বলে সহজিয়া বৈষ্ণবগণ কবি জয়দেবকে 'নবরসিক'-এর অন্যতম ও 'আদিগুরু' বলে নির্দেশ করেছেন। তবে গীতগোবিন্দের ছন্দ, ভাব ও মাধুর্য যে পরবর্তী বৈষ্ণব-ভক্তিসাহিত্যকে রস-ভাবসমৃদ্ধ করেছিল এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৫। 'মঞ্জরী'-ভাবের।

৬। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৩), পৃঃ ৯৩



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ ॥

কবি জয়দেব খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকের শেষার্ধে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমজেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অজয়নদীর উত্তরদিকে অবস্থিত এই গ্রাম। জয়দেব একাধারে ছিলেন কবি, সঙ্গীতরসজ্ঞ ও ভক্ত। 'গীত-গোবিন্দ' তাঁরই রচনা, যদিও কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত যে, গীত-গোবিন্দের কোন কোন অংশ অপরাপর কবিদের যোজনা। পণ্ডিত শ্রীহরে-কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ'-গ্রন্থের ভূমিকায় কাব্যকথাপ্রসঙ্গে পাঁচটি যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, সমগ্র 'গীতগোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থ বা পদগানগ্রন্থ কবি জয়দেবেরই রচনা।[১] তবে 'জয়দেব' নামধারী ব্যক্তি ছিলেন আরও দু'জন : একজন ছন্দসূত্রের প্রণেতা গীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবি জয়দেবের পূর্ববর্তী ও অপরজন 'প্রসন্নরাঘব' নাটক ও 'চন্দ্রালোক' নামক অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রণেতা জয়দেব। কাশ্মীরবাসী কহ্লন 'সূক্তিমুক্তাবলী' গ্রন্থে (১১৭৯ শকাব্দা) এই শেষোক্ত জয়দেবের নামোল্লেখ করেছেন।[২]

কবি জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গের ২৯ শ্লোক থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতা বামাদেবী[৩] ও প্রিয়সখা অষ্টপদীগায়ক পরাশর। শ্লোকটি হোল—

১। 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' (৩য় সংস্করণ, ১৩৬২), পৃঃ ৬১-৬২

২। ঐ, পৃঃ ৪১

৩। অনেকের মতে, বামাদেবী কিংবা রাধাদেবী। অবশ্য বামাদেবীর 'ব' 'র'-এ (রামাদেবীতে) পরিণত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়।

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু॥

পূজারী গোস্বামী টীকায় এর বিশ্লেষণ কোরে বলেছেন : "ভোজদেবনামা অস্য পিতা বামাদেবীনাম্নী জননী তস্যাঃ সুতস্য শ্রীজয়দেবস্য পরাশরাদীনাং যে প্রিয়াস্তন্মতজ্ঞাতারস্তেষ্বপি যে বান্ধবাস্তন্মতানুসারেণ শ্রীরাধামাধবরহঃকেলি-জ্ঞানেন বন্ধুত্বং প্রাপ্তাস্তেষামেব কণ্ঠে ভূষণবৎ সদা গীতগোবিন্দাখ্যং কবিত্ব-মস্তু।" তাছাড়া প্রথম সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত "পদ্মাবতীচরণচারণ-চক্রবর্তী" এবং দশম সর্গের ১০ম শ্লোকে উল্লিখিত "জয়তি পদ্মাবতীরমণ-জয়দেবকবি" প্রভৃতি পদাংশ থেকে জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীর নাম পাওয়া যায় : "তথা-নাম্নী জয়দেব-পত্নী"। কারো কারো মতে, জয়দেবের পত্নীর নাম রোহিণী। পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, সহজিয়াগণ বলেন যে, রোহিণী কবি জয়দেবের পরকীয়া।[8] কিন্তু এ' নাম কবি-কল্পনা বলেই মনে হয়, কেননা গীতগোবিন্দের প্রায় সকল টীকা ও ভাষ্যকার পদ্মাবতীকেই জয়দেব-পত্নী বলে উল্লেখ করেছেন।

জয়দেব ছিলেন বঙ্গদেশজাত বাঙালী। তিনি রাঢ়ভূমি বীরভূমজেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কেন্দুবিল্ব চলিত ভাষায় 'কেন্দুলী' বা 'কেঁদুলী' নামে পরে পরিচিত হয়। অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন : "বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রাম ইহার (কবির) জন্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বর্তমানে কিন্তু কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলী বলিয়া কোন গ্রামের অস্তিত্ব নাই, অজয়নদীর বালুকাময় তীরভূমিতে পৌষ-সংক্রান্তিতে 'কেঁদুলীর মেলা' নামক একটি বাৎসরিক মেলা বসিতে দেখা যায় মাত্র। সেইজন্য মিথিলা ও উড়িষ্যা হইতে জয়দেবকে দাবী করা হইয়াছে।[5]

৪। 'কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ', পৃঃ ৯

৫। "তীরহুত জেলায় অবস্থিত জেঞ্ঝারপুর-শহরের কাছে কেন্দোলি নামক একটি গ্রাম আছে। মিথিলাবাসীদের মতে, জয়দেব এই কেন্দোলিগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। উড়িষ্যা-বাসীরাও পুরীর নিকটে কেন্দুবিল্বগ্রামে জয়দেবের আবির্ভাব কল্পনা করিতে চাহেন"।—ডঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (প্রথম খণ্ড, ১৯৫৯), পৃঃ ৭৮

যেহেতু উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরে অশ্লীল যৌন[৬] ভাস্কর্য দেখা যায়, সেইহেতু আদিরসের কবি জয়দেব উৎকলী ছিলেন—ইহাই উড়িষ্যাবাসিগণের যুক্তি। বলা বাহুল্য এ' যুক্তি দুর্বল। জয়দেবকে অ-বাঙ্গালী বলিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি এখনও উপস্থাপিত হয় নাই।"[৭]

'বাংলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-রচয়িতা ডঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "সংস্কৃত-সাহিত্যে 'ছন্দসূত্র'-এর রচয়িতা জয়দেব বাঙলার জয়দেবের অনেক পূর্ববর্তী", "বাঙলাদেশের বাহিরে জয়দেবের যে কতদূর প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছিল", "বাঙালার কবি পদলালিত্যে ও উজ্জ্বলরসাত্মক ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতরঙ্গে বাঙলার বাহিরেও যে প্রেমভক্তির প্লাবন আনিয়াছিলেন" প্রভৃতি[৮] থেকে তিনি যে কবিকে বঙ্গবাসী বলে স্বীকার করেছেন তা বোঝা যায়। তাছাড়া প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাদের মধ্যে ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দে 'জয়দেব ও গীতগোবিন্দ' নিবন্ধে, পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থে, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কবি জয়দেব' নিবন্ধে, স্বর্গীয় রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সবঙ্গানুবাদ-'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্' গ্রন্থে কবি জয়দেবকে বাঙালী তথা বঙ্গদেশজাত বলেই স্বীকার করেছেন। বাংলাভাষার সাহিত্য-রচনার পথিকৃৎ স্বর্গীয় ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও বাঙলার অন্যান্য মনীষীদের সিদ্ধান্তও তাই।[৯]

কবি জয়দেব যে বীরভূমি তথা বীরভূমজেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বীরভূমির নাম-সার্থকতা নিয়েও বাদানুবাদের অন্ত নেই। বৈষ্ণব-

৬। উড়িষ্যার মন্দির-ভাস্কর্যে নগ্ন মূর্তিগুলি যথার্থভাবে যৌনভাবের প্রকাশ কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবসর আছে। সার্থক শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকদের সিদ্ধান্ত এসব সম্পূর্ণ ভিন্ন; কেননা ঐগুলি আসলে আদিরস শৃঙ্গারের অভিব্যক্তি,' মানবমনের সহজাত কামাভিব্যক্তির (Id) প্রতিকৃতি নয়। নাট্যশাস্ত্রে আদিরস শৃঙ্গার সৃষ্টি ও নির্বেদের প্রকাশক। নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য ও টীকাকারগণ শৃঙ্গারকে শ্রেষ্ঠ ও অপার্থিব উজ্জ্বল-রস বলে বর্ণনা করেছেন।

৭। 'বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস', প্রাচীন পর্ব (১ম সংস্করণ, ১৩২১), পৃঃ ৫৫

৮। 'বাংলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম খণ্ড, ১৯৫৯, পৃঃ ৯৩-৯৪

৯। যদিও দক্ষিণ-ভারতীয় ও মহারাষ্ট্রদেশীয় কোন কোন লেখক জয়দেবকে তৎতদ্দেশীয় বলে মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া উৎকলবাসী মনীষীরা জয়দেবের 'মিশ্র' পদবীও দাবী করেন।

পদাবলীকীর্তনের ঐতিহাসিক আলোচনায় ঐ সকল প্রসঙ্গ অপরিহার্য না হোলেও পদ-রচয়িতাদের অন্যতম কবি জয়দেবের জীবনালেখ্যরচনায় এ' সকল আলোচনা ও উপাদানের সার্থকতা আছে।

পণ্ডিতবর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন: "বীরভূমির পূর্ব নাম ছিল 'কামকোটী'। সেকালে পূর্বে অজয়-সম্মিলিতা গঙ্গা, পশ্চিমে আরণ্যভূমি (ঝাড়খণ্ডের ঘন-অরণ্য), উত্তরে পাথরের দেশ (রাজমহলের পর্বতশ্রেণী) এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপাদোদ্ভবা বহু নদ-নদী (দামোদর প্রভৃতি) এই ভূমিখণ্ডের চতুঃসীমারূপে নির্দিষ্ট হইত।"[১০] আরো প্রাচীনকালে বীরভূমির ও তার চতুর্দিকের ভূমিখণ্ড 'সুহ্ম' নামে পরিচিত ছিল এবং দণ্ডী, কালিদাস, বাণভট্ট, ধোয়ী প্রভৃতি কবি একথার উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন—'সুহ্মা রাঢাঃ'। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের অনুমান যে, সেন-রাজকুমাররাই তাঁদের পূর্বপুরুষ বীরসেনের নামানুসারে 'বীরভূমি' নামকরণ করেন।[১১] তিনি আরো বলেন: "'আইন-ই-আকবরী'-র মতে, বীরভূমির 'লক্ষ্ণুর' (অধুনা 'নগর' নামে পরিচিত) বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্ণুরের হিন্দু-শাসনকর্তাদিগের সেকালে 'রাব' উপাধি ছিল।* * জয়দেব রাঢের কবি বীরভূমের কবি।"[১২]

তন্ত্রসাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে 'বীরভূমির' নামের এক সৃষ্টিকথার প্রচলন আছে। বীরভূমজেলায় সাঁইথিয়া, লাভপুর, তারাপুর (বা তারাপীঠ), নলহাটী ও বক্রেশ্বর এই পাঁচটি স্থানে পাঁচটি শক্তিপীঠের প্রতিষ্ঠা আছে। শোনা যায়, দেবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ ঐ পাঁচটি স্থানে পতিত হয়ে শক্তিতীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে[১৩] এবং এই পীঠস্থানগুলি তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্ররূপে বাঙলার শুধু কেন, ভারতের ইতিহাসেও স্থান পেয়েছে। তন্ত্রসাহিত্যে

১০। 'কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ' (৩য় সংস্করণ, ১৩৬২) পৃঃ ১৫

১১। 'কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ' (৩য় সংস্করণ, ১৩৬২), পৃঃ ১৬

১২। ঐ পৃঃ ১৬

১৩। "শোকোন্মাদ মহাদেবের স্কন্ধলগ্ন সতীদেহকে নারায়ণ তাঁর চক্র দিয়ে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। সতীর দেহ একান্নটি কর্তিত অংশে বিভক্ত হয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। সেই থেকে 'একান্নটি সতীপীঠ"—লিখেছেন নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'মন-মধুকর'-গ্রন্থে (পৃঃ ১৪১)। বীরভূমির পাঁচটি শক্তি বা সতীপীঠ ঐ একান্নটি পীঠের অন্তর্গত।

তন্ত্রাচারী বা তন্ত্রসাধকরা চক্রানুষ্ঠানে 'বীর' নামে পরিচিত। বীর এবং বীরাচারসাধনা কিন্তু সমপর্যায়ভুক্ত নয়। প্রবাদ যে, তন্ত্রাচারী শক্তিসাধকদের ক্ষেত্ররূপেই 'বীরভূমি' (বীরদের ভূমি) বীরভূম নামে পরিচিত। ইতিহাস কতটুকু এই নামের সার্থকতাকে মেনে নেবে জানি না, কিন্তু বঙ্গীয় তন্ত্র-সাধকরা বীরভূমি বা বীরভূম নামের এই অর্থই সাধারণভাবে গ্রহণ করেন। 'বঙ্গীয় তন্ত্রসাধক' বলার উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র তন্ত্রসাহিত্যকে পণ্ডিতেরা মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করেছেন। যেমন : (১) বঙ্গীয় সম্প্রদায় বা 'বেঙ্গল-স্কুল অফ্ তন্ত্র'—যা নিছক আচার ও সাধনাত্মক, (২) কাশ্মীরীয় ত্রিকসম্প্রদায় বা 'ত্রিক-স্কুল অফ্ তন্ত্র'—যা নিছক দর্শন ও তত্ত্ববিচারাত্মক, এবং (৩) দক্ষিণ-ভারতীয় শ্রীবিদ্যাসম্প্রদায় বা 'সাউথ-ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ্ তন্ত্র'— যা উভয়াত্মক হোলেও সাধন ও তত্ত্বপ্রধান। তাছাড়া তন্ত্রে কাদি, হাদি ও ক-হাদি মত-তিনটিরও প্রচলন আছে তন্ত্র ও বীজমন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে। বাঙলাদেশে তন্ত্রসাধনা যে এক সময়ে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল তা রাঢ়দেশ বর্ধমান ও বীরভূমের অন্তর্গত তন্ত্রসাধনার পীঠস্থানগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। বর্ধমানে সাধক কমলাকান্তের সাধনপীঠ ও পঞ্চমুণ্ডির আসন আজও বিদ্যমান। চান্নাগ্রাম (বর্ধমান) কমলাকান্তের জন্মস্থান।

'বীরভূম' নামের আর একটি পরিচয় দিয়েছেন সাহিত্যিক নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় "মন-মধুকর'-গ্রন্থে এবং সে-পরিচয় তাঁর নিজের কথায় বলাই সমীচীন মনে করি। গ্রন্থকার বীরভূম বা বীরভূমির পরিচয় দিয়েছেন কথোপকথনচ্ছলে। তিনি লিখেছেন : "আলোচনা চলেছে বীরভূম কথাটির উৎপত্তি নিয়ে। অধ্যাপক বলেছেন, বীরভূম নামের মূলে আছেন রাজা বীরচন্দ্র। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুচনায় এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন। বাঙলার মুসলমান সুবেদারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন। * * সিউড়ির ছ'-সাত মাইল পশ্চিমে তাঁর রাজ-ধানীর ধ্বংসাবশেষ আছে। অদূরে গভীর ভাণ্ডীরবন। সেই বনের মধ্যে বিরাজ করছেন অনাদিলিঙ্গ মহাদেব ভাণ্ডেশ্বর।" বিদূষী বউঠান বল্লেন : "এতো হ'ল রাজকীয় নামকরণ। এবার লৌকিক নাম শোনো, বীরভূম ছিল সাঁওতালপ্রধান অঞ্চল। * * সাঁওতালী ভাষায় 'বীর' মানে জঙ্গল। সাঁওতালরা তাদের ঐ জঙ্গলরাজ্যের নাম দিয়েছিল বীরভুঁইয়াঁ। সেই বীর-

ভুঁইয়াই এখন হয়েছে বীরভূম।"[১৪] অবশ্য এটি কিংবদন্তী বা গল্পকথা হলেও এই প্রবাদের পিছনে ঐতিহাসিক সত্য থাকা অসম্ভব নয়।

এ' পর্যন্ত জয়দেব-প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম সাধক-কবির বহিরঙ্গ রূপের কথা, এবার কবির অন্তরঙ্গ-রূপ কাব্যগীতমিথুনাত্মক অষ্টপদী বা 'গীতগোবিন্দ'-পদগানপ্রকৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। বাঙলার কবি জয়দেবের আদি-রসাত্মক 'গীতগোবিন্দ'-পদগানই বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের অন্যতম সৃষ্টিক্ষেত্র ও লীলাভূমি। পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলী যে ৯ম-১১শ শতকের বৌদ্ধ-চর্যাপদ এবং ১২শ-১৩শ শতকের গীতগোবিন্দের ওপরই ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল একথা নিঃসংশয়ে সকলে স্বীকার করেন।

১৪। 'মন-মধুকর' (আনন্দধারা-প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৭০), পৃঃ ১৪৯-১৫০

অনেকের আবার অভিমত যে, বারো জন ভুঁইয়া সেখানে রাজত্ব করতেন বলে বারভুঁইয়া>'বীরভূম' নাম হয়েছে।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ গীতগোবিন্দের পাদপীঠ ও রূপ ॥

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে বাঙলার মাটিতে ঠাকুর জয়দেবের অভ্যুদয় হয়েছিল এ'কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কবি জয়দেবে-রচিত অষ্টপদী বা 'গীতগোবিন্দ'-পদগান শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপার্থিব লীলামাধুর্যসম্পৃক্ত। বাঙলার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির 'কৃষ্ণকীর্তন', রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভনাটক,' লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-এর মতো জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের পরমানুরাগী ছিলেন। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গান শুনে পরম-আনন্দে ॥

পুরী তথা পুরুষোত্তমে রাজগুরু কাশীমিশ্রের আবাসবাটীর ক্ষুদ্র কক্ষের নাম 'গম্ভীরা'। প্রতিদিন নীলাচলে বাসের সময় বৈষ্ণবসাধক স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে গম্ভীরার গুপ্তকক্ষে মহাপ্রভু ঐ গ্রন্থগুলির পাঠ শুনতেন। স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দ বিদগ্ধ শাস্ত্রজ্ঞানী ও পরমভক্ত ছাড়াও ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যায় ও সঙ্গীতশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। কবি জয়দেবের মধুর-কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ ক'রে শ্রীচৈতন্যদেব মুহুর্মুহুঃ মহাভাবে সমাবিষ্ট হতেন। শোনা যায়, সমুদ্রের গভীর গর্জনও সেই সমাধি ও মহাভাবকে ভঙ্গ করতে পারত না।

মরমী বৈষ্ণব-সাধকগণের মতে, গীতগোবিন্দ একটি মহাকাব্য; কারণ, ইহার নায়ক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকা পরমেশ্বরী শ্রীরাধা বা রাধিকা। শোনা যায়, লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' অমৃতগ্রন্থের অনুকরণে কবি জয়দেব গীতগোবিন্দের পদসম্ভার রচনা করেছিলেন মহারসে ও ভাবে সমৃদ্ধ ক'রে। গীতাগোবিন্দ দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। এতে আশিটি শ্লোক ও চব্বিশটি গীতের সমাবেশ আছে। এদের মধ্যে বাহাত্তরটি শ্লোক বিভিন্ন বৃত্তছন্দে, একটি শ্লোক জাতিছন্দে ও অবশিষ্ট ছুটি শ্লোক ও চব্বিশটি গীত অপভ্রংশ ছন্দে রচিত।[১] পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় সর্গবন্ধ-নিবন্ধে গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গের নাম ও প্রকৃতি-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিশেষভাবে বাঙলার চক্ষুষ্মান বৈষ্ণব-কবিগণ এই সর্গনাম ও তাদের অর্থ-সার্থকতা স্বীকার করেন। আমরা পণ্ডিত মুখোপাধ্যায়-বর্ণিত সর্গনাম-সার্থকতার কথঞ্চিৎ এখানে উল্লেখ করবো। তার প্রথম কারণ হোল, বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনপ্রসঙ্গে বিদগ্ধ বৈষ্ণব-সাধকগণ সমর্থিত গীতগোবিন্দের সর্গনামের আলোচনা অপরিহার্য এবং দ্বিতীয় কারণ, গীতগোবিন্দপদগান ভক্তিরসানুভূতিরই মধুরোজ্জ্বল প্রশান্ত প্রতিচ্ছবি এবং অধ্যাত্মসাধক ও সৌন্দর্যরসলিপ্সু সাহিত্যিক ও কবিমাত্রেই গীতগোবিন্দের ঐ ভক্তিরসসম্পর্কিত বিবৃতির একান্ত অনুগামী।

পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতির সারমর্ম হোল: (১) গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের নাম 'সামোদ-দামোদর' শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-দামোদর-বিরহের স্মৃতিচ্ছবি। (২) গীতগোবিন্দের দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অক্লেশকেশব'। নবকেশব শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার জন্য মহাপ্রকৃতিময়ী শ্রীরাধার যেমন আকুলতা, শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরাধাকে লাভের জন্য তেমনি ব্যাকুলতা। পারস্পরিক অপার্থিব প্রেমের বিরহের জন্য ব্যাকুলতা এবং মিলনের আবেগ ও উৎকণ্ঠা এই সর্গের বর্ণনাকে রসসিঞ্চিত করেছে। মুক্তিকামী ভক্ত ও মুক্তিকেন্দ্র ভগবানের পারস্পরিক বিরহ ও মিলনের প্রতিচ্ছবিও এই সর্গের বিষয়বস্তু। (৩-৪) গীতগোবিন্দের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের নাম 'মুগ্ধ-মধুসূদন' ও 'স্নিগ্ধ-মধুসূদন'। শ্রীমুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন:

১। অধ্যাপক শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য এম. এ.: 'জয়দেবের ছন্দ' (পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ', ৩য় সংস্করণ, পৃ: ২০৯) দ্রষ্টব্য।

"মধুসূদন নামেব অর্থ 'ভ্রমব'। জয়দেব শ্লিষ্ট প্রয়োগে অনেক স্থানেই মধুবিপু, মধুসূদন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহাব কবিযাছেন।" যেমন,' 'অক্লেশ-কেশব' নামাঙ্কিত দ্বিতীয় সর্গেব ৯ম শ্লোকে জয়দেব বলেছেন: "শ্রীজয়দেবভণিত-মতিসুন্দব-মোহন-মধুবিপুরূপম্"। ঐ দ্বিতীয় সর্গেব সপ্তদশ শ্লোকে আছে: "নিঃসহনিপতিত তনুলতযা মধুসূদনমুদিতমনোজম্" এবং অষ্টাদশ শ্লোকে আছে: "শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয-মধুবিপু-নিধুবনশীলম্" প্রভৃতি। তৃতীয় 'মুগ্ধ-মধুসূদন-সর্গে' পবমনাযক শ্রীকৃষ্ণ পবমনাযিকা শ্রীবাধিকার জন্য ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত, আব চতুর্থ সর্গে শ্রীবাধিকাব সখী শ্রীকৃষ্ণেব নিকট শ্রীমতীব অবস্থাব কথা নিবেদন কবেছে। (৫) গীতগোবিন্দেব পঞ্চম সর্গেব নাম 'সাকাঙ্ক্ষ-পুণ্ডবীকাক্ষ'। এই সর্গে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবাধাব অভিসাবেব আগমন-আকাঙ্ক্ষায অপেক্ষমান। (৬) ষষ্ঠ সর্গেব নাম 'ধৃষ্ট-বৈকুণ্ঠ'। এইসর্গে কবি জয়দেব নাযক শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন—ধৃষ্ট, কেননা নাযিকা পথিকেব দ্বাবা যে সঙ্কেত-বাণী পাঠিযেছিলেন, তা গোপবাজ নন্দেব সম্মুখে ব্যক্ত কবলেও শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতিভ না হোযে ববং পথিকেব প্রশংসাই কবেছিলেন। (৭) সপ্তম সর্গেব নাম 'নাগব-নাযাবণ'। বহুনায়িকাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীবাধা ব্যাকুল এবং তাঁব বিপ্রলব্ধ অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণেব অদর্শনে শ্রীবাধাব যে বাসক-সজ্জা ব্যর্থতায পবিণত সেকথাই কবি জযদেব বসপূর্ণ সাবলীল ছন্দে বর্ণনা কবেছেন। (৮) গীতগোবিন্দেব অষ্টম সর্গেব নাম 'বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি'। এই সর্গে শ্রীবাধাব প্রেমেব পবম-উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সজ্জিত কুঞ্জে আগমন না কবায শ্রীবাধা মানিনী এবং সেখানে তাঁকে 'খণ্ডিতা নায়িকা' বলে কবি জযদেব বর্ণনা কবেছেন: "শ্রীজযদেবভণিতবতিবঞ্চিত খণ্ডিতযুবতিবিলাপম্"। (৯) নবম সর্গেব নাম 'মুগ্ধ-মুকুন্দ'। এ' সর্গে কবি জয়দেব শ্রীকৃষ্ণেব চিন্তাকুল অবস্থাব কথা বর্ণনা কবেছেন, কেননা শ্রীবাধিকা এখানে মানক্লিষ্ট এবং তাবি জন্য শ্রীকৃষ্ণ সেই মানোপশমনেব চিন্তায আকুল। (১০) গীতগোবিন্দেব দশম সর্গেব নাম 'মুগ্ধ-মাধব'। এখানে কবি জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবাধাব পদ ধাবণ কবিয়ে তাঁব মান অপসাবণ কবিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণেব অনুনয় এখানে: 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী, হবতিদবতিনিরমতিঘোরম্"। মান অপসারণ কবাব জন্য শ্রীকৃষ্ণ চারুশীলা প্রিয়া শ্রীরাধাকে কাতবে বার বাব অনুনয় জানিযেছেন। (১১) একাদশ সর্গের নাম 'সানন্দ-গোবিন্দ। এই সর্গে

জয়দেব নায়ক ও নায়িকা যে উভয় উভয়কে লাভের সম্ভাবনায় আনন্দিত এই ভাব রসসিঞ্চিত ভাবস্নিগ্ধ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। (১২) গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গের নাম 'সুপ্রীত-পীতাম্বর'। এই সর্গে জয়দেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধার মান ভঞ্জন ক'রে তাঁর সেবাধিকার লাভে কৃতকৃতার্থ এইভাব সাবলীল ছন্দে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং গীতগোবিন্দের সমগ্র পদ পরমনায়ক ও পরমা নায়িকা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অপার্থিব লীলামাধুর্যবর্ণনায় মুখরিত।[২] দ্বাদশ সর্গের সপ্তবিংশতি শ্লোকে ভক্তকবি নিজেই নিজের শ্রীকৃষ্ণৈকতানতার বর্ণনা করেছেন এবং এই শ্রীকৃষ্ণগত চিত্ত শ্রীলাভের জন্য রসিক ভক্তজনের নিকটও নিজের আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

যদ্গান্ধর্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎ সর্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥

পদগানে লীলায়িত উজ্জ্বলবেশ দিব্যশৃঙ্গাররস মহাপ্রেমরস-রূপে বিদিত। বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের মুখ্য বা আদি রসই শৃঙ্গার। এই আদিরস শৃঙ্গারের চরম ও পরম লক্ষ্য কামগন্ধবিহীন পরমোজ্জ্বল পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বাববোধ। শ্রীকৃষ্ণরতি, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীকৃষ্ণমিলনই বৈষ্ণব-পদাবলীগানের মূল-উদ্দেশ্য। গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গের সপ্তবিংশতি শ্লোকে আলোকপাত ক'রে টীকাকার পূজারী গোস্বামী তাই বলেছেন: "তৎ কিমিত্যাহ। যৎ গান্ধর্ব-কলাসু সংগীতশাস্ত্রোক্ত গীতরাগতালাদিসু যন্নৈপুণ্যং তদেব নির্বন্ধনানুসারেণ জানন্তু ইত্যর্থঃ।* * তত্রাপি দুরূহগতেঃ শৃঙ্গারস্য মহাপ্রেমরসস্য বিচারে যৎ তত্ত্বং দুরূহব্রজলীলাগতং তদপ্যেতদনুসারেণ নিশ্চিন্বন্তু। কাব্যেসু যল্লীলায়িতং রসলীলাদিব্যঞ্জকবিশেষগ্রথনং তদপ্যেতদনুসারেণ নিশ্চিন্বন্তু। সর্বত্র হেতুঃ,—শ্রীকৃষ্ণে একতানঃ একাগ্রোঽনন্যবৃত্তিরাত্মা মনো যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণৈকান্ত-ভক্তস্যৈব সর্বগুণাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনেত্যুক্তেঃ।"

সুতরাং পদাবলীকীর্তনের পাদভূমি বা অধিষ্ঠান 'গীতগোবিন্দ'-পদগান

২। পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' (৩য় সংস্করণ, ১৩৬২)-গ্রন্থে 'সর্গবন্ধ' আলোচনায় (পৃঃ ১৭-১৭৭) যে সর্গনাম-সার্থকতার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন তা দ্রষ্টব্য।

ম'নবীয় কামরসসম্পৃক্ত নয়। অবশ্য গীতগোবিন্দের পাদপীঠ বা উৎসক্ষেত্র বৌদ্ধ-বজ্রযানী আচার্যগণ-রচিত চর্যাগীতি। তবে চর্যাগীতি অপেক্ষা গীত-গোবিন্দের কল্যমাধুর্য ও সাহিত্যপ্রসারতা আরও অধিক। অপার্থিব শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বা বিশ্বকাবণ পুরুষের স্বরূপাবগতির ক্ষেত্রে পার্থিব রসস্পর্শের কোন সার্থকতা থাকে না। কাজেই কবি জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দকে যাঁরা মানবীয় প্রেম তথা কন্দর্প-কামগন্ধজর্জবিত বলেন, তাঁরা 'গীতগোবিন্দ'-পদগানই শুধু নয়, মহাজন-বৈষ্ণব-পদকর্তাগণ-রচিত কোন পদাবলী ও পদাবলীকীর্তনের রসসম্ভোগ করাব মোটেই অধিকারী নন। তন্ত্রে শৃঙ্গাবরসপীঠ কামকলা কুণ্ডলিনীশক্তিকে সর্ববন্ধনাতিরিক্ত পরমশিবের প্রসুপ্ত বা অব্যক্ত রূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জাগ্রতা শক্তিই নিষ্কল শিব বা মায়ালেশশূন্য পরব্রহ্মের স্বরূপ। কাম সেখানে বিশ্বাতীত কামনাগন্ধহীন পবমপ্রেমে উন্নীত এবং এই প্রেমাস্বাদন বা প্রেমপরিণতি মানুষেব পরম-আকাঙ্খিত সামগ্রী ও চবমলাভ। অদ্বৈতবেদান্তবাদী মধুসূদন সবস্বতী 'ভক্তিরসায়ণ'-গ্রন্থে শৃঙ্গার-রসোদ্ভুত প্রেমেব পরমপ্রকাশকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরা' বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং গীতগোবিন্দে শৃঙ্গাররস ও শৃঙ্গারবেশসেবিত রাধাকৃষ্ণলীলাতত্ত্বকে পার্থিব কামগন্ধহীন অধ্যাত্মতত্ত্বেরই প্রতিচ্ছবি-রূপে আমাদেব দেখা ও গ্রহণ করা উচিত। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে গোস্বামা কৃষ্ণদাস কবিরাজ রায়-চৈতন্য-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্বেব অবতাবণা ক'বে বলেছেন—

> প্রভু কহে যাঁহা লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
> সেই সব রসতত্ত্ব বস্তু হইল জ্ঞানে॥
> এবে সে জানিল সেব্য সাধ্যেব নির্ণয়।
> আগে আর কিছু শুনিবারে মনে হয়॥
> কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
> রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্ব রূপ॥

রায় রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-বিশ্লেষণের পর রাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে বলেছেন

> কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
> সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
> সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
> ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপ রাধা ঠাকুরাণী॥

* *

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য তাঁর॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥

* *

কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর॥

* *

যার সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেবনে জীব ছার॥

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধিকার মহাভাব কৃষ্ণরতি ও কৃষ্ণপ্রেমের চরমপরিণতি। বৈষ্ণব লীলা বা রসকীর্তনের চরম-আস্বাদন যাঁরা করতে চান তাঁদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, গীতগোবিন্দ ও তৎপরবর্তী যাবতীয় পদগানের নায়ক-নায়িকা শ্রীরাধাকৃষ্ণের অবিনাভাবসত্তা-সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পরমতত্ত্ব-জ্ঞানের অনুভূতিলাভই সাধক-জীবনের উদ্দেশ্য, কেবলই বৌদ্ধিক শুষ্ক বিচার ও মানসিক ধারণার বিষয় পদগানতত্ত্ব নয়। তারি জন্য বৈষ্ণব আলঙ্কারিক ও পদকর্তারা পদাবলী বা পদগানের মধ্যে নিগূঢ় শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন বিশ্বাতীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পদগানের মর্মকথাও তাই। স্বর্গীয় প্রেমতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই গীতগোবিন্দের পদগানগুলি আমাদের বিশ্লেষণ করা উচিত এবং তাদের তত্ত্বাববোধ ও রস-সম্ভোগই শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাধকজনের মুখ্য-উদ্দেশ্য।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ গীতগোবিন্দের রসতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্ব ॥

গীতগোবিন্দের পদগানগুলি যে রস-ভাবানুবিদ্ধ অপার্থিব ঐশ্বরিক অনুভূতি ও স্পন্দনের সঞ্চার করে এবং তার রস-ভাব-উৎসই যে পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলী-কীর্তনের সাহিত্যে ও সুরে রস-মন্দাকিনী প্রবাহিত করেছিল তার কিছুটা-আভাস দেবার এখানে চেষ্টা করবো।

গীতগোবিন্দের গানগুলি প্রায়ই আটটি আটটি পদে বা কলিকায় রচিত বলে একে অনেকে 'অষ্টপদী' নামে অভিহিত করেন। অষ্টপদীর প্রথম ও দ্বিতীয় পদদুটি পরবর্তী পদগুলির রস ও ভাবের উদ্বোধক এবং প্রতিষ্ঠাও বটে। এ' দুটি পদে শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের দশাবতার রূপের বর্ণনা করেছেন কবি জয়দেব অপরূপ রসনিবিড় ভাববিদগ্ধ ভাষায় ও ছন্দে। মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি এই দশবিধ রূপ প্রথম পদ বা গানের পঞ্চম থেকে চতুর্দশ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে এবং এই অবতারদের বলা হয়েছে 'বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে' প্রভৃতি, অর্থাৎ তাঁরা বেদের উদ্ধারকারী ও ত্রিলোক-ভারবহনকারী। পূজারী-গোস্বামী[১] তাঁর 'বালবোধিনী'-

১। পূজারী-গোস্বামী 'চৈতন্যদাস' নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি নাকি 'ভাবার্থ-দীপিকা' নামে গীতগোবিন্দের আর একটি টীকা রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাঙালী ও শ্রীচৈতন্যদেবের কিছু পরবর্তী। পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়নকালে শ্রীধামস্থ যে কয়জন প্রধান প্রধান বৈষ্ণবদের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, চৈতন্যদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম এবং এই চৈতন্যদাসই শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার পূজারী-গোস্বামী। * * শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে—

টীকায় শ্রীকৃষ্ণের 'দশাবতার'-রূপকে দশবিধ রসের প্রতিষ্ঠা বা আকর বলেছেন। তিনি বলেছেন : "অথ তৎকেলীনাং সর্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনায়াদৌ সর্বরসাশ্রয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মৎস্যাদ্যবতারত্বেন সর্বসাধিষ্ঠাতৃবখিলনায়কশিরোরত্নতাং প্রতিপাদয়ন * * বসন্তে বাসন্তীত্যন্তেন। * * অনেনৈব মীনস্য বীভৎসরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম।" পূজারী-গোস্বামীর মতে, সর্বরসাশ্রয় সর্বভাবঘন শ্রীকৃষ্ণের মীনরূপ বীভৎসরসের প্রকাশক। সে'রকম কূর্মাবতার অদ্ভুতরসের আশ্রয় ('অনেনৈব কূর্মস্যাদ্ভুতরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্'), বরাহ ভয়ানকরসের অধিষ্ঠাতা, নৃসিংহ বৎসলরসের, বামন সখ্যরসের, পরশুরাম রৌদ্ররসের, রামচন্দ্র করুণরসের, হলধর বলরাম হাস্যরসের, বুদ্ধ শান্তরসের এবং কল্কি-অবতার বীররসের আকর বা আশ্রয়। দশাবতাররূপাশ্রয়ী শ্রীকৃষ্ণকে কবি জয়দেব তাই সর্বরসোত্তম শৃঙ্গার বা শৃঙ্গারস্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া পূজারী-

> পণ্ডিত গোসাঞি'র শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
> গৌরকথা বিনা আর মুখে অন্য নাঞি॥
> তার শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস।

চৈতন্যদাসই যে পূজারী-গোস্বামী শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় তার প্রমাণ দিয়েছেন গদাধর শিরোমণির দৌহিত্রবংশীয় বাঁকুড়া সোনামুখীর জমিদার স্বর্গত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ রক্ষিত একটি প্রাচীন বালবোধিনী-টীকার সূচনাশ্লোক থেকে। শ্লোকটি হোল—

* *

> স্বয়ং বোদ্ধুমভিপ্রায়ং জয়দেব-মহামতেঃ।
> টীকা চৈতন্যদাসেন প্রথ্যতে বালবোধিনী॥

* *

পুঁথির সমাপ্তিশ্লোক—

> গোবিন্দ-পাদ-সেবায়াঃ প্রভাবাদুদিতা স্বয়ম।
> চৈতন্যদাসতো বালবোধিনী স্যাৎ সতাং মুদে॥

কিন্তু অধুনামুদ্রিত 'বালবোধিনী'-টীকার সূচনাশ্লোকের অংশ হোল—

> স্বয়ং বোদ্ধুমভিপ্রায়ং জয়দেব মহামতেঃ।
> ক্রমেণোপক্রম্যতে বালবোধিনী।

তাছাড়া 'অত্র ব্যাকরণাদীনাং গ্রন্থবাহুল্য ভীতিতঃ' থেকে শেষচরণ 'ভাবার্থদীপিকায়াঞ্চ ভাবো ভাবার্থলোলুপৈঃ' এই এক রকম পাঠই আছে। সুতরাং বিশেষ বিচার ক'রে দেখলে 'সুবোধিনী'-টীকাকার পূজারী-গোস্বামী ও চৈতন্যদাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে হয়। তবে একথাও সত্য যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে কয়েকজন চৈতন্যদাসেরও নাম পাওয়া যায়।

গোস্বামী দ্বিতীয় গীত—'শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল। ধৃতকুণ্ডল' প্রভৃতির প্রসঙ্গে বলেছেন : "দশাবতারান্ কুর্বতে শ্রীকৃষ্ণায় সর্বাকর্ষণানন্দায় তুভ্যং নমোঽস্তু। ** শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বনায়কশিরোরত্নতাপ্রতিপাদনায় ধীরোদাত্তত্বাদিচতুর্বিধনায়কগুণ-সমন্বয়েন সর্বোৎকর্ষাবিভাবনং প্রার্থয়তে শ্রিতকময়লত্যাদিভিঃ।" এ' প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal* (*1942*)-গ্রন্থে বলেছেন : "The opening Dasavatra-Stotra, as well as the second Jaya-Jaya-Deva-Hare Stotra, presents Krishna in his *Aisvarya* aspect, not as an Avatara, but as the veritable supreme deity of many incarnations (*dasakritikrite krishnaya tubhyam namah*), omitting all reference to Radha but mentioning Sri or Laksmi. As the poem proceeds the Dhirodatta-Nayaka becomes Dhiralalita, and all the erotic Madhurya implications of the theme are developed to their fullest extent".

নাট্যশাস্ত্রে ভরত আটটি রসের ও বর্ণের নামোল্লেখ করেছেন এবং শৃঙ্গারকে স্থায়ীভাবসম্পন্ন শুচি ও উজ্জলবেশাত্মক রস বলে বর্ণনা করেছেন : "তত্র শৃঙ্গারো নাম রতিস্থায়িভাবপ্রভবঃ। উজ্জলবেশাত্মকঃ। 'যৎকিঞ্চিল্লোকে শুচি মেধ্যমুজ্জ্বলং দর্শনীয়ং তচ্ছৃঙ্গারেনোপমীয়তে'। যস্তাবদুজ্জ্বলবেশঃ স শৃঙ্গারবানিত্যুচ্যতে।"

অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি ভাষ্য ও টীকাকারগণ শৃঙ্গারের লৌকিক অর্থেরই পরিচয় দিয়েছেন নাট্যশিল্পীজীবনে রূপায়ণের জন্য, ও তারি জন্য তাঁরা নির্বেদ-সূচক শান্তরসের অবতারণা করেছেন পবিত্রতার দ্যোতকরূপে। অভিনবগুপ্ত 'অভিনবভারতী'-টীকায় বলেছেন : "অথ শান্তো নাম শমস্থায়িভাবাত্মকো মোক্ষপ্রবর্তকঃ"। কিন্তু কবি জয়দেবের অভিপ্রায় এসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেননা যেখানে তিনি সর্বরসাশ্রয় ও সর্বভাবকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আদিরস শৃঙ্গারের প্রতিমূর্তি এবং অধিষ্ঠাতারূপে বর্ণনা করেছেন, সেখানে শৃঙ্গাররসময় শ্রীকৃষ্ণ কখনই লৌকিক অথবা জাগতিক সম্ভোগরসের প্রতিমূর্তি ও নায়ক বলে গণ্য হতে পারেন না। জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণ তাই সর্বোত্তম ও সর্বসাধকারাধ্য 'কৃষ্ণ-ভগবান'। তিনি দিব্যলীলার কেন্দ্রদেবতা, এবং তাঁর লীলাসঙ্গিনী পরমা-

নায়িকা শ্রীরাধাও দিব্যশক্তিরূপিণী। গীতগোবিন্দেব এই শ্রেষ্ঠ নায়ক-নায়িকাই তন্ত্রসাহিত্যের শিব-শক্তি-রূপেব দিব্যপ্রতিমূর্তি।

তন্ত্রে শিবকে কল্পনা কবা হয়েছে নিষ্কল ব্রহ্ম ও পবমানন্দ বিশুদ্ধচৈতন্য-রূপে। তিনি পরমোজ্জ্বল দিব্যজ্ঞানপীঠ সহস্রাবকমলে আসীন এবং তাঁবি অভিন্নপ্রকাশ শক্তি কামকলা বা কুণ্ডলিনী আধাবপদ্মে আসীনা। একটি ব্যক্ত ও জাগ্রত এবং অন্যটি অব্যক্ত ও সুপ্ত। একটি কেন্দ্রে শক্তি চৈতন্যঘন পবমশিব-রূপে সপ্রকাশ এবং অপব কেন্দ্রে শক্তি অব্যক্তচৈতন্য রূপে অপ্রকাশ, কিন্তু পূর্ণ চৈতন্যরূপিণী।

তন্ত্রপ্রসঙ্গে আমাদেব মনে বাখা উচিত যে, সাধাবণ মানবীয় 'কাম'-রূপ সিসৃক্ষাকে তন্ত্রে সৃষ্টি-ইচ্ছাব প্রতীকরূপে বর্ণনা কবেছে। উপনিষদে উল্লিখিত আদিকামও সগুণব্রহ্মের সৃসৃক্ষা বা সৃষ্টি-ইচ্ছা, কেননা উপনিষদে পাই, তিনি (সগুণব্রহ্ম) কামনা কবলেন 'বহু' হবাব জন্য, সুতবাং সেই কাম বা কামনাই তাব 'এক' ও অখণ্ড রূপকে বহুতে বিবর্তিত কবলো। সেই কাম বা কামনাই দিব্যস্পন্দনরূপিণী কলা বা কামকলা কুণ্ডলিনী। সেই কাম, কলা বা কাম-কলাই শক্তি বা শক্তিস্বরূপিণী। তন্ত্রদৃষ্টিতে শক্তি চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ। স্যাব জন্ উডবফ্ তান্ত্রিক "যন্ত্র'-বিশ্লেষণে এ' সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি শক্তি, কামশক্তি বা কামকলাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন: "Consciousness is Power. As this is an identity, its simple converse is also true—Power is Consciousness. Consciousness is of Being and Becoming. So Power is to Be and Become. Power posits itself as Will. Hence Will-to-be and Will-to-become. This is *Kala* which, as Basic Desire, is *Kāma-Kalā*. Cosmically, it is what informs, formulates, shapes, patterns. * * But *Chit-Sakti* is *Vimarsa* also. That is to say, It not only ***is*** and ***manifests*** Its own being, but It also ***becomes*** and ***manifests*** what It becomes. ***Prakasa*** and ***Vimarsa*** are not isolable. This is shown in God Mother ***Kali***. There ***Kali***, in this fundamental context, is ***Kali***"[১]

১। Cf. Swami Pratyagatmananda Saraswati and Sir John Woodroffe: ***Sadhana for Self-realization*** (1963), p. 43 এবং ***The Serpent-Power***-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মোটকথা তন্ত্রে কামকলা বা কুণ্ডলিনীকে coiling energy বা অব্যক্তশক্তি বলা হয়েছে কুণ্ডলিনীর স্বরূপবিকাশের অভাবের জন্য। স্যার জন উডরফ্ তন্ত্রতত্ত্ব ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মূলাধারে কুণ্ডলিনী-সম্বন্ধে বলেছেন: "The *Kundalini* at the *mulādhāra* is the whole primordial Śakti in monad or germ or latency : that is why it is coiled. The *Kundalini* that mounts up the *nādi* is also the whole Śakti in a specially dynamic form—an eject likeness of the Eternal Serpent. The result of the last fusion (there are successive fusions in the various centres also) in the *sahasrāra* is also the Whole, or *purna*". উপনিষদের 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' মন্ত্রের এটি প্রতিধ্বনি। এথেকে আমরা বুঝি যে, potential বা সূক্ষ্মাবস্থায় শক্তি কুণ্ডলিনী শুধু ব্যষ্টি জীবেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র সকল জীব ও জিনিসের মধ্যে নিহিত। তন্ত্রে এই শক্তি তেজোময় 'বিদ্যুৎলতাকারা'। 'কামকলাবিলাস' তন্ত্রে কামকলা কুণ্ডলিনী-সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "কাম কমনীয় তথা কলা চ দহনেন্দু বিগ্রহৌ বিন্দু"। 'কাম' অর্থে তাই কামেশ্বর শিব এবং তিনি তেজোময় প্রকাশস্বরূপ। এই 'কাম'-শিবই 'অগ্নি' নামে পরিচিত। এঁকে ইন্দু বা চন্দ্র-রূপেও কল্পনা করা হয়েছে: 'অগ্নিষোমরূপিণী'। অগ্নি ও চন্দ্রের মিথুন রূপ 'বিন্দু'। তন্ত্রে বিন্দু মহাত্রিপুরসুন্দরী কামকলা। 'কলা' অর্থে বিমর্শশক্তি। 'বিমর্শশক্তিই' কামেশ্বরী 'ষোড়শী': "বিমর্শরূপিণী বিদ্যা ষোড়শী যা প্রকীর্তিতা"। বিন্দু, নাদ ও বীজরূপে কামকলার প্রকাশ। আবার বিন্দু শিব ও বীজ শক্তি এবং এদের মিলিত রূপেই নাদের সৃষ্টি। নাদ বা কুণ্ডলিনীই শব্দব্রহ্ম স্ফোট। সারদাতিলকতন্ত্রে (১।১১-১২) এবং প্রপঞ্চসারতন্ত্রে (১।৪৪) শব্দব্রহ্ম নাদের বা স্ফোটের সৃষ্টিপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

(ক) ভিদ্যমানাৎ পরাদ্ বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোঽভবৎ।
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্বাগমবিশারদাঃ॥

(খ) বিন্দোস্তস্মাদ্ ভিদ্যমানাদ্ রবোঽব্যক্তাত্মকো ভবেৎ।
স স্বঃ শ্রুতিসংপন্নৈঃ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে॥

ভাষ্যকার উমাপতি স্বতন্ত্রতন্ত্রের ২৪শ কারিকায় বলেছেন: "কুণ্ডলিনী শব্দবাচ্যা তু ভুজঙ্গকুটিলাকারেণ নাদাত্মনা স্বকার্যেন প্রতিপুরুষং ভেদেনা-

বস্থিতো, ন তু স্বরূপেণ প্রতিপুরুষমবস্থিতা।" স্বতন্ত্রতন্ত্রের কারিকাটি হোল—

যথা কুণ্ডলিনী শক্তির্মায়াকর্মানুসারিণী।
নাদবিন্দ্বাদিকং কার্যং তস্যা ইতি জগতস্থিতিঃ ॥

'ললিতাসহস্রনাম' গ্রন্থে নাদরূপী কুণ্ডলিনী 'কমলা'-দেবী। এর টীকাকার ভাস্কররায় নাদরূপী কুণ্ডলিনী বা কামকলার 'কাম' অর্থে বলেছেন ইচ্ছা বা শিব ও শক্তির মিথুনমূর্তি এবং 'কলা' অর্থে তাদের প্রকাশ বা manifestation। তন্ত্রশাস্ত্রে তাই কামকলা কুণ্ডলিনী সর্ব মন্ত্র তথা শব্দের ও বিশ্বপ্রপঞ্চের বীজ বা কারণরূপে পরিচিত। সুতরাং তন্ত্রদৃষ্টিতে সৃষ্টিবিলাসিনী কাম বিমর্শ (বিমর্শশক্তি) এবং নিষ্কল চিৎ বা শিব প্রকাশ (প্রকাশশক্তি)। এই বিমর্শ ও প্রকাশ একই শক্তির উন্মীলন ও নিমীলন রূপ। কাম সাধারণ মানুষের কাছে পার্থিব সংসারসৃষ্টির কারণ এবং অপার্থিব মহামানবের কাছে সমষ্টি বিশ্বসৃষ্টির কারণ। পুনরায় মানুষের বিকৃত দৃষ্টির কাছে কাম (Id) অকল্যাণরূপে প্রতীত হলেও মহামানব বা দেবমানবের কাছে কল্যাণময় ইচ্ছা রূপেই প্রতিভাত হয়। গীতগোবিন্দের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ রসপ্রতিষ্ঠারূপী শৃঙ্গার অর্থে অপ্রাকৃত রসলীলার স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। কবি জয়দেব তাই শৃঙ্গারকে মানবীয় প্রেমের পরিবর্তে শাশ্বত আনন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠিত কামকে ঈশ্বরীয় প্রেম-রূপে অনুভব ও বর্ণনা করেছেন। তারি জন্য কবি দশাবতারের রূপবর্ণনার শেষে শৃঙ্গাররসরূপী সর্বরসকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে বলেছেন : "কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ"।

এখানে রস-নির্ধারণের ব্যাপারে 'রসিকপ্রিয়া'-টীকাকার রাণা কুম্ভা পূজারী-গোস্বামীর ব্যাখ্যাকে মোটেই অনুসরণ করেন নি। যেমন, মীনা বতারকে রাণা কুম্ভা বলেছেন : "উৎসাহস্থায়িভাবো বীরো রসঃ। দশস্বপি পদেষু ধীরললিতো নায়কঃ"। বামন-অবতারকে রাণা কুম্ভা বলেছেন : "অত্রাদ্ভুতো রসঃ"। পরশুরামকে বলেছেন : "অত্র বীভৎসো রসঃ"। "প্রলয়েত্যাদিপদষট্‌কে ধীরোদ্ধতো নায়কঃ"। রামচন্দ্রকে বলেছেন : "ধীরোদাত্তো নায়কঃ"। বলরামকে বলেছেন : "ধীরললিতো নায়কঃ" বা "শৃঙ্গারী নায়কঃ" এবং বুদ্ধাবতারকে বলেছেন : "ধীরশান্তো নায়কঃ" এবং তিনি শান্তরসের প্রতিষ্ঠা বা কারণ। আবার যেখানে জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণনা করেছেন : "শৃণু

সুখদং শুভদং ভবসাবম্'', সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ শান্তবসেব প্রতিমূর্তি বা আশ্রয়, এবং যেখানে বলেছেন : "কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ'', সেখানে শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গাববসের প্রতীক।[২] বাণা কুম্ভা তাঁব 'সংগীতবাজ'-গ্রন্থ থেকে বস ও নাযকেব রূপবর্ণনা কবেছেন।[৩]

মোটকথা পূজারী-গোস্বামী ও বাণা কুম্ভাব মধ্যে বস-নির্ধাবণ-ব্যাপাবে কিছু-কিছু মতভেদ থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ববসনায়ক ও পবমরসরূপী এ কথা উভযেই স্বীকাব কবেছেন এবং এই স্বীকৃতি থেকে একথাও নিঃশংসয়ে প্রমাণ হয যে, সর্ববসাশ্রয়ী গীতগোবিন্দপদগান যে পরবর্তী কালের রস-মন্দাকিনীব আশ্রয বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনেব 'পটভূমি' এ' বিষযে কোন সন্দেহ নাই। তাছাড়া গীতগোবিন্দেব অন্যান্য পদ বা গানগুলিব পর্যালোচনা কবলে একথা স্পষ্ট প্রমাণ হয়।

উদাহবণরূপে বলা যেতে পাবে যেমন, গীতগোবিন্দেব তৃতীয গান 'ললিতলবঙ্গলতা-পবিশীলনকোমলমলয়সমীবে' প্রভৃতি নববসন্তের পবিবেশ ও সৌন্দর্যকে আবাহন জানিযে শ্রীবাধা-কৃষ্ণেব বসলীলার অপরূপ রূপ-বর্ণনায মুখব। এই সবসবসন্ত সময়ে শ্রীবাধা-কৃষ্ণেব সম্ভোগলীলাচিত্র স্মবণে যদি কাবো মনে কোন ব্যভিচাবী ভাবেব সঞ্চাব হয় তাব জন্য কবি জয়দেব বলেছেন : "শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদযতি হবিচবণস্মৃতিসারম" প্রভৃতি, অর্থাৎ শ্রীজয়দেব-বচিত এই সবসবসন্তকালেব বনশোভা ও তদনুগত মদনবিকাবেব বর্ণনা সকলেব চিত্তে যেন সাবভূত হবিচবণেব পবিত্র স্মৃতি জাগ্রত কবে। দৃষ্টি ও ভাবনা

২। টীকাকাব পূজাবী-গোস্বামী গীতগোবিন্দেব অধিকাংশ পদব্যাখ্যায নাযক-নাযিকা-গুণের পবিচয দিযেছেন। যেমন (১) 'বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমাবৈববযবৈভ্র্মন্তী' প্রভৃতি পদের (১।২৭) ব্যাখ্যায় বলেছেন : * * শ্রীবাধিকাথাঃ সর্বোৎকর্ষমাবিষ্কর্তুং তত্র তত্র তস্যা অষ্টনাযিকাবস্থাং বর্ণযন সম্ভোগপোষকবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারবর্ণনায প্রথমং বিবহোৎকণ্ঠিতামাহ বসন্ত ইতি'। '২) 'অথাগতাং সাধ্বসমন্তবেণ * * দৃষ্টবদেবদাহ' (৭।১২) পদব্যাখ্যায় বলেছেন : "চন্দ্রোদযেন শ্রীকৃষ্ণাগমনপ্রতিবন্ধে সতি তং বিনা সখ্যা আগমনে তস্যা বিপ্রলব্ধাবস্থাং বর্ণায়িতু-মাহ অথেতি'। (৩) 'সমুদিতমদনে বমণীবদনে' প্রভৃতি (৭।২২) পদব্যাখ্যায বলেছেন : 'পুনস্তস্যা এব স্বাধীনভর্তৃকাত্বসূচকপূর্বকং তল্লীলাবিশেষমাহ * *।" (৪) 'অথ কথমপি যামিনীং' প্রভৃতি (৮।১) পদব্যাখ্যায় খণ্ডিতাবস্থাব বর্ণনা করেছেন।

৩। রাণা কুম্ভা-কৃত 'সংগীতবাজ' গ্রন্থে রস-বর্ণনা দ্রষ্টব্য। বাবাণসী মহাবিদ্যালয থেকে প্রকাশিত ও ডক্টর প্রেমলতা শর্মা-সম্পাদিত *Sangītarāja*, ১ম ভাগ।

এখানে বিশ্বোত্তীর্ণ ও আনন্দাভিমুখী, পার্থিব সংসারসুখের দিকে তা মোটেই নমিত নয়। অধিকাংশ ব্যাখ্যা ও টীকাকাররা এখানে ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত এই চার রকম নায়কগুণের বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। রস, ভাব ও নায়ক-নায়িকার বিস্তৃত পরিচয়ের উল্লেখ আমরা প'রে করার চেষ্টা করবো এখানে আলোচনার উদ্দেশ্য হোল, কীভাবে গীত-গোবিন্দাশ্রিত রস, ভাব ও নায়ক-নায়িকাগুণকে আশ্রয় ক'রে পরবর্তী মহাজন-পদাবলীকীর্তন রস ও ভাবসমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছিল তা প্রদর্শন করা।

বৈষ্ণবশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতিও এ'প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন: "ভগবদুপাসনার দুইটি দিক আছে: একটি ঐশ্বর্যের ও অপরটি মাধুর্যের। * * কবি জয়দেব প্রথম জীবনে ঐশ্বর্যের—বিধিমার্গের উপাসক ছিলেন এবং সেই ভাব হইতে সাধনার ক্রমবিকাশে রাগের পথে তিনি মাধুর্যের ব্রজকুঞ্জে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। * * শ্রীগীতগোবিন্দের আরম্ভভাগে দশাবতারস্তোত্রে এবং 'শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল' (গীত ২) সঙ্গীতটিতে শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্যরূপই প্রকাশিত হইয়াছে। দশাবতারস্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাবতারের কেন্দ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কবি বন্দনা করিতেছেন "দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ"। * * 'শ্রিতকমলা-কুচমণ্ডল' পদগানটি ঐশ্বর্যদ্যোতক, কারণ তাহার মধ্যে একবারও শ্রীরাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই, আদ্যন্তে শ্রী-র নামই কীর্তিত হইয়াছে।"

তাছাড়া 'জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ অভিনবজলধর-সুন্দরধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর' প্রভৃতি গীতটির প্রসঙ্গেও শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেছেন: "কবি শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য শ্রী ও সীতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্বের দুইটি দিক প্রদর্শন করিয়াছেন। * * টীকাকার বলিতেছেন—এই সঙ্গীতে ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদ্ধত এবং ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ধীরললিত নায়ক শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদি ও অন্তে তিনি শ্রীপতিরূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন। * * শ্রীমদ্ভাগবত বলেন সৌন্দর্যসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবীও গোপীপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কবি এই দুইটি সঙ্গীতে ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন, এইবার ধীরে মাধুর্যের রাজ্যে অগ্রসর

হইবেন।" পরবর্তী পদাবলীকীর্তনেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের বিকাশ সুস্পষ্ট।

কবি জয়দেব শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র ভাবময় রসলীলার বর্ণনায় সাধকের রসানুভূতির ক্ষেত্রে যে এক অনির্বচনীয় ভাবমন্দাকিনীর প্রবাহ স্থষ্টি করেছেন এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরবর্তী লীলাকীর্তন বা রসকীর্তনে বিদগ্ধ মহাজনগণ যে বৃন্দাবন, দ্বারকা, মথুরা ও অন্যান্য স্থানবিলাসী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব লীলাকাহিনীর পটভূমিকায় বিচিত্র পালাগানের অবতারণা ক'রে কীর্তনের সুর ও সাহিত্য-ভাণ্ডারকে রসসমৃদ্ধ করেছেন তার ধারণা, আদর্শ ও উদ্দীপনায় বীজ বা উপকরণও তাঁরা সংগ্রহ করেছেন কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' থেকে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনাচ্ছলে জয়দেব বলেছেন: 'কালিয়বিষধরগঞ্জন' (১।১৯), 'বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে' (১।৩৪), 'গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্' (১।৪১), 'রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণাঃ যুবতিঃ প্রশশংসে' (১।৪১), 'রাসোল্লাসভরণে বিভ্রম-ভৃতামাভীরবামভ্রুবাম্' (১।৪৯), 'বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ' (২।১), 'গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখচুম্বনলম্ভিতলোভম্' (২।৪), 'পীতবসনমনু-গতমুনিমনুজসুরাসুরবরপরিবারম্' (২।৬), 'বিশদকদম্বতলে মিলিতং' (২।৮), 'গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণধৃতং' (২।১৯), 'বৃষ্টিব্যাকুল-গোকুলাবন-রসাদুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনং * * শ্রেয়সি কংসদ্বিষঃ' (৪।২৩), 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী' (৫।০), 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে * * রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং, পশ্যতি তব পন্থানম্' (৫।১১) প্রভৃতি এগুলি যে পরবর্তী পদাবলীকীর্তনের রসধারাসিক্ত মান, খণ্ডিতা, মাথুর, দান, নৌকাখণ্ড, রাস, কলহান্তরিত প্রভৃতি পালারূপ লীলাভিনয়ের বিষয়বস্তুতে গৃহীত হয়েছিল একথা সূক্ষ্মদর্শীমাত্রেই স্বীকার করেন। রাগ, তাল প্রভৃতির বেলায়ও তাই।

এর পর এ' প্রসঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু হবে গীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে নৃত্যলক্ষণসম্পৃক্ত অভিনয়পদ্ধতি—যে অভিনয়পদ্ধতি অব্যাহত আছে এখনো বিশেষভাবে দক্ষিণ-ভারতে তাঞ্জোর-অঞ্চলে ভরত-রচিত নাট্যশাস্ত্রের ধারাকে অনুসরণ ক'রে। যদিও বাঙলার পদাবলীকীর্তনে অভিনয়ের সহযোগ

৩। কবি জয়দেব গীতগোবিন্দে বসন্তরাস (১।৪৯) ও শারদীয়ারাস (৩।২) এই উভয় রাস বা রাসোল্লাসেরই পরিচয় দিয়েছেন।

একান্তভাবে পাওয়া যায় না, তবুও প্রাচীন গীতিনাট্য গীতগোবিন্দের নৃত্যাভিনয়ের কিছুটা প্রাচীন ধারার ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব হবে। তাছাড়া একথা সত্য যে, গীতগোবিন্দ-গীতিনাট্যের বা গেয়নাটকের অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে ভারতেই এবং বিশেষ ক'রে দক্ষিণ-ভারতের ও বাঙলাব গীতিনাট্য ও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যনাট্যগুলির বিকাশ পববর্তীকালে সম্ভব হয়েছিল।



নবম পরিচ্ছেদ

॥ জয়দেব ও পদ্মাবতী ॥

সংগীতশাস্ত্রে নৃত্য এবং বাদ্যকেও সংগীতকলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে--তা যেকোন শ্রেণীর সংগীতই হোক না কেন। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকের সংগীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেব 'সংগীত-রত্নাকর' গ্রন্থে 'সংগীত'-শব্দের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এ'কথাই বলেছেন। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকের পরবর্তী সংগীতগ্রন্থকাররা 'সংগীত'-শব্দের ব্যাখ্যায় বা বিশ্লেষণে শার্ঙ্গদেবকে অনুসরণ করেছেন। তবে এ'প্রসঙ্গে এ'কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'সংগীত'-শব্দটি গীতিকলার বোধক-রূপে ১৩শ শতকের পূর্ববর্তী সময়ে এবং এমন কি খ্রীষ্টপূর্ব যুগেও বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ছাড়া পুরাণগুলির স্থানে স্থানে 'সংগীত' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে 'সংগীত' বলতে তখন নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবেত রূপকেই যে বোঝাত এমন কোন বাঁধাধরা নিয়মের উল্লেখ পাই না। প্রাচীন ভারতে দেবদাসীপ্রথার প্রচলন যখন থেকে হয়, মনে হয় তখন থেকেই 'সংগীত'-শব্দ কলা-রূপে ত্রৌর্যত্রিক তথা নৃত্য, গীত ও বাদ্যকলার সমন্বিত রূপকে নিয়ে সার্থক ছিল। বাঙলাদেশে পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বের সময়ে শিব কিংবা কার্তিকের মন্দিরে দেবদাসিদের সংগীতের ব্যবস্থা ছিল এবং তাতে নৃত্য ও বাদ্যের সহযোগে গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল—একথা 'রাজতরঙ্গিনী'-গ্রন্থে কহ্লন এবং 'পবনদূত'-গ্রন্থে কবি ধোয়ী স্বীকার করেছেন। শ্রদ্ধেয় জি. এস ঘুরে (G. S. Ghurye) তাঁর ***Bharatanātya and Its Costume*** (Poona 1958) গ্রন্থে বাঙলাদেশে শাস্ত্রীয় নৃত্যপ্রসঙ্গে লিখেছেন : "The Kāshmiri royal patron and

employer of Dāmodaragupta, Jayāpida, it would appear, was proficient in Bharata's *Nātyasāstra* even before he took Dāmodaragupta in his service. Kalhana, while describing the intinerary of that King, tells us that he once entered the city of Pundravardhana in 'Gauda-Desa', Bengal. While there, he once chanced to see a dance being performed to the accompaniment of vocal and instrumental music, and being 'versed in the historic arts of the dance, song and the like in accordance with Bharata, sat himself down for a while'. Jayāpida's reign, according to R.S. Pandit, extended from A.D, 751 to 782"। তিনি আরো লিখেছেন: "Another Kāshmiri King, Jayāpida (A.D, 751-782) while he was in the town of Paundravardhana in Gauda, Bengal, once saw in the temple of Kārtikeya a dance 'lāsya' being performed. The dancer 'nartaki', was one Kamalā by name. Kamalā, on her part, looking at him and seeing his hand stretching to his shoulder-top at intervals, concluded that he must be a royal person. Her reasoning was that the hand was stretched over the shoulders behind to catch hold of the 'tāmbula' or the betel nut-leaves-packet from his attanedants, * * Eventually Jayāpida took Kamalā with him to Kāshmir"। এখানে 'লাস্য' নৃত্যছন্দ স্ত্রীলোকদের ও দেবদাসীদের নৃত্যকেই লক্ষ্য করা হয়েছে এবং পুরুষ-নৃত্য ছিল 'তাণ্ডব'। নাট্যশাস্ত্রে ভরত এবং নাট্যদর্পণে রামচন্দ্র তাণ্ডব ও লাস্যনৃত্যের উল্লেখ করেছেন।

তাছাড়া বাঙলার ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের আমলে শাস্ত্রনির্দিষ্ট গান ও নৃত্যের পাশাপাশি দেশীগান এবং আঞ্চলিক নৃত্যেরও প্রচলন ছিল এবং গুপ্ত, পাল ও সেন রাজারা সে-সকল গান ও নৃত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে, রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে 'সেকশুভোদয়া'-গ্রন্থ রচিত হয়। সেকশুভোদয়ার রচয়িতার নাম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।' তবে গ্রন্থনামের সঙ্গে 'সেখ'-

শব্দটির সংযোগ থাকায় গ্রন্থকার ইসলামধর্মসেবী ছিলেন এ' সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন অধিকাংশ পণ্ডিত এবং সেদিক থেকে জলালুদ্দিন তাব্রিজি এর রচয়িতা—এই অভিমতও পণ্ডিতেরা গ্রহণ করেছেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ সুকুমার সেন-সংপাদিত 'সেকশুভোদয়া'-গ্রন্থে (হৃষীকেশ-সিরিজ, নং ১১, আর. এন. শীল বি এ প্রকাশিত) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত মুখবন্ধের (Foreword) বিবৃতিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: "The work, inspite of its being attributed to Halāyudha Miśra of the court of King Lakshmanasena, is to a large extent of Mohammedan inspiration in its contents।" অবশ্য ডক্টর সুনীতিবাবু এখানে স্পষ্ট ক'রে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করেন নি। ডঃ সুকুমার সেন গ্রন্থের মুখবন্ধে (Introduction) যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে সেখ জলালুদ্দিন (তাব্রিজিই) যে মধ্যযুগীয় সাহিত্য 'সেখশুভোদয়া'-র রচয়িতা এ'কথা অনুমান হয়। তিনি লিখেছেন: "The authorship has been ascribed to Halāyudamishra, who is well-known as a courtier of Lakshmanasena, author of the *Brāhmanasarvasva*, a popular *Smriti* work, so that its authenticity might not be questioned"। প্রকৃতপক্ষে বাংলা-সংস্কৃত-প্রাকৃতমিশ্রিত অথবা বিকৃত-সংস্কৃতে লিখিত 'সেখশুভোদয়া-'গ্রন্থটির রচনার ও প্রচারের পিছনে মুসলমান তথা ইসলামধর্মের প্রতিষ্ঠাপ্রচেষ্টারই মর্মকাহিনী সুস্পষ্ট। তাছাড়া ধর্মপ্রচার ও সমাজসংগঠন প্রভৃতির কথা ছেড়ে দিলে 'সেখশুভোদয়া', 'কবীন্দ্রসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'রামচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের ঐতিহাসিক কাহিনীসমূহের সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন বাঙলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক-কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গীতিনাট্য[১] 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের নৃত্য-সম্বলিত নাট্যরূপের পরিচয়দানের পরিপ্রেক্ষণসামগ্রী বা কাহিনীগ্রন্থ হিসাবে সেখ জলালুদ্দিন-রচিত সেখশুভোদয়ার অন্ততঃ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ কিছুটা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

১। Vide *Rajatarangini* by Kalhana (of Kashmir), edited and translated by M. A. Stein (1961), Vols I & II.

গুপ্ত, পাল ও সেন-রাজাদের আমলে বাঙলায় (বৃহত্তর বাঙলায়) নৃত্য-গীতের যে সচ্ছল অনুশীলন ছিল সেকথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। লোকগীতি ও লোকনৃত্যের পাশাপাশি শাস্ত্রীয় করণ, অঙ্গহার ও চারি-সম্বলিত নৃত্যকলার অনুশীলন তখন অব্যাহত ছিল রাজ-অন্তঃপুরে, রাজদরবারে রাজপ্রসাদসংলগ্ন নাট্যগৃহে বা রঙ্গমঞ্চে, দেবায়তনে ও বিভিন্ন পার্বণ-উৎসবাদিতে। অভিজাত নৃত্যকর্মের আঙ্গিক ও বিকাশ নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের নির্দেশানুযায়ী ছিল এবং নৃত্য, নাট্য ও বাদ্যের সহচারী ছিল অভিজাত ও দেশী গান। 'সেখ-শুভোদয়া'-গ্রন্থের কাহিনী কিছু-কিছু বিকৃত ও অতিরঞ্জিত হলেও তা রাজা লক্ষ্মণসেন ও তৎপরবর্তী সমাজে শিল্পরুচি ও সাধারণ জীবনচর্চা-'র উপকরণ-সামগ্রী জোগাতে কার্পণ্য করেনি। সেকশুভোদয়ায় বর্ণিত গঙ্গোনটবধূ বিদ্যুৎপ্রভা, বুঢন মিশ্র, জয়দেবসতী পদ্মাবতী ও কবি জয়দেবের নৃত্যগীত-সম্পৃক্ত কাহিনীর কিছুটা পরিচয় দেব গীতগোবিন্দ নাট্যরূপের পরিচয় দেবার আগে।

'সেকশুভোদয়া'-র ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে নৃত্যসম্পৃক্ত গীতিকাহিনীটি হোল :

(ক) "বিদ্যুৎপ্রভানাম্নী নর্তকীবিশেষা তামানয়। সা নর্তয়তু, লোকাঃ পশ্যন্তু"। এতচ্ছ্রুত্বা রাজা তামানয়ামাস শশিকলয়াসহ। (খ) ইতি ভূতে সতি কশ্চিদ ব্রাহ্মণো বুঢননামামিশ্রঃ (বুঢনমিশ্রনামা ?) রাজসভায়াং গত্বা রাজানমবাদীৎ। 'রাজন্ মহাগায়নেঽহং পুনঃ পণ্ডিতশ্চ। * *'। 'হে বিপ্র, কশ্চিদ ধ্বনিরুদগীয়তাম। ততো দ্বিজঃ পঠমঞ্জরীরাগমুদগীরিতবান। উদগীরিতে সতি পিপ্পলবৃক্ষতলে তস্য পিপ্পলস্য পত্রাণি সমন্তান্যপতৎ। * * তদা সর্বানানীতে সতি জয়দেবমিশ্রশ্চ পদ্মাবতী নাম। তচ্ছব্দমশ্রৌষীৎ। গঙ্গাস্নানং গতে সতি ত্বরয়া রাজসভায়াং সমায়াতা (ঃ) চ। পুনরুক্তবতী চ। * * ততঃ পদ্মাবতী জয়দেবস্য ব্রাহ্মণী গান্ধারনামা ধ্বনিরুদগায়তা চ। তদুদগীরিতে সতি নৌকাঃ গঙ্গায়াং যদ বিদ্যন্তে, শ্রুত্বা, তৎসন্নিধানং সমায়াতা (ঃ) চ। * * তদা জয়দেবমিশ্রোঽবদৎ'। 'অস্য ধ্বনিনা নিষ্পত্র বৃক্ষোঽভবৎ কিন্তু বসন্তসময়ে সামান্যেন বৃক্ষস্য পত্রাণি পতন্তি। মহানিতি কথম্ ? * * 'পূর্ণগীয়তাম্। নিষ্পত্রবৃক্ষাঃ সপত্রো ভবতু'। বুঢনমিশ্রোঽবদৎ 'অহং ন শক্নোমি। ত্বমপি সপত্রং কর্তুং শক্নোমি ? পশ্যতাং কুরু ত্বম্' * *। ততো

জয়দেবমিশ্রঃ বসন্তরাগমুদ্‌গীরতবান্। উদ্‌গীরিতে সতি অস্য বৃক্ষস্য কমনীয়ানি নবপত্রাণি ভূতানি। ততো জয়শব্দঃ সর্বত্র অশ্রৌষীৎ। * * ইতি হলায়ুধ-মিশ্রকৃতৌ সেকেশুভোদয়ায়াম্ মিশ্রোপাখ্যানে ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।”

কাহিনীমূলক গ্রন্থবিবৃতি এই, কিন্তু অতিশয়োক্তি ও অলৌকিকতায় পূর্ণ। তবে ফেনায়িত অতিরঞ্জিত কাহিনীসামগ্রীর মধ্যে বাস্তব উপাদানও যে নাই—তা নয়। শাস্ত্রীয় অভিজাত সুহৈ বা সুহা, পঠমঞ্জরী, গান্ধার বা গান্ধারী, বসন্ত প্রভৃতি রাগের পরিচয় আমরা এই আখ্যানে পাই, যদিও তাদের কয়েকটির প্রভাবের ও কার্যকরিতার প্রতিফলনে ঠিক সত্যতা নাই। তবে ‘বসন্তসময়ে সামান্যেন বৃক্ষস্য পত্রাণি পতন্তি’ প্রসঙ্গে বসন্তকালে জয়দেব মিশ্রের বসন্তরাগের প্রতিফলন সার্থক হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যুৎপ্রভা, পদ্মাবতী ও জয়দেবের সংগীতকুশলতার নিদর্শন পাওয়া যায় এই কাহিনী থেকে। উড়িষ্যা বা উৎকলের মনীষীরাও পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে জয়দেব (মিশ্র?) ও পদ্মাবতীর গীতগোবিন্দগানের সঙ্গে ছন্দায়িত নৃত্যের উল্লেখ করেছেন।

সেকশুভোদয়ায় ত্রয়োদশ পরিচ্ছদ থেকে বিশেষ ক'রে পদ্মাবতী ও জয়দেবের সংগীতপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, আর নৃত্যের কিছুটা পরিচয় পাই বিদ্যুৎপ্রভা ও শশিকলার প্রসঙ্গে (‘বিদ্যুৎপ্রভানাম্নী নর্তকী-বিশেষা’)। ষোড়শ পরিচ্ছেদে কবি ধোয়ীর পরিচয়ও দিয়েছেন জলালুদ্দিন তাব্রিজ: ‘অয়মপি ধোয়ী সেবকত্বেন * *’; ‘অয়ং ধোয়ী তন্তুবায়ঃ’তচ্ছ্রুত্বা ধোয়ী তানব্রবীৎ।[২] পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ধোয়ী ‘পবনদূত’-গ্রন্থে পাল ও সেন-রাজাদের গৌরবকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন বাঙলাদেশের নগর ও পল্লীসমাজের জীবনচর্চার কাহিনীর উল্লেখ করেছেন।

তাব্রিজির ‘সেকশুভোদয়া’ নাভাজীর ‘ভক্তমাল’ প্রভৃতি গ্রন্থের কাহিনী থেকে অনেকে জয়দেবকে নট ও পদ্মাবতীকে নটী শ্রেণীভুক্ত করেছেন। ‘ভক্তমাল’-গ্রন্থকার পদ্মবতীকে পুরীধামে জগন্নাথ-মন্দিরে নৃত্যশীলা নটী বা দেবদাসী বলেই বর্ণনা করেছেন এবং কবি জয়দেব নাকি পদ্মাবতীর নৃত্য ও গীতছন্দে তাল রক্ষা করতেন এবং তারি সাক্ষ্য হিসাবে কবি গীতগোবিন্দে

২। কবি জয়দেবও ধোয়ীর নামোল্লেখ করেছেন গীতগোবিন্দে: ‘শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতি’।

'পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্তি' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনী বা কথার পিছনে ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু তা নির্ণয় করবেন বিচক্ষণ ঐতিহাসিকগণ। তাঞ্জোর সরস্বতীমহল-গ্রন্থমালার অন্তর্গত *Gitagobinda with Abhinaya (1963)* গ্রন্থের সম্পাদক বিদগ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ও শিল্পকলারসিক পণ্ডিত কে. বাসুদেব শাস্ত্রী গ্রন্থ-বিবৃতিতেও ঐ কথার উল্লেখ করেছেন। আমরা নৃত্যসম্বলিত গীতিনাট্যরূপ 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের পরিচয় দেব ঐ গ্রন্থকেই অনুসরণ ক'রে। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন: "He (Jayadeva) was born in Bengal, but he made Puri his home. * * This is indicated by the reference in the text of the Ashtapadi to the accompaniment of Nritya by his devoted wife, Padmavati He calls himself in introductory verse No. 2 an expert in directing the feet of Padmāvati in her dance (*Padmāvati-charana-chārana-chakravarti*), and again he refers to the collaboration of Padmavati in his recital in Ashtapadi 21 (*Vihita–Padmāvati-sukha-samāji bhanati Jaydeva Kavirājarāje*).

এ' প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে, সেকশুভোদয়ার অনুসরণে কবি জয়দেব ও পদ্মাবতীকে নট ও নটী অথবা সংগীতকলানিপুণ ও নিপুণা কিনা তা প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য, গীতিনাট্য 'গীত-গোবিন্দ'-পদগানকে পৃষ্ঠ বা উৎসক্ষেত্র (back-ground) করে যে পরবর্তী রসসমৃদ্ধ পদাবলীকীর্তনের সার্থক সৃষ্টি হয়েছিল তারই আভাস দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের রূপ, বিকাশ, সৌন্দর্য, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও রসধারার পরিচয় দান করা ঐতিহাসিক দৃষ্টির সহায়তা নিয়ে। বিদগ্ধ বৈষ্ণব-মহাজন পদকর্তা ও গ্রন্থকারদের বিবরণ থেকে কীর্তনেও যে মৃদঙ্গ-ছন্দের ও গীতিভঙ্গীর তালে তালে নৃত্যের প্রচলন এবং তার সঙ্গে বিচিত্র বাদ্যের সহযোগ ছিল এ'কথা আমরা জানতে পারি। নৃত্য কীর্তনের প্রধান অঙ্গ না হলেও ভাবসমৃদ্ধি ও ছন্দমাধুর্য সৃষ্টির পক্ষে যে পরমসহায়ক ছিল এবং এখনো আছে একথা কীর্তনরসিকমাত্রেই স্বীকার করবেন। আমরা বৈষ্ণব-পদ গ্রন্থে কীর্তনের সঙ্গে নৃত্যের উল্লেখ পাই।

এবার দক্ষিণ-ভারতে গীতগোবিন্দের গীতিরূপ ছাড়াও যে নৃত্যনাট্যের

রূপ গড়ে উঠেছিল এবং এখনো কিছু কিছু তার ধারা সঞ্জীবিত আছে তার পরিচয় দেব। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তাঞ্জোরের সরস্বতীমহল প্রকাশন থেকে ***Gitgovinda with Abhinaya*** নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে সেটির সম্পাদনা করেছেন বিদ্বান শ্রীবাসুদেব শাস্ত্রী। তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন: "Abhinaya, given here, agrees well with the practice of the art in the Tanjore District which is now the home of the purest tradition of Bhratanātya, is itself sufficient to conclude that the work is pretty old * * It is extremely probable that this work was composed by the direct disciples of Sri Jayadeva himself or those just after them"। তিনি আরো বলেছেন যে, তামিল-দেশের প্রাচীন 'শিলপ্পাধিকরম্'-গ্রন্থে মণ্ডলাকারে রাসনৃত্যের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা সাধারণ গোপবালা বা আভীর রমণীদের কৃষ্ণ ও গোপীগণের ভূমিকা নিয়ে সম্পন্ন করতো এবং সে নৃত্যের নাম ছিল 'অয় চিযর-কুরবৈ' (Aychiyar Kuravai)। এই তাঞ্জোর-গ্রন্থমালায় প্রকাশিত গীতগোবিন্দ-গ্রন্থে মুনি ভরত-প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র'-সম্মত ২৬ প্রকার অসংযুক্ত হস্ত, ১৩ প্রকার সংযুত হস্ত, ৪ প্রকার হস্তকরণ, ১৩ রকম শিরকর্মের উল্লেখ আছে। নাট্য-শাস্ত্রের ৮ম, ৯ম ও ১০ম অধ্যায়ে এবং নন্দিকেশ্বর-রচিত অভিনয়দর্পণে এদের পরিচয় দেওয়া আছে। আমরা এই গ্রন্থ থেকে 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের একটির নিদর্শন দেব নৃত্যনাট্যের সার্থক রূপায়ণ হিসাবে।

গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের প্রথম গানটি হোল—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয়জগদীশ হরে।

এই গানটি মালবরাগে ও রূপকতালে গান করার রীতি ছিল। মালবরাগের ধ্যানশ্লোক—

নিতম্বিনীচুম্বিতবক্ত্রবিম্বঃ শুভদ্যুতিকুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ।
সঙ্গীতশালাং প্রবিশন্ প্রদোষে মালাধরো মালবরাগরাজঃ॥

এবং রূপকতালের পরিচয়: 'বিরামান্তদ্রুতদ্বন্দ্বো রূপকঃ স্বাদ্বিলক্ষণ

ইতি'।[৩] 'প্রলয়পয়োধি জলে' প্রভৃতি গানের নৃত্যনাট্যরূপের পরিচয় দিয়েছেন 'অভিনয়'-গ্রন্থকাব,

(১) প্রলয়—পতাকোপরিমর্দিত পতাকেন গগনদৃষ্ট্যা চ।
(২) পয়োধিজলে—অধঃস্বস্তিকীকৃতবিচ্যুতোর্ধ্বতলপতাকাভ্যাম্।
(৩) ধৃতবানসি—অধোদেশাদুদ্বৃত্তমুষ্টিনা।
(৪) বেদং—পুবস্তলনিকুঞ্চকেন।
(৫) বিহিত—শনৈবধস্তলীকৃতপতাকেন।
(৬) বহিত্র—চালিতাঙ্গুষ্ঠকবপ্রসাবিতপুষ্পপুটেন।
(৭) চবিত্রং—প্রসাবিতেতোর্ধ্বতলপতাকেন।
(৮) অখেদং—হৃদ্‌গতপতাকেন মুকুলযা দৃষ্টা চ।
(৯) কেশব—কেশবন্ধেন।
(১০) ধৃত—আবর্তনেন কৃতমুষ্টিনা।
(১১) মীনশবীব—মকবহস্তবেন।
(১২) জয—উদ্ধৃতহস্তকেন।
(১৩) জগদীশ—ললাটস্থাঞ্জলিনা।
(১৪) হবে—বৈষ্ণবস্থানকেন।

গানেব প্রতিটি কথা ব শব্দ নৃত্যসম্পর্কিত হস্ত, চবণ, গ্রীবা, দৃষ্টি প্রভৃতি সঞ্চালনকর্মেব দ্বাবা প্রকাশিত এবং এ'গুলি বিচিত্র বস ও ভাবেব উদ্বোধক বা প্রকাশক। এখানে হস্ত, দৃষ্টি, অঙ্গকবণ হিসাবে পতাক, পুষ্পপুট, মুকুলদৃষ্টি, মকবহস্ত, অঞ্জলি, কৃতমুষ্টি প্রভৃতি নৃত্যহস্তকবণ নাট্যশাস্ত্রে ও অভিনযদর্পণে দ্রষ্টব্য। নৃত্যনাট্যপবিচায়ক এই গীতগোবিন্দেব সংস্কবণে প্রতিটি গানেব এরূপভাবেই নৃত্যাঙ্গিকেব বিববণ দেওযা আছে। গীতগোবিন্দের গীতিরূপ ছাড়াও নৃত্যরূপ যে শাস্ত্রসম্মত তারই পরিচায়ক এই অভিনয়-গ্রন্থ ও আলোচনা।

৩। কীর্তনে রাগনাম, রাগরূপ, ধ্যানরূপ ও তালক্রমের বিস্তৃত পবিচয পবে দেওযা হবে।



দশম পরিচ্ছেদ

॥ গীতগোবিন্দের আন্তর ও সাঙ্গীতিক রূপ ॥

(এক)

পূর্বে আমরা তাঞ্জোর-সরস্বতীমহল-প্রকাশিত *Gitagobinda with Abhinaya* -গ্রন্থ থেকে 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের নৃত্যসম্পৃক্ত নাট্যরূপের কিছুটা পরিচয় দিয়েছি এবং সেই নৃত্যসম্পৃক্ত নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরত[1] ও অভিনয়দর্পণকার নন্দীকেশর-সমর্থিত নিয়ম-নীতির অনুরূপ তা স্পষ্ট বোঝা যায়। *Gitagovinda with Abbhinaya*-গ্রন্থে সম্পাদক বিদ্বান্ শ্রীবাসুদেব শাস্ত্রী মুখবন্ধে লিখেছেন : "Having thus been composed for the express purpose of Nritya, the Abhinaya for all the pieces must have been determined and preserved by tradition. But the traditional practice has suffered by the general break of tradition due to the foreign invasion and foreign influence. Fortunately for us, however, the Abhinaya for every word is found in two manuscripts, preserved in the Sraswats-Mahal. * * The fact that the Abhinaya, given in here, agrees well with the Art in the Tanjore District, which is now the home of the purest tradi-

১। ভরত-এর সঙ্গে 'মুনি' শব্দ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য এই যে, 'ভরত' একটি উপাধি (title)-বিশেষ এবং এই উপাধিধারী শাস্ত্রকার বা গ্রন্থকার আরও অনেক ছিলেন। নাট্যশাস্ত্র-রচয়িতা ভরতকে তাঁদের থেকে পৃথক করার জন্য তাই 'মুনি' শব্দ তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

tion of Bharata-natya. It is itself sufficient to conclude that the work is pretty old" ।

এ'প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গীতগোবিন্দ বা 'অষ্টপদী'-গানের গোত্র বা পর্যায়-নির্ধারণব্যাপারে মতবাদ এবং মতভেদেরও অন্ত নাই। গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, অভিনাটক, আখ্যান-নাটক, অপেরা, যাত্রা, খণ্ডকাব্য এ' ধরনের বিচিত্র মন্তব্য গীতসম্বন্ধে করা হয়েছে। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয় বিচার-বিশ্লেষণভঙ্গীতে গীতগোবিন্দে সংগীত ও কাব্যের মিশ্রণই স্পষ্ট এবং তা থেকে গীতগোবিন্দ যে নাটগীতি ও খণ্ডকাব্য এ' সিদ্ধান্তই অধিকাংশ মনীষী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জানি না, কেন তাঁরা এই গীতিকাব্যের নৃত্যসম্বলিত নাট্য-রূপটির আলোচনা থেকে বিরত। একথা সত্য যে বিশেষ ক'রে আখ্যান, নাটকীয়তা ও সংগীত ত্রিধাতু অথবা ত্রিবৈশিষ্ট্য-সুম্বলিত এই পদগান, কিন্তু এর নৃত্যসম্পৃক্ত নাট্যরূপের বৈশিষ্ট্য ও কোন অংশে অবহেলার যোগ্য নয়।

আমরা পদাবলীকীর্তনের প্রাণকেন্দ্র ও উৎসস্বরূপ 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের নৃত্যসম্পৃক্ত নাট্যরূপের নিদর্শনসূচক বিশদ আলোচনা না করে কবি জয়দেব-প্রদর্শিত একটিমাত্র সংকেতশব্দেরই উল্লেখ করবো। কবি চতুর্থ সর্গের ৯ম গানের প্রথম চরণে বলেছেন: "শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম"। পূজারী গোস্বামী প্রভৃতি ভাষ্য ও টীকাদারদের অধিকাংশই 'নটনীয়ম্'-শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন 'নর্তয়িতব্যম্' বা 'নর্তিতব্যম', কিন্তু রাণা কুম্ভা 'রসিকপ্রিয়া'-টীকায় এর সঠিক মর্ম-বিশ্লেষণ করেছেন বলে মনে হয়। রাণা কুম্ভা বলেছেন: "শ্রীজয়দেবেতি। হে বৈষ্ণবাঃ; ইদং শ্রীজয়দেবভণিতং যদি মনসাধিকং নটনীয়মভিনেতব্যম। 'নট'-শব্দেনাত্র নাট্যস্যাভিনয়-প্রাধান্যাদভিনয়ো বিবক্ষিতঃ। অথবা, নটনীয়মিত্যাস্বাদনীয়ম, রসনীয়মিতি যাবৎ। 'নাট্যশব্দো রসে মুখ্যঃ' ইতি ভবতীয়ে।"[২] তাছাড়া গীতগোবিন্দের রাগ-বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ্য করি যে, কবি জয়দেব প্রধানভাবে সংগীত-প্রকৃতির নির্দেশ দিয়ে যেভাবে সকল গানের প্রবন্ধরূপ ও বিচিত্র রাগরূপের উল্লেখ করেছেন—সেই সংকেতের পূর্ণপরিচয় দিয়েছেন রাণা কুম্ভা 'রসিক-প্রিয়া'-টীকায়। 'গীতগোবিন্দ'-পদগান যদি সত্যিই বাঙালী নাটগীতি বা যাত্রার পূর্বসূত্র নাটগীতি অথবা অপেরা হোত তাহলে তাতে শাস্ত্রনির্দিষ্ট

২। নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই প্রকাশিত 'গীতগোবিন্দ' (নবম সংস্করণ, ১৯৪৯), পৃঃ ৮১

অভিজাত তথা ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ের রাগ, তাল ও প্রবন্ধ-নির্বাচনের কোন সার্থকতাই থাকত না এবং সে' সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করবো কীর্তনে রাগ ও তালের বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে। অবশ্য গীতিরস ও সাহিত্যরস-আবেদনের দিক থেকে অনেকে গীতিগোবিন্দকে গীতিরসার্দ্র 'আখ্যানকাব্য' বলে সিদ্ধান্ত করেন এবং সে সিদ্ধান্ত সাহিত্যের রূপ ও রসদৃষ্টির দিক থেকে কিছুটা সত্য। মনে হয়, 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের গোত্র বা পর্যায়-নির্ধারণব্যাপারে কেবলই রস ও ছন্দানুবিদ্ধ সাহিত্যদৃষ্টি কিংবা সংগীতদৃষ্টি নিয়ে বিচার না ক'রে সামগ্রিকভাবে এবং বিশেষ ক'রে এর আনুসঙ্গিক অথবা অপরিহার্য সহায়কসামগ্রী শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ, রাগ ও তাল-সম্পৃক্ত পদসাহিত্য, আখ্যান ও নৃত্যরূপেরই বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

এবার 'গীতগোবিন্দ'-পদগানসম্পৃক্ত রাগ ও তালের কিছুটা আলোচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে পদগানগুলির প্রবন্ধরূপ কি তাদের পরিচয় দেবার চেষ্টা করি। পূর্বেই বলেছি যে, গীতগোবিন্দ-পদগান 'প্রবন্ধশ্রেণীর গান'। যেমন, প্রথম সর্গের দ্বিতীয় গান: "বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতসদ্মা পদ্মাবতীচরণ-চক্রবর্তী" প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যায় পূজারী গোস্বামী বলেছেন: "এতৎ শ্রীগীতগোবিন্দাখ্য প্রবন্ধং প্রকর্ষেণ বাধ্যতে শ্রোতৃণাং হৃদয়মস্মিন্নিতি প্রবন্ধস্তং করোতি প্রকাশয়তি।" রসমঞ্জরীকার শঙ্কর মিশ্র বলেছেন: "জয়দেব-কবিরেতং গীতগোবিন্দাখ্যং প্রবন্ধং করোতি।" রসিকপ্রিয়া-টীকায় রাণা কুম্ভ বলেছেন: "কবিবিদানীং * * শৃঙ্গারোত্তর প্রবন্ধং কর্তুং প্রতিজানীতে —বাগ্‌দেবতেতি। জয়দেব-কবিরেতং গীতগোবিন্দাভিধং প্রবন্ধং করোতি।" অবশ্য এ' সমস্ত টীকা বা ভাষ্যসিদ্ধান্ত কবি জয়দেবের "শ্রীবাসুদেবরতিকেলি-কথাসমেতমেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্" পদাংশকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হয়েছে। প্রবন্ধের পরিচয় দিয়ে ভোজদেব বলেছেন,

শৃঙ্গারৈকপ্রধানো যো গীততালাদিসংযুতঃ।
অভিসারার্থনিপুণঃ প্রবন্ধঃ স প্রকীর্তিতঃ॥

গীত অর্থে এখানে রাগ। তালযুক্ত হবে শৃঙ্গাররসাত্মক পদ এবং সে পদাভিপ্রায় হবে অভিসারপ্রধান। 'অভিপ্রায়'-শব্দে প্রয়োগ বুঝতে হবে। সংগীতশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, প্রকৃষ্টরূপে গান বা গীত পদবদ্ধ অর্থাৎ রাগ, তাল, পাট, ধাতু, অঙ্গ প্রভৃতি'দ্বারা সম্বন্ধ (বদ্ধ ও বন্ধ একার্থক) হলে তাকে

'প্রবন্ধ' বলে। সুতরাং এই 'প্রবন্ধ'-শব্দ থেকে আমরা বুঝি যে, গীতগোবিন্দ বা অষ্টপদীগান রাগ, তাল, অঙ্গ, ধাতু প্রভৃতি সমন্বিত হয়ে রূপায়িত হওয়া উচিত। গীতগোবিন্দের ভাষ্য ও টীকাকারদের মধ্যে মনে হয় একমাত্র সংগীতশাস্ত্রবিদ্[৩] রাণা কুম্ভাই রাগ, তাল ও প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে কলা, রীতি, ছন্দ, লয়, অলঙ্কার ও বৃত্তিযুক্ত নাট্যগীতিরূপের সবিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, জয়দেবের সূচনাগীতি "মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ * * যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ" এই প্রথম পদ বা গানের রাগ, তাল, বৃত্তি, কলা প্রভৃতির পরিচয় দিয়ে রাণা কুম্ভা বলেছেন: "গমকালাপপেশলতায়া মধ্যমগ্রামে ষাড়বেন মধ্যমগ্রহেণ মধ্যমাদিরাগেণ গীয়তে * * * শৃঙ্গারাবস্থানসূচিকা কৌশিকী-বৃত্তিঃ। সংভাবিতা গীতিঃ। তস্যাশ্চ লক্ষণম্—'সম্ভাবিতা ভূরিগুরুর্দ্বিকলা বার্তিকে পথি।[৪] মধ্যে লয়ঃ। প্রসাদো গুণঃ। অনুকূলো নায়কঃ, স্বাধীন-পতিকা নায়িকা। পূর্বার্ধেঽভিলাষলক্ষণো বিপ্রলম্ভঃ। অপরার্ধে সংভোগশ্চ শৃঙ্গারঃ। * * শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দঃ।"[৫] এখানে প্রথম পদগান-সম্পর্কে রাণা কুম্ভা যে বলেছেন 'সম্ভাবিতা গীতিঃ', শার্ঙ্গদেবও সংগীত-রত্নাকরে সে প্রসঙ্গে বলেছেন: "* * দ্বিরাবৃত্তপদাং পরে। সংক্ষেপিতপদা ভূরিগুরুং সম্ভাবিতা মতা॥" (১।৮।১৯)। টীকাকার কল্লিনাথ ও সিংহভূপাল দু'জনেই এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রী মতঙ্গও সম্ভাবিতার পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "সংক্ষিপ্তত সম্ভাব্যতে পদানাং যত্র সা সম্ভাবিতা।" মতঙ্গের এই উদ্ধৃতিবাক্য দিয়েছেন কল্লিনাথ তাঁর টীকায়। সিংভূপাল এর অর্থ-বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন: "দ্বিরাবৃত্তে পদান্তরে যস্যাং সা সংক্ষেপিতপদা বহুগুরুযুতা সম্ভাবিতা গীতিঃ। প্রথমকলায়াং চত্বারি পদানি গীত্বা ভক্ত্যা দেবং রুদ্রং বন্দ ইতি, দ্বিতীয়কলায়াং মধ্যস্থং পদদ্বয়ং দ্বির্গীয়তে দেবং দৈবং রুদ্রঃ রুদ্রমিতি, তৃতীয়কলায়াং প্রথমকলাবদ্ ভক্ত্যা দেবং রুদ্রং বন্দ ইতি।" শার্ঙ্গদেব এর গীতি ও স্বর-রূপের উল্লেখ করেছেন এভাবে—

৩। রসিকপ্রিয়ার সূচনাশ্লোকে রাণা কুম্ভা নিজেই বলেছেন: "নত্বা মতঙ্গভরতপ্রমুখানাং সুগীতসংগীতশাস্ত্রনিপুণাঞ্জয়দেববাচম্"। এ' থেকে জয়দেবের সংগীত-কুশলতার পরিচয়দানের সঙ্গে সঙ্গে রাণা কুম্ভা নিজের সংগীতশাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন বুঝতে হবে।

৪। এ' সম্বন্ধে সংগীত-রত্নাকর ১।৮।১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সিংহভূপাল ও কল্লিনাথ টীকায় বিশদভাবে সম্ভাবিতাগীতির পরিচয় দিয়েছেন ব্রহ্মগীতির পর। সম্ভাবিতাগীতি গ্রামরাগের সংযোগে বিশেষভাবে প্রাচীনকালে গাওয়া হোত।

ধা	মা	মা	রি	গা	রা	গা	সা	সা
ভ	০	ক্ত্যা	০	০	দে	০	বং	০

নী	ধা	সা	নী	ধা	নী	মা	মা
রু	০	দ্রং	০	বন	০	দে	০

সে'রকম গীতগোবিন্দের 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভূবঃ'- প্রভৃতি পদ প্রথম কলায় চারটি পদের সমাবেশ থাকবে, দ্বিতীয় কলায় মধ্যকার দুটি পদের দু'বার আবৃত্তি এবং তৃতীয় কলায় প্রথম কলার মতো চারটি পদের সমাবেশ থাকবে। সম্ভাবতাগীতি ব্রহ্মগীতির মতো গ্রামরাগসম্পৃক্ত হয়ে গীত হোত স্বাধীনভাবে অথবা ধ্রুবাগীতির সঙ্গে। সংগীতশাস্ত্রবিদ্ রাণা কুম্ভা এ'তত্ত্ব জানতেন, সেজন্য তিনি গীতিগোবিন্দের শাস্ত্রীয় গীতিরূপের এ'ভাবে পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং গীতগোবিন্দের প্রতিটি পদের প্রবন্ধ এবং সঙ্গীত-রূপ লক্ষ্য করার বিষয়। রাগ, তাল, লয় প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে গীতগোবিন্দগান অর্থহীন। তাছাড়া নৃত্য ও নাট্যরূপ এর স্বতন্ত্র। সতরাং এই সকল দিক থেকে গীতগোবিন্দের গোত্র ও রূপ নির্ণয় করা সমীচীন।

বিশেষ করে 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের রাগ ও তাল-সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে বলে রাখা সমীচীন যে, রাগনামের ও তালনামের ব্যাপারে পূজারী গোস্বামী ও অন্যান্য টীকা ও ভাষ্যকাররা একমত হলেও রাণা কুম্ভা 'রসিকপ্রিয়া'-টীকায় স্বাধীনভাবে একটি বিশ্লেষণরীতির উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রাগনাম ও তালনামের কোন কোন অংশে অপরাপর টীকাকারদের সঙ্গে মিল থাকলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পৃথক ও নূতন। নির্ণয়সাগর-প্রেস থেকে প্রকাশিত গীতগোবিন্দের (১৯৪৯ খ্রীঃ) পরিশিষ্টে দীপিকা, রসমঞ্জরী, রসিকপ্রিয়া, পদদ্যোতনিকা, বালবোধিনী ও সঞ্জীবিনী এই ছ'টি টীকার সমাবেশ ক'রে তাদের মধ্যে রাগনাম ও তালনামের মধ্যে একটি ঐক্য ও অনৈক্য মতের তালিকার উল্লেখ করা হয়েছে। সেই বিশ্লেষণী তালিকা থেকে জানা যায় যে, রাগনামে ও তালনামে ছ'টি টীকার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও মোটামুটিভাবে তারা এক। কিন্তু কার্যতঃ তা নয় বলেই আমাদের ধারণা হয় একমাত্র 'রসিকপ্রিয়া'-টীকার প্রমাণ থেকে। কেননা উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, প্রথম অষ্টপদী 'মালবগৌডরাগেণ রূপক তালেন গীয়তে' এই রূপকতালে ও মালবগৌড়রাগে গান করার বিধি আছে যেখানে মূলে,

সেখানে রসিকপ্রিয়াকার রাণা কুম্ভ মূলানুসারে 'মালবরাগেণ—প্রলয়েতি' শব্দ ব্যবহার করেও "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্"[৫] প্রভৃতি পদগানকে 'কীর্তিধবল-ছন্দ' এই অভিধা দিয়ে আদিতালে, বিলম্বিত লয়ে ও মধ্যমাদি তথা মধুমাধবীরাগে গান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "অত্র প্রলয়পয়োধীত্যাদ্যেকাদশস্বপি পদেষু[৬] কীর্তিধবলং নাম ছন্দঃ। তল্লক্ষণং যথা—'অযুজি পদে দ্বাদশৈব যুজি তু যস্য হি দশ বাষ্ট মাত্রাশ্চেৎ। পরমপি পদযুগমেবং তং কীর্তিধবলমিত ধীবাঃ প্রাহুঃ' ॥ * * 'ছন্দসা কীর্তিপূর্বেন ধবলেন বিনির্মিতঃ। পদান্তভোগরুচিবস্ততঃ পাটস্বরাঞ্চিতঃ॥ দশাবতারকীর্ত্যাভ্যো ধবলোঽয়ং প্রবন্ধরাট্। রাগোঽত্র মধ্যমাদিঃ স্যাদাদিতালো বিলম্বিতঃ॥ লয়ঃ স্যান্মাগধী রীতিঃ শৃঙ্গারোঽত্র রসঃ স্মৃতঃ। কীর্তনং বাসুদেবস্য বিনিয়োগো নৃত্যোৎসবে' ॥" 'সংগীতরাজ'-গ্রন্থ রচয়িতা সংগীতকুশল রাণা কুম্ভ এই প্রবন্ধের নামকরণ করেছেন 'কীর্তিধবলপ্রবন্ধ'। ত্রয়োদশ শতকের সংগীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেব 'সংগীত-রত্নাকর'-গ্রন্থে চতুর্থ প্রবন্ধাধ্যায়ে বিচিত্র প্রবন্ধের পরিচয়প্রসঙ্গে 'করণ'-প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন এবং মঙ্গল, আনন্দবর্ধন, কীর্তিলহরী বা কীর্তিপূর্বিকালহরী এই প্রবন্ধ-তিনটিকে করণপ্রবন্ধের অন্তর্গত বলেছেন। টীকাকার সিংহভূপাল কীর্তিলহরী-প্রবন্ধের পরিচয়প্রসঙ্গে বলেছেন : "যস্তু ধ্রুবস্যাধস্থানে উদ্‌গ্রাহদ্বিতীয়ার্ধং গীয়তে অন্যল্লক্ষণমানন্দবর্ধনবত্তদা কীর্তিলহরী।"[৭] ধবলপ্রবন্ধ-সম্পর্কে শার্ঙ্গদেব বলেছেন : "আশীর্ভির্ধবলো গেয়ো ধবলাদিপদান্বিতঃ। যদ্বাচ্ছয়া বা ধবলো

৫। গমক, আলাপ, মধ্যমগ্রাম (গ্রাম তিনটি—ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার), মধ্যমগ্রহ অর্থে মধ্যমস্বরে গানের বা পদের আরম্ভ,মধ্যমাদি বা মধুমাধবীরাগ, ষাড়ব অর্থাৎ ঐ রাগে ছ'টি মাত্র স্বরের সমাবেশ। কিন্তু মধ্যমাদি, মধুমাবর্তা বা মধুমাধবী রাগের প্রাচীন রূপ ঔড়ব অথাৎ পাঁচটি স্বরের সমাবেশ এবং মধ্যমাদি ভৈরবরাগের প্রথম রাগিণী। মধ্যম গ্রহ (মধ্যমস্বরে আরম্ভ) এবং ঋষভ-ধৈবত-বর্জিত। বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে মধ্যমাদি বা মধ্যমাধবীতে গান্ধার ও ধৈবত-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব (স রি ম প নি-কোমল)। দুটি কল বিশিষ্ট বার্তিক (লয়েরই সামিল) এবং মধ্যলয়ে গীত হবে।

৬। 'প্রলয়পয়োধিজলে'......১। থেকে 'কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে' এই ১১শ পদ পর্যন্ত কীর্তিধবল-ছন্দ।

৭। সংগীত-রত্নাকর ৪।১৪২, ১৪৫

গেয়ো লোকসিদ্ধিতঃ' ॥[৮] ধবলপ্রবন্ধ আবার তিন শ্রেণীর—কীর্তিধবল, বিজয়ধবল ও বিক্রমধবল ॥ রাণা কুম্ভা পূর্বোক্ত কীর্তি বা কীর্তিলহরী-প্রবন্ধের কথা বলেন নি, বলেছেন ধবলশ্রেণীর 'কীর্তিধবল'-প্রবন্ধের কথা। 'কীর্তিধবল'-প্রবন্ধের পরিচয় দিয়ে টীকাকার সিংহভূপাল বলেছেন : "বিষমে প্রথমে তৃতীয়ে চ চরণে ছগণঃ ছগণদ্বয়ম্ : সমে দ্বিতীয়ে চতুর্থে চ চরণে তগণঃ দগণো বাধিকঃ, তদা কীর্তিধবলঃ।" "তদা স্যাং কীর্তিধবলো" বোলে শার্ঙ্গদেব কীর্তিধবল-প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে চারটি চরণ থাকে, দুইটি বিষম ও দুটি সম-চরণ। দুটী বিষম-চরণে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় চরণে দুটি করে ছ-গণ থাকে, আর সম-চরণে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে তা ছাড়া ত-গণ বা দ-গণ থাকে। সুতরাং বিষম-চরণে দুটি ছ-গণ থাকলে মোট বারোটি মাত্রার সমষ্টি এবং সম-চরণে সঙ্গে ত-গণ, সুতরাং আরো তিনটি মাত্রা তার সঙ্গে যুক্ত হলে পণেরো মাত্রার সমষ্টি হয়, আর দ-গণ তাতে সংযুক্ত হোলে মাত্রার সংখ্যা হয় চৌদ্দ।[৯]

এ'ভাবে রাণা কুম্ভা 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের পদগুলিতে শাস্ত্রীয় অভিজাত তথা ক্ল্যাসিক্যাল রাগ, তাল, প্রবন্ধ প্রভৃতির সমাবেশের উল্লেখ করেছেন। এর পরে আমরা সমস্তগুলি রাগ, তাল ও প্রবন্ধের এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ-সাহিত্যের বৃত্তি, রীতি, অলংকার প্রভৃতির আলোচনা করবো, কেননা পরবর্তী পদাবলী কীর্তনের অঙ্গাভরণরূপেও এগুলি গৃহীত হয়েছে।

৮। সংগীত-রত্নাকর ৪।৩০২

৯। এ' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ কল্লিনাথ ও সিংহভূপালের টীকা দ্রষ্টব্য।



একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ গীতগোবিন্দের গঠনশৈলী ॥

গীতগোবিন্দে ক্রমিক পদগান বা অষ্টপদীর রীতি অনুসারে রাগ ও তালের নাম ও রূপের পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। যে ক'টি অভিজাত শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের সন্নিবেশ আছে গীতগোবিন্দের পদগানগুলিতে, সেগুলির সঙ্গে অন্যান্য বিচিত্র রাগ ও তালকে সম্পর্কিত করা হয়েছে পরবর্তী কৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষাও মহাজন-পদাবলীকীর্তনে। সুতরাং পদাবলী কীর্তনের রাগ ও তালের বিশেষ অনুশীলন করার প্রসঙ্গে গীতগোবিন্দ-পদগানের রাগ ও তাল-সম্বন্ধে আমাদের সম্যকজ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

গীতগোবিন্দে (রাণা কুম্ভ বলেছেন 'অষ্টপদী') মোট চব্বিশটি গানের সমাবেশ আছে এবং সে চব্বিশটি গান বা অষ্টপদী দ্বাদশ সর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বাদশ সর্গের মধ্যে—

(১) প্রথম সর্গে চারটি গান মালব বা মালবগৌড়, গুর্জরী, বসন্ত ও রামক্রী বা রামকীরি এই চারটি রাগে এবং রূপক, নিঃসার ও যতি (৩য় ও ৪র্থ গানই যতি) তালে।

(৩) দ্বিতীয় সর্গে দুটি গান গুর্জরী ও মালব বা মালবগৌড় রাগে এবং যতি ও একতালী তালে।

(৩) তৃতীয় সর্গে একটি গান গুর্জরী রাগে ও যতি তালে।

(৪) চতুর্থ সর্গে দুটি গান কর্ণাট ও দেশাগ রাগে এবং যতি ও একতালী তালে।

(৫) পঞ্চম সর্গে দুটি গান দেশ-ববাড়ী ও গুর্জবী বাগে এবং রূপক ও একতালী তালে।

(৬) ষষ্ঠ সর্গে একটি গান গোণ্ডকিবী বাগে ও রূপক তালে।

(৭) সপ্তম সর্গে চাবটি গান মালব বা মালবগৌড, বসন্ত, গুর্জবী ও দেশ-ববাড়ী বাগে এবং যতি (দুটি গান যতি তালে) একতালী ও রূপক তালে।

(৮) অষ্টম সর্গে একটি গান ভৈববী বাগে ও যতি তালে।

(৯) নবম সর্গে একটি গান বামকিবী বাগে ও যতি তালে।

(১০) দশম সর্গে একটি গান দেশ-ববাড়ী বাগে ও অষ্টতালী তালে।

(১১) একাদশ সর্গে তিনটি গান বসন্ত, দেশ ববাড়ী ও ববাড়ী বাগে এবং যতি ও রূপক (রূপক দুটি গানে) তালে।

(১২) দ্বাদশ সর্গে দুটি গান বিভাষ বামকিবী বাগে এবং একতালী ও যতি তালে।

এখানে বাবোটি সর্গে ও চব্বিশটি গানে বা অষ্টপদীতে মালব, মালবগৌড গুর্জবী বসন্ত, বামকিবী বা বামক্রী, কর্ণাট, দেশাগ বা দেশাখ, দেশ-ববাড়ী, গোণ্ডকিবী বা গোণ্ডক্রী, ভৈববী, ববাড়ী বা ববাটী, বিভাষ বা বিভাস এই বাবোটি বাগ (ও বাগিণী) এবং যতি, রূপক, নিঃসাব একতালী, অষ্টতালী বা অষ্টতাল এই পাঁচটি তাল। পূর্বেই আলোচনা কবেছি যে, বাণা কুম্ভা 'বসিকপ্রিয়া'-টীকায় গীতগোবিন্দেব মূলপাঠে কবি জযদেব-বর্তৃক উল্লিখিত বাগ ও তালগুলিব উল্লেখ কবলেও টীকায ভিন্ন ভিন্ন বাগ ও তালেব সন্নিবেশ কবেছেন সম্ভবত তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বাগনাম ও তালনাম অনুসাবে।

গীতগোবিন্দেব মূলপাঠে বাগ-বাগিণীগুলিব নামোল্লেখ আছে, কিন্তু তাদেব রূপ বা স্বরূপেব কোন উল্লেখ নাই। জযদেব ১২শ শতকেব প্রায় শেষেব দিকেব কবি, সুতবাং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেব এবং তৎপূর্বেব সংগীত-শাস্ত্রোক্ত বাগরূপকে লক্ষ্য কবেই কবি বাগগুলিব নির্দেশ দিয়েছেন। সুতবাং জযদেবপূর্ব সংগীতগ্রন্থরূপে আমবা মোটামুটিভাবে পার্শ্বদেবেব (৯ম-১১শ শতক) 'সংগীতসময়সার', অভিনবগুপ্তেব (১০ম শতকেব শেষার্ধ) ভবতভাষ্য 'অভিনবভাবতী', নান্যদেব বা নান্যভূপালেব (১১০৭—১১২৩ খ্রীঃ) ভরতভাষ্য 'সরস্বতীহৃদয়লঙ্কার', সোমেশ্বরদেবেব-২য় (১১৩১ খ্রীঃ) 'মানসোল্লাস' বা

'অভিলাষার্থচিন্তামণি', মম্মটের (১০৫০-১১৫০ খ্রীঃ) 'সংগীতরত্নমালা', শার্ঙ্গদেবের (১২১০-১২৪৭ খ্রীঃ) 'সংগীত-রত্নাকর' সোমেশ্বরের-৩য় (১১৭৪-১১৭৭ খ্রীঃ) 'সংগীত-রত্নাবলী', শারদাতনয়ের (১২০০ খ্রীঃ) 'ভাব-প্রকাশন' বা 'ভাবপ্রকাশ', হরিপালের (১৩০৯-১৩১২ খ্রীঃ) 'সংগীত-সুধাকর' সুধাকলসের (১৩ ৩-১৩৪৯ খ্রীঃ) 'সংগীত-উপদিষৎ', সিংহভূপালের (১৩৩০ খ্রীঃ) 'সংগীতসার', বেমভূপালের (১৫শ শতকের প্রারম্ভে) 'সংগীত-চিন্তামণি', রাণা কুম্ভার (১৪৩৩-১৪৬৮ খ্রীঃ, কারু কারু মতে ১৪৫০ খ্রীঃ) 'সংগীতমীমাংসা, ও 'সংগীতরাজ', কল্লিনাথের (১৪শ শতকের মধ্যভাগ) সংগীত-রত্নাকরের টীকা 'কালানিধি' প্রভৃতি। এ'সকল সংগীতগ্রন্থে ও টীকায় রাগ ও স্বরসজ্জা বা স্বরসমাবেশের যে পরিচয় দেওয়া আছে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের ভারতীয় (এবং বাঙলার) সংগীত-সমাজেও সেই ধরনের রাগরূপের ও তাদের প্রকাশভঙ্গীর প্রচলন ছিল মনে করা যায়, সুতরাং গীতগোবিন্দে উল্লিখিত রাগ-রাগিণীদের স্বরূপ ও স্ববিকাশভঙ্গীর আলোচনা করতে গেলে আমাদের নাট্যশাস্ত্রের সময় থেকে সংগীত-রত্নাকর ও তৎপরবর্তী কালের রাগরূপ সম্বন্ধে কিছুটা অনুশীলন করা উচিত।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, গীতগোবিন্দের চব্বিশটি পদগানে মালব, মালবগৌড, গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরী, কর্ণাট, দেশাখ, দেশবরাডী, গোণ্ডকিরী, ভৈরবী, বরাডী ও বিভাষ বা বিভাস এই বারোটি রাগনামের উল্লেখ পাই। কবি জয়দেব রাগের স্বররূপ ও ধ্যানশ্লোকের কোন উল্লেখ করেন নি। পরবর্তীকালে পূজারী গোস্বামী, রাণা কুম্ভা ও অন্যান্য টীকা ও ভাষ্যকাররা রাগগুলির ধ্যানরূপের সঙ্গে সঙ্গে তালগুলির শাস্ত্রীয় রূপের পরিচয় দিয়েছেন। এ' প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, বর্তমান কালের উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় রাগের রূপগুলি প্রাচীন ভারতে প্রচলিত রাগরূপ থেকে বেশ কিছুটা পৃথক এবং সে পার্থক্যের কারণ রাগগুলির নিয়ামক রাগ বা থাটের (Standard Scale) রূপ-পরিবর্তন। প্রাচীন ভারতে (নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের সময়ে থেকেই) রাগ-নিয়ামক থাট বা মূলরাগের রূপ ছিল বর্তমান কালের অনেকটা কাফীর মতো। 'সংগীতসার'-গ্রন্থকার মাধব-বিদ্যারণ্য তদানীন্তন কালে নিয়ামক থাট বা 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্কেল'-এর নাম দিয়েছেন 'মুখারী—যার স্বরসজ্জা বা স্বররূপ ছিল বর্তমান কালের উত্তর-ভারতীয়

সংগীতপদ্ধতিব 'কাফী' রাগেবই প্রায় অনুরূপ। গীতগোবিন্দেব পদগানে ব্যবহৃত রাগগুলির প্রাচীন ও আধুনিক স্ববরূপগুলিব আলোচনা কবলে তা থেকে গীতগোবিন্দেব বাগগুলিব রূপ ও বিকাশভঙ্গাব পবিচয় পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করি।

প্রথমেই গীতগোবিন্দেব অষ্টম সর্গে প্রথম গানে বা অষ্টপদীতে 'ভৈববী-যতিতালাভ্যাং গীয়তে' এই ভৈববী বাগ বা বাগিণীব আলোচনা কবা যাক্। খ্রীষ্টীয় ৯ম ১১শ শতকেব সংগীতগুণী পার্শ্বদেব 'সংগীতসময়সাব'-গ্রন্থে ভৈববীব পবিচয় দিযেছেন—

ভিন্নষড্‌জসমুদ্ভূতা বাংশন্যাসগ্রহান্বিতা।
সমশেষস্ববা পূর্ণা গান্বিতা তাব-মন্দ্রয়োঃ।
দেবাদিপ্রার্থনাযাং তু ভৈববী বিনিযুজ্যতে ॥

ধৈবতস্বব ভৈববীব অংশ (বা বাদী) এবং গ্রহ (আবম্ভ স্বব) ও ন্যাস (বিবাম বা শেষ-স্বব) এবং সম্পূর্ণজাতি অর্থে সাত স্বববিশিষ্ট। মন্দ্র ও তাব (নিম্ন ও উচ্চ) এই উভয় সপ্তকেব গান্ধাব পয্যন্ত ভৈববীব স্ববগুলি লীলাযিত।

শার্ঙ্গদেব (ত্রয়োদশ শতক) 'সংগীত-বত্নাকব'-গ্রন্থে ভৈববীব প্রসঙ্গে পার্শ্বদেবকেই অনুসবণ কবেছেন, অর্থাৎ ভৈববী সাতস্ববিশিষ্ট, তাব ধৈবত বাদী, গ্রহ ও ন্যাস স্বব। এখানে কোন্ স্বব কোমল বা বিকৃত তাব কোন পবিচয় দেননি পার্শ্বদেব এবং শার্ঙ্গদেবও। কিন্তু পণ্ডিত অহোবল (১৭শ শতক) সংগীত-পাবিজাত'-গ্রন্থে ভৈববীব পূর্ণরূপেব পবিচয় দিয়েছেন, আব দিযেছেন ১৭শ শতকেব গুণী সোমনাথ, দামোদব, লোচন-কবি ও অন্যান্য পববর্তী সংগীতগ্রন্থকাববা। পণ্ডিত অহোবল ভৈববীব স্ববরূপেব ও অন্যান্য বিষয়ের পবিচয় দিয়ে বলেছেন,

স-স্ববাংশগ্রহন্যাস ভৈববী স্যাদ ধ-কোমলা।
বি-নাবোহে তু প-ন্যাসা পঞ্চমেনোভয়োবপি।
ষড়্‌জেনাথাববোহে তু সর্বদা সুখদায়িনী ॥

ভৈববীর অংশ বা বাদীস্বব ষড্‌জ (সা) এবং সংবাদী পঞ্চম (পা), গ্রহ ও ন্যাস তথা আবম্ভ স্বব এবং শেষ-স্ববও ষড়্‌জ এবং ধৈবত কোমল বা বিকৃত (এখানে কোমল স্বরের উল্লেখ কবা হয়েছে এবং সেই কোমলস্বর ধৈবত)। পণ্ডিত সোমনাথ মনে হয় পারিজাতকারকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পণ্ডিত

দামোদর ও লোচন কবির পরিচয়দানের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। লোচন-কবি (১৭শ শতকের প্রথম বা মধ্যভাগ) 'রাগতরঙ্গিণী'-গ্রন্থে ভৈরবীর পরিচয়প্রসঙ্গে বলেছেন: "শুদ্ধা সপ্তস্বর রম্যা বাদনীয়াঃ প্রযত্নতঃ", অর্থাৎ ভৈরবীর সাত স্বরই শুদ্ধ। কিন্তু এখানে মনে করতে হবে যে, লোচনের সময়েও নিয়ামক রাগ বা থাট (Standard Scale) ছিল বর্তমানের কাফীরাগ বা কাফীথাটের অনুরূপ, সেজন্য লোচন-কবি বর্তমান কালের কাফীকেই শুদ্ধমেল বা শুদ্ধথাট রূপে গ্রহণ করেছেন এবং সে হিসাবে তখনকার (১৭শ শতকের) ভৈরবীর স্বরূপ ছিল—সা রি গ (কোমল) ম প ধ নি (কোমল)। কোন কোন গুণী সেই সময়ে ঋষভকে কোমল-স্বর-রূপে ভৈরবীতে ব্যবহার করতেন (এখানে লক্ষণীয় যে, সকল সময়ই রাগরূপ নিয়ে মতভেদের অন্ত ছিল না)। সেজন্য লোচন-কবি বলেছেন: "তদ্‌শুদ্ধং যতস্তাদৃক্ নায়ং রাগাহনুরঞ্জকম্"—অর্থাৎ কোমল-ঋষভযুক্ত ভৈরব ব্যবহৃত হোলে তা শ্রুতিমধুর হয় না। হৃদয়নারায়ণদেব 'হৃদয়কৌতুক' ও 'হৃদয়প্রকাশ' গ্রন্থ-দুটিতে লোচন-কবিকে এ'বিষয়ে হুবহু অনুসরণ করেছেন। পণ্ডিত দামোদর (১৬২৫ খ্রীঃ) 'সংগীতদর্পণ'-গ্রন্থে ভৈরবী-সম্বন্ধে বলেছেন: "সংপূর্ণা ভৈববী জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসমধ্যমা", অর্থাৎ ষড্‌জের পরিবর্তে মধ্যমস্বর ভৈরবীর বাদী, গ্রহ ও ন্যাস স্বর। দামোদর সোবীরীমূর্ছনার মাধ্যমে ভৈরবীর স্বররূপের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ভৈরবীতেও বাদীস্বর মধ্যম ও সংবাদী ষড্‌জ (অবশ্য কারু কারু মতে ধৈবত বাদী ও গান্ধার সংবাদী)। অনেকে ভৈরবীকে সন্ধি-প্রকাশরাগের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু তা কতদূর সমীচীন তা অনুধাবন-যোগ্য, কারণ রাত্রির অন্তর্ধানে দিবালোকের প্রকাশমুহূর্তকে 'সন্ধি' (meeting period of night and day) বলে এবং সে সময়ে প্রভাতসূর্যকে আরতি জানানোর জন্য ভৈরবরাগের ব্যবহার হয়, সুতরাং ভৈরবকেই সেদিক থেকে সন্ধিপ্রকাশ-রাগ বলা সমীচীন। বর্তমান সময়ে ভৈরবী সম্পূর্ণ-জাতি, অর্থাৎ তাতে সাত স্বরের ব্যবহার হয়। ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ কোমলস্বর-রূপে ব্যবহার হয় বর্তমান পদ্ধতির ভৈরবীতে। সুতরাং ভৈরবীতে প্রাচীন ও নবীন (অধুনিক) স্বররূপের মধ্যে প্রার্থক্য অনেক।

অন্যান্য রাগসম্বন্ধেও ঠিক এককথা, অর্থাৎ প্রাচীন রূপের সঙ্গে অধুনিকের পার্থক্য অনেক তার নিয়ামক মেল বা থাটরূপের পরিবর্তনের জন্য। সেভাবে ববাড়ী বা বরাটী, কর্ণাট বা কানাড়া, বসন্ত, মালব, গুর্জরী প্রভৃতি রাগের প্রাচীন ও আধুনিক রূপেব মধ্যে কিছু কিছু (কিংবা অনেক) পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, ৯ম-১১শ শতকের গুণী পার্শ্বদেব বসন্তকে বলেছেন ঋষভ-ধৈবতবর্জিত ঔডব তথা পাঁচস্বরেব বাগ। পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খ্রীঃ) 'স্বরমেলকলানিধি'-গ্রন্থে বসন্তকে 'শুদ্ধবসন্ত' বলেছেন এবং তাব স্বরূপ ষাডব-সম্পূর্ণ-জাতিব (৬ স্বব—৭ স্ববযুক্ত), কেননা আরোহণে পঞ্চমবর্জিত। এখানে লক্ষ্য কবাব বিষয় যে, রামামত্য মুখারীকে নিয়ামক শুদ্ধমেল (Standard Scale) বলে গণ্য করেছেন, তাতে মুখারীব বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিব রূপ দাঁড়ায়—সা বি (কোমল) বি ম প ধ, (কোমল) ধ র্সা ; অর্থাৎ বামামত্যেব শুদ্ধঋষভ ও শুদ্ধধৈবত বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিব কোমল-ঋষভ কোমল-ধৈবত এবং তাঁর শুদ্ধগান্ধাব ও শুদ্ধনিষাদ বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির তীব্র-ঋষভ ও তীব্র-ধৈবত। পণ্ডিত সোমনাথ অনুরূপ অভিমত পোষণ কবেন বসন্তেব রূপ-সম্বন্ধে। বর্তমান পদ্ধতিতেও বসন্তের রূপ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। শুদ্ধবসন্তের প্রচলিত রূপ উভয়-মধ্যম, পঞ্চম-বর্জিত ও ঋষভ-কোমল। প্রাচীন ধ্রুবপদপদ্ধতির গানে এই রূপের প্রচলনই দেখা যায় এবং অনেকেব মতে, কোমল-ধৈবতেরই ব্যবহার হয় বসন্তে ; যেমন, সা গ ম (কড়ি) ধ (কোমল), ঋষভ (কোমল-তারস্থানে), র্সা। এই বসন্তের রূপ পরজ-বসন্তেব রূপেব অনুরূপ। সুতরাং বসন্তের রূপে বর্তমানকালেও মতভেদ দেখা যায়। লোচন-কবি 'রাগতরঙ্গিণী'-গ্রন্থে এবং তাঁব মতানুবর্তী পণ্ডিত হৃদয়নারায়ণ বসন্তকে গৌরী সংস্থান বা গৌরীমেলার রাগ বলেছেন তখনকার গৌরীমেল বর্তমান ভৈরবমেলের অনুরূপ, সুতরাং তখনকার মেলনাম ও বর্তমানের মেলনাম এক নয়, যদিও স্বররূপে প্রায় এক।

'গীতগোবিন্দ'-পদগানে ব্যবহৃত মালব, মালবগৌড, গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরী, কর্ণাট, দেশখে, দেশবরাড়ী, গোণ্ডকিরী, ভৈরবী, বরাডী বা বরাটী ও বিভাষ বা বিভাস এই বারোটি প্রাচীন যুগের রূপানুশীলন করেছেন সংগীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী পণ্ডিত হৃদয়নারায়ণের 'হৃদয়প্রকাশ' ও

'হৃদয়কৌতুক' গ্রন্থ-দুটিতে উল্লিখিত স্বররূপকে অনুসরণ ক'রে।[১] রাগতরঙ্গিণী-কার লোচন কবির অভিমতকে অনুসরণ ক'রেই পণ্ডিত হৃদয়নারায়ণও প্রাচীন রাগগুলির স্বরবিন্যাস করেছেন। লোচন কবি কিংবা হৃদয়নারায়ণের ও অন্যান্য প্রাচীন সংগীতগ্রন্থকারদের রাগবিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি—

(১) মালব ও মালবগৌড় গৌরী-সংস্থান বা ভৈরবমেলের স্বররূপ সা রি (কোমল) গ ম প ধ (কোমল) নি। কিন্তু বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতিতে কড়ি-মধ্যমের (হ্ম) ব্যবহার হয়, যদিও লোচন কবি সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলেন নি।

(২) গুর্জরীও লোচনের মতে, গৌরী-সংস্থান তথা ভৈরবমেলের রাগ, সুতরাং এতে ঋষভ ও ধৈবত কোমল বা বিকৃত।

(৩) বসন্তও লোচনের মতে, গৌরী-সংস্থানের রাগ। বসন্ত-সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু লোচনের পূর্বগ-শাস্ত্রীদের মতের সঙ্গে লোচনের মতের মিল নাই। লোচন ও হৃদয়নারায়ণ বসন্তে ঋষভকে বাদ দিয়ে কোমল-ধৈবতের ব্যবহার করেছেন অবরোহণে। প্রাচীন ধ্রুবপদগানে যে শুদ্ধবসন্তের প্রচলন আছে, তাতে পঞ্চম-বর্জিত, এবং ঋষভ-কোমল এবং উভয়-মধ্যমের (ম হ্ম) ব্যবহার।

(৪) রামকিরি বা রামক্রী লোচনের মতে ভৈরবীমেলের রাগ। বর্তমান ভৈরবীমেলের স্বররূপ—সা রি (কোমল) গ (কোমল) ম প ধ (কোমল)। লোচনের অনুবর্তী হৃদয়নারায়ণ রামকিরী-রাগিণীতে কোমল-ধৈবত ও কোমল-ঋষভের ব্যবহার করেছেন।

(৫) কর্ণাট লোচনের মতে, খাম্বাজমেলের অনুরূপ ও ঐ মেলের অন্তর্গত। খাম্বাজ মেলে কোমলনিষাদের, ব্যবহার এবং অন্যান্য স্বর অবিকৃত বা শুদ্ধ। ইতিহাসের পাতায় কর্ণাটের পরবর্তী রূপ হিসাবে আমরা কানড়া-রাগকে পাই। 'সংগীত-রত্নাকর'-গ্রন্থে শার্ঙ্গদেব কর্ণাট বা কানাড়ার পরিবর্তে কর্ণাট-বঙ্গাল-রাগের পরিচয় দিয়েছেন এবং তা পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ বা রাগিণী। পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খ্রীঃ) পৃথকভাবে কর্ণাট বা কানাড়ার নামোল্লেখ করেন নি, তবে 'কুন্নড়'-শব্দ ব্যবহার করেছেন সম্ভবত কর্ণাটকে লক্ষ্য ক'রে। পণ্ডিত পুণ্ডরীকে বিট্‌ঠল সম্রাট

১। তাঁর প্রবন্ধ কয়েক বৎসর পূর্বে 'বিশ্ববাণী'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

আকবরেব সময়কার শাস্ত্রী। তিনি কর্ণাটের নামোল্লেখ ক'রে 'রি-ধ-বর্জিত বা পূর্ণস্থ কর্ণাট ইনাস্তশোভী' বলেছেন। অর্থাৎ তাঁব মতে, কর্ণাট ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔডব বা পাঁচ স্বরের রাগ, আবার সমস্ত স্বরকে নিয়ে সম্পূর্ণ জাতির। পণ্ডিত সোমনাথের রাগবিবোধে (১৬০৯ খ্রীঃ) 'কর্ণাটঃ কর্ণাচগৌড়ঃ' শব্দগুলিব উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তা থেকে কর্ণাট ও কর্ণাটগৌড়কে যেন একই বাগ বলে প্রতীত হয (?); খ্রীষ্টীয ১৭শ শতকে লোচন-কবি 'বাগতরঙ্গিণী'-গ্রন্থে কর্ণাট ও কানডা বা কানাডা শব্দ-দুটি পৃথক্‌ভাবে ব্যবহাব কবেছেন। যেমন,

বাগেশ্বরী কানবশ্চ খম্‌ভাইচী তু বাগিণী।

* * *

কর্ণাটসংস্থিতাবেতে বাগাঃ সন্তীতি নিশ্চিতম্‌॥

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আনুমানিক ১৪শ শতকেব 'পঞ্চমসাবসংহিতা'-গ্রন্থে বাগ মল্লাবেব রাগিণী-রূপে 'কানডা'-র উল্লেখ পাওযা যায। ১৭শ শতকেব দক্ষিণী সংগীতশাস্ত্রী বেঙ্কটমখী চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকায় শ্রীবাগেব জন্যরাগ-রূপে কন্নডগৌল বা কন্নড বা কানাড়াব পরিচয় দিযেছেন। তাছাড়া ভাবভট্টেব 'অনূপসংগীতাংকুশ' ও অনূপসংগীতবত্নাকব' এবং পুরুষোত্তম মিশ্রেব 'সংগীত-নারায়ণ' গ্রন্থগুলিতে 'কর্ণাটী-শব্দেব উল্লেখ দেখি। অহোবলেব 'সংগীত-পবিজাত'-গ্রন্থে কানাড়া আবাব 'কানডী' নামে উল্লিখিত। সেখানে কানডী বা কানাড়া তীব্র-গান্ধারযুক্ত। মোটকথা কর্ণাট ও কানাড়াকে যদি এক ও অভিন্ন রাগরূপে পাই, তবে সংগীতদর্পণকাব দামোদবের মতে, কর্ণাট বা কানাড়া সম্পূর্ণ তথা সাত স্বরেব রাগ এবং নিষাদ বিকৃত বা কোমল। কিন্তু বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির কানডা তথা কর্ণাটবাগে গান্ধাব, ধৈবত ও নিষাদ বিকৃত বা কোমল (জ্ঞ দ ণ)।

(৬) দেশাখ, দেশাখ্য বা দেবশাখ লোচনকবির মতে মেঘ-সংস্থানের রাগ। দেশাখ দেশাখ্য বাগ বা রাগিণীরই ভিন্ন নাম। হনুমন্মতে দেশাখ্য বা দেশাখ হিন্দোলরাগের তৃতীয় রাগিণী। দেশাক্ষী দেবশাখ, দেওশাখ নামেও ভিন্ন ভিন্ন সংগীতগ্রন্থে উল্লিখিত। পার্শ্বদেব 'সংগীতসময়সার'-গ্রন্থে দেশাখ ও দেশাখ্য এই দু'রকম শব্দ ব্যবহার করেছেন। দেশাখ বা দেশাখ্য পার্শ্বদেবের মতে, ঋষভ-বর্জিত ষাড়ব, অর্থাৎ ছ'স্বরের রাগ।

এতে সমস্ত স্বরই শুদ্ধ। সংগীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেব 'দেশাখ্য' নামেরই উল্লেখ করেছেন। 'কলানিধি'-টীকায় কল্লিনাথ দেশাখ্য বা দেশাখকে পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বরাগ বলেছেন। কিন্তু পার্শ্বদেবের মতে, দেশাখ্য ঋষভ-বর্জিত ষাড়ব-রাগ। পণ্ডিত রামামত্যের মতে, দেশাখ বা দেশাখ্য বা দেশাক্ষী আরোহণে সম্পূর্ণ ও অবরোহণে মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত ঔড়বজাতি। পণ্ডিত সোমনাথ দেশাখ বা দেশাক্ষীকে ঔড়ব-সম্পূর্ণ বলেছেন। সুতরাং দেশাখ, দেশাখ্য বা দেশাক্ষীকে নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। বর্তমানে দেশাখ বা দেবশাখ কাফীমেলের ধৈবত-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ। কবি জয়দেবের সময় (১২ শতকের শেষভাগ) দেশাখ বা দেশাখ্য বা দেবশাখ সম্ভবত কল্লিনাথ-সমর্থিত পঞ্চম-বর্জিত ষাড়ব-ষাড়ব-জাতির রাগ ছিল।

(৭) দেশ-বরাড়ী সম্ভবত দেশ ও বরাটী-রাগদুটির সংমিশ্রণে সৃষ্ট। 'বরাড়ী' রাগ বৈরাটী, বিরাটী, বরাটিকা প্রভৃতি নামেও পরিচিত। শার্ঙ্গদেব একে 'বটুকী' নামেও অভিহিত করেছেন : "তজ্জা বরাটিকা সৈব বটুকী ধ-নি -পাধিকা'। ধৈবত, নিষাদ ও পঞ্চম স্বর-তিনটির এতে অধিক ব্যবহার। দেশ, দেশী ও দেশাখ্য ভিন্ন ভিন্ন রাগ। কিন্তু দেশ ও দেশকার সমশ্রেণীভুক্ত বা একই রাগ। দেশ বা দেশকার মোটেই প্রাচীন রাগ নয়, কেননা নান্যদেব মম্মটাচার্য, সোমেশ্বরদেব এবং এমনকি ১৩শ শতকে শার্ঙ্গদেব 'সংগীতরত্নাকর' -গ্রন্থে দেশ ও দেশকার-রাগের কোন পরিচয় দেন নি। পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খ্রীঃ) দেশ বা দেশকারকে 'দেশকৃৎ' তথা 'দেশকৃদ্দেশকারঃ'বলেছেন। তিনি বলেছেন, দেশ বা দেশকার সংপূর্ণজাতির রাগ : "সাংশাদ্যন্তোঽহ্নোঽন্ত-কম্প্রমনির্দেশকৃৎ পূর্ণঃ"। পূর্বেই বলেছি যে, জয়দেব-বর্ণিত দেশ-বড়ারী সম্ভবত দেশ ও বরাটী বা বরাড়ী রাগ-দুটির মিশ্রণে সৃষ্ট। লোচন-কবি ও হৃদয়নারায়ণদেব এ' রাগের কোন পরিচয় দেন নি। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ কবি জয়দেব ১২শ-১৩শ শতকে তাঁর গানের সঙ্গে দেশ-বরাড়ী রাগের সম্পর্ক ঘটিয়েছেন, অথচ ঠিক সেই সময়ে দেশ-বরাড়ী অথবা দেশ-বরাটী নামে নির্দিষ্ট কোন রাগের নাম কোন প্রাচীন সংগীতগ্রন্থে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না ৫ম-৭ম শতকের সংগীতগ্রন্থ মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে, পার্শ্বদেবের সংগীতসময়সারে এবং নাট্যলোচনেও। অথচ পরবর্তীকালে দেশ-বরাড়ীরাগের শিল্পী-অংকিত চিত্র পাওয়া যায়। মনে হয়, দেশ-বরাড়ী

রাগ বা রাগিণী পরবর্তীকালের সৃষ্ট এবং ১২শ শতকের গীতগোবিন্দে তার উল্লেখ ঐতিহাসিকদের মনে একটু সংশয়ের উদ্রেক করে।

(৮) গোণ্ডকিরি—গুণকেলী, গুণ্ডক্রী, গুণক্রী, গুণক্রিয়া, গুণকিরী প্রভৃতি নামে পরিচিত। 'গুণ্ডকী' নামও প্রাচীন গ্রন্থ সংগীতসময়সারে পাওয়া যায়। ১৩শ শতকের গুণী শার্ঙ্গদেব গুণক্রীরাগের পরিচয় দেননি কেন—তা বলা যায় না। পণ্ডিত রামামত্য একে ধৈবত-বর্জিত ষাড়ব-ষাড়বজাতির রাগ বলেছেন। পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল (১৫৯০ খ্রীঃ) একে 'গৌণ্ডকৃতি' বলেছেন এবং তাঁর মতে, ধৈবত-বর্জিত ষাড়ব-ষাড়বজাতিব বাগ গোণ্ডকিবী। কিন্তু ১৭শ শতকের প্রথম পাদের সংগীতশাস্ত্রী পণ্ডিত সোমনাথ তাঁব গ্রন্থে 'গোণ্ডক্রিয়া' তথা গোণ্ডকিরীকে কোমল-ঋষভ ও ধৈবতযুক্ত গান্ধাব ও নিষাদ-বর্জিত ঔডব-জাতির রাগ বলেছেন। গৌরী-সংস্থান বর্তমানে ভৈববমেলেব অনুরূপ এবং ভৈববরাগের জন্যরাগ, সুতবাং প্রাতঃকালে গেয়। গোণ্ডকিরা বা গোণ্ডক্রীর ঋষভ ও ধৈবত কোমল বা বিকৃত।

(৯) ভৈরবী। তখনকার সময়ে ভৈবরীর রূপ ছিল বর্তমানেব কাফী-মেলের অনুরূপ, মুতরাং ভৈববীর রূপ পাই—সা রি গ (কোমল) ম প ধ নি (কোমল)। পণ্ডিত সোমনাথ বলেছেন: "অন্যে তু ভৈববীরাগে ধৈবতং কোমলং বিদুঃ", অর্থাৎ অনেকে ভৈববীতে কোমল-ঋষভ ব্যবহার করেন। বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিব ভৈরবীতে কোমল-ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ ব্যবহৃত হয় (ঋ জ্ঞ দ ণ)। লোচন-কবি ভৈরবীতে কোমল-ধৈবতের ব্যবহারকে অসুন্দর বলেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, লোচনকবি ১৬শ শতকের শেষার্ধেব কিংবা ১৭শ শতকেব প্রথম বা মধ্যম পাদের কবি। সুতবাং ১২শ শতকের শেষপাদের 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের রাগ নিরূপণ যে লোচনের রাগতরঙ্গিণীর মাধ্যমে করণীয় একথা স্বীকার করা সঙ্গত হবে না, কারণ ১২শ শতকের পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাগরূপে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। পণ্ডিত অহোবল প্রভৃতি ভৈরবীতে কোমল-ধৈবতের ব্যবহার বলেছেন: "ভৈরবী স্যাদ্ ধ কোমল"।

'(১০) বরাডী বা বরাটী-সম্বন্ধে আমরা দেশ-বড়ারী প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করেছি। বরাড়ী বা বরাটীর প্রকারভেদ, যেমন সৈন্ধববরাটী, কুন্তলবরাটী, দ্রাবিড়বরাটী, প্রতাপবরাটী, নাগবরাটি, শোকবরাটী প্রভৃতি।

বর্তমান পদ্ধতির বরাড়ী তথা বরাটীতে কোমল-ঋষভ ও কড়ি-মধ্যমের ব্যবহার হয়। শার্ঙ্গদেব ববাড়ীতে কোন কোমল স্বরের উল্লেখ করেন নি, বলেছেন—ধৈবত, নিষাদ ও পঞ্চমের অধিক প্রয়োগ। পণ্ডিত অহোবল বরাড়ীতে কোমল-ঋষভ ও ধৈবতের ব্যবহারের কথাই বলেছেন। লোচন-কবি বরাড়ীর কোন পবিচয় দেন নি।

(১১) বিভাসরাগ লোচনের মতে ভৈরবমেলের অনুরূপ, সুতরাং বিভাসে ঋষভ ও ধৈবত কোমল। বিভাসের রূপ প্রধানত দু'রকম: একটি প্রাতঃ-কালে ও অপরটি রাত্রে গেয়। বিভাসের প্রাচীনরূপেও নিষাদ ও মধ্যম-বর্জিতদেখা যায়।

(১২) মালব বা মালবগৌড়রাগের প্রকাবান্তবে আমবা পরিচয় দিয়েছি। লেখকেব 'রাগ ও রূপ'-গ্রন্থের ১ম ভাগে এই মালববাগ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(দুই)

মেবারেব বাণা কুম্ভা (বা কুম্ভকর্ণ) গীতগোবিন্দেব উপর 'রসিকপ্রিয়া' নামক টীকা রচনা করেছেন—যাতে দেশীরাগগুলির স্বররূপ বা স্বর-সমাবেশের মধ্যে মতঙ্গ, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি নির্দেশিত রাগসজ্জাব বিকাশ থেকে কিছু কিছু পর্থক্য বা প্রভেদ দেখি। গীতগোবিন্দে যে রাগগুলিব উল্লেখ আছে পদগুলি সুরে প্রকাশ করার জন্য, তাদের রূপের প্রার্থক্যেব কথা আলোচনাপ্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখ কবেছি। 'সংগীতরাজ' বাণা কুম্ভার একটি অবিস্মরণীয় অক্ষয় অবদান। ডক্টর কুঞ্জন রাজা 'সংগীতরাজ'-গ্রন্থের স্বরাধ্যায়-মাত্র সম্পাদনা ক'রে বিকানীব থেকে প্রকাশ করেছেন। পরে বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় (Banaras Hindu University) থেকে ডক্টর প্রেমলতা শর্মা 'সংগীতরাজ' বিশেষভাবে সম্পাদনা ক'রে ইংরাজী ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে (প্রথম ভাগ) প্রকাশ করেছেন। সম্পাদিকা ডক্টর প্রেমলতা শর্মা মেবারের রাণা কুম্ভার আবির্ভাব-কাল-সম্পর্কে লিখেছেন :" The date of Kumbhā presents no difficulty. He ascended the throne of Mewār in Chittorgarh in 1433 A. D. after the assassination of his father

Mokal and had a glorious reign of thirty-five years. (vide Sanskrit verse). The above verse : 'শ্রীমদ্বিক্রমকালতঃ পরিগতে নন্দাভ্রভূতক্ষিতা * *' mentions the year in which S. Rāj was completed as V. S. 1509 Saka year 1374 corresfondnig to 1456 A. D. The Kirttistambha inscription which was installed in 1460 A. D. clearly refers to the composition of S. Rāj by Kumbhā"। রাণা কুম্ভার তিরোভাব ঘটে ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। 'সংগীতরাজ'-গ্রন্থে সাঙ্গীতিক উপাদানের ও বিশেষ করে রাগ-রাগিণীদের পরিচয়প্রসঙ্গে রাণা কুম্ভার একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিদগ্ধ সম্পাদিকা সংগীতরাজে আলোচিত ও অনুসৃত ধারা-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "The author's theories and concepts are traditional though he evenices a special partiality for the more ancient authorities, who do not seem to possess the same degree of appeal for contemporary writers" (vide Introduction, p. 151). Traditional বা ঐতিহ্যবাহী ধারাপারম্পর্য-সম্পর্কে তিনি রাণা কুম্ভার নিজের স্বীকারোক্তির উল্লেখ করেছেন। স্বীকারোক্তিটি হোল—

অধ্যাসিতায়া নিজপূর্বপুঙ্‌ভিঃ
পদং সবীসর্তি ন যঃ কদাচিৎ।
বিশুদ্ধিমত্যাঃ সরণে স রাজা
পদং চরীকর্তি বিচারবর্তী ॥

রাণা কুম্ভার যে নিজস্ব একটি স্বাধীন বৃত্তি ও দৃষ্টি ছিল সংগীতমীমাংসার বেলায় গীতগোবিন্দের 'রসিকপ্রিয়া' টীকায় রাগরূপের আলোচনার সময়ে কিছুটা তার উল্লেখ করেছি। এখানে গীতগোবিন্দে রাগরূপের পরিচয়-প্রসঙ্গে খ্রীষ্টীয় ১৭ শতকের প্রথমে বা মধ্যকালে লোচন-কবি-রচিত 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থের মতানুযায়ী যে ভৈরবাদি রাগগুলির (যে রাগগুলি গীতগোবিন্দে উল্লিখিত হয়েছে) স্বররূপের উল্লেখ করেছি, এখানে রাণা কুম্ভা-রচিত 'সংগীতরাজ' থেকে সেই সেই রাগের কতকগুলির পরিচয়ের উল্লেখ করি তুলনামূলক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষণে সেকাল ও একালের রাগগুলির স্বরসমাবেশের পরিচয় লাভ করার জন্য। যেমন গীতগোবিন্দে মালব,

মালবগৌড, গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরী, কর্ণাট, দেশাখ, দেশ-ববাড়ী, গোণ্ডকিরী, ভৈববী, বরাডী ও বিভাস বা বিভাষ এই ১২টি রাগের উল্লেখ পাই। বাণা কুম্ভা সংগীতবাজে বসন্তবাগেব পবিচয় দিযেছেন—

সাংশন্যাসগ্রহঃ পূর্ণো মন্দ্রানিঃ সবম্পিতঃ।
ভূযিষ্ঠরিনিসো দৈনে পশ্চিমে প্রহরে বুধৈঃ ॥১।৭৭
হিন্দোলাঙ্গ বসন্তোঽযং বসন্তে গায়তে শুচৌ।
বিক্রমাঙং দশভুজং ষডাস্যং কোকিলাগতিম ॥১।৭৮

*　　　*　　　*

বা বী বি গা ম নি ধ পা ম গ বী স বী রী
গা মং বি গা ম প স সা স বি গা বিসা বী।
প মং বি সা ম প ধ নী নি স নী ধ পা মং
পা ধা নি ধা বি নি ধ ধা প ধ মা ম
সা বী ॥ ১।৮০

এটি বসন্তবাগেব (স্বব)-কবণ। তাছাড়া আলাপ—সা বী গ সা গ গ বা ম গ মা গ বী সা প্রভৃতি।

কর্ণাটী বা কর্ণাট-বাগ সম্বন্ধে বাণা কুম্ভা বলেছেন—

ধান্তা ষড্জগ্রহন্যাসা তাবণা মন্দ্রমধ্যমা।
সমশেষস্ববা পূর্ণা কর্ণাটী কর্ণবক্তিদা ॥ ১।১১৩
ইমা ভাষাং সমাচষ্ট মতঙ্গাদিবিদাং গণঃ।
বাগাঙ্গমাহ নিঃশঙ্কো গ্রামবাগানুসাবতঃ ॥
কৃষ্ণবস্ত্রা নীলবর্ণা গজেন্দ্রববরাহ না ॥ ১।১১৪

অবশ্য কর্ণাটী-সম্পর্কে বাণা কুম্ভা কর্ণাটীব দ্বিতীয রূপের পরিচয় দিয়েছেন—"গান্ধাবতাবা মৃদুমা ধৈবতাংশগ্রহান্তিমা" প্রভৃতি এবং 'পূর্ণা কর্ণাটী বর্ণিতা' (১·১০৮) বলেছেন।

ভৈববী সম্পর্কে বাণা কুম্ভা সংগীতরাজে বলেছেন—

ভৈরবী-ভৈরবোপাঙ্গং ধ-গ্রহাংশাবসানিকা।
মন্দ্রতাব-গান্ধারা সমশেষস্ববা ভবেৎ ॥১।১৪৮

ধ নী স গ ম ধা নী গ স গ রী ম গ ধ নি ধা।
ধ প মা ধ ধ পা। মা গ ম ধ নী স রি গা নি ধা ॥ ১।১৪৯

মালবরাগ-সম্পর্কে রাণা কুম্ভা বলেছেন—

টক্কৈশিকভবা তু মালবা যা
তদঙ্গমিহ মালবা মতা।
সংগতাবিহ রিপৌ সধৌ তথা
নিগ্রহাংশবিবর্তির্নিযোজিতা ।। ২।৭৯
বাসবান্তিমদলে শুচৌ বসে
বস্তুতে চ করুণে পুবাতনৈঃ।
ধৈবতাংশবিবর্তির্ভয়ানকে
কেশ্চিদেব নিপুণং বিভাষ্যতে ।২।৮০

তেমনি সংগীতবাজে বামকৃতি বা বামক্রী বা বামকিবী-সম্পর্কে বাণা কুম্ভা বলেছেন—

কোলাহলা টক্কভবাত্র ভাষা
পূর্বোদিতা বামকৃতিস্তদঙ্গম্।
সান্তা গ্রহাংশীকৃতমধ্যমা চ
বিবর্জিতা পঞ্চমনিস্বনেন ।। ২।১১৪

রামকৃতি বা বামক্রী বাগ বা বাগিণী হোল—'দোলারূঢা চ গৌরাঙ্গী বীণাদণ্ডবিভূষিতা'। তাছাড়া ক্রিয়াঙ্গরাগ-রূপে পূর্ববামক্রিয়া, রামক্রিয়া, গৌণ্ডকৃতি, দেবকৃতি প্রভৃতির পরিচয়ও দিয়েছেন রাণা কুম্ভা। বামকৃতি (২।১১৪) ও রামক্রিয়া (৩।২) রাগকে পৃথক দৃষ্টিতেই বিচার-বিশ্লেষণ কবেছেন বাণা কুম্ভা। বামক্রিযাব রূপ—

আপঞ্চমং তাবমৃদুপ্রচাবা
সাংশগ্রহান্তা রিসভূরিনাদা।
স্যাদ্বিপ্রলম্ভে করুণে রসে চ
রামক্রিয়া বাসরপশ্চিমার্ধে ।। ৩।৪

মোটকথা রাগতরঙ্গিণীকার লোচন-কবি রাণা কুম্ভাব বহু পরবর্তী গ্রন্থকার বা শাস্ত্রকার। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার-দৃষ্টিতে দেখা যায়, ১২শ-১৩শ শতকের কবি জয়দেবের নির্দেশিত রাগরূপকে ১৫শ শতকের শাস্ত্রকার ও

সংগীতজ্ঞানী রাণা কুম্ভা-রচিত 'সংগীতরাজ'-গ্রন্থে উল্লিখিত রাগগুলির স্বরসমাবেশপদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের বিচার করা উচিত। বর্তমান উত্তর-ভারতীয় রাগরূপের মধ্যে রাণা কুম্ভা-নির্দিষ্ট রাগরূপগুলি ঐক্য-অনৈক্য লক্ষ্য করা যায়।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ গীতগোবিন্দে রাগরূপ ও তার বিকাশ ॥

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, মালব, মালবগৌড, গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরী বা রামক্রী, কর্ণাট, দেশাখ বা দেবশাখ, দেশ-বরাডী, গোণ্ডকিরী, ভৈরবী, বিভাস ও বরাডী বা বরাটী রাগগুলি 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের সঙ্গে সম্পর্কিত। পূজারী গোস্বামী ও অন্যান্য অধিকাংশ টীকা ও ভাষ্যকাররা এই রাগগুলিরই উল্লেখ করেছেন এবং একথাও আলোচনা করেছি যে, রাণা কুম্ভা[১] 'রসিকপ্রিয়া'-টীকায় বহু অন্যান্য রাগের নামোল্লেখ করেছেন। এ' থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, গীতগোবিন্দে রাগসম্পর্কে গুণীসমাজে মতভেদেরও প্রয়োজন হয়েছিল। মূলপদগানে ও রাণা কুম্ভার টীকায় রাগ-সমাবেশের রীতির তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়,

১। (ক) প্রথম অষ্টপদীপ্রসঙ্গে কবি জয়দেব বলেছেন: "মালব-গৌড়রাগেণ রূপকতালেন গীয়তে।"

(খ) পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রাণা কুম্ভা 'রসিকপ্রিয়া'-র সূচনায় (উপোদ্‌ঘাতে) চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন: "নত্বা মতঙ্গভরতপ্রমুখান্ সুগীত-সংগীতশাস্ত্রনিপুণাঞ্জয়দেববাচাম্। শ্রীকুম্ভকর্ণনৃপতির্বিবৃতিং তনোতি গানং নিধায় সরসং রসিকপ্রিয়াহ্বাম্॥" অর্থাৎ রাণা কুম্ভা গীতগোবিন্দের পদ-সম্পর্কিত সংগীত-বিষয়ে আলোচনা করেছেন পূর্বগ বিদগ্ধ সংগীতবিদ্বান্ ভরত, মতঙ্গ প্রভৃতি-রচিত সংগীতশাস্ত্রকে অনুসরণ ক'রে। তাছাড়া রাণা

১। রাণা কুম্ভ নামটি 'রাণা কুম্ভা' নামে পরিচিত—যদিও 'রাণা কুম্ভা বলে অনেকে ব্যবহার করেন।

কুম্ভা ছিলেন যথার্থ অভিজাত সংগীতধবায় বিজ্ঞানী এবং তাঁব রচিত 'স'গীতমীমাংসা ও 'স গীতবাজ' গ্রন্থ-দুটি সেকথা প্রমাণ কবে। টীকায় উপোদঘাতেব উনিশ সংখ্যক শ্লোকেব শেষে তিনি বলেছেন : "গমকালাপ-পেশলতয়া মধ্যমগ্রামে ষাডবেব মধ্যমগ্রহেণ মধ্যমাদিবাগেণ গীয়তে।" প্রথম অষ্টপদীসম্পর্কিত টীকায় বাবো সংখ্যক শ্লোকে তিনি পুনবায় বলেছেন : "* * ধবলোঽযং প্রবন্ধবাট। বাগোঽত্র মধ্যমাদিঃ স্যাদাদিতালো বিলম্বিতঃ॥ লযঃ স্যান্মাগধীবীতিঃ শৃঙ্গাবোঽত্র বসঃ স্মৃতঃ।" সুতবাং এখানে পাই মধ্যমাদি তথা মধুমাধবী বাগেব উল্লেখ। এ' সকল বাগরূপ-সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা কবেছি।

২। (ক) দ্বিতীয় অষ্টপদীসম্পর্কে কবি উল্লেখ কবেছেন : "গুর্জরীবাগা-নিঃসাবতালাভ্যাং গীযতে।

(খ) বাণা কুম্ভা প্রাবম্ভে বলেছেন : "ইদানীং বর্ণ্যমানং শ্রীকৃষ্ণং স্বরূপনিরূপণদ্বাবা মঙ্গলগীতেন স্তৌতি। তত্রেদমাদ্যং পদং ললিতরাগেণ লঘ্বাদিতাল ইতি আদি তালে গীযতে", অর্থাৎ ললিতবাগে ও লঘু-আদিতালে গীত হবে দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

৩। (ক) তৃতীয় অষ্টপদীসম্পর্কে মূলে আছে : "বসন্তবাগ যতিতালাভ্যাং গীযতে।"

(খ) বাণা কুম্ভা এ প্রসঙ্গে টীকাব নবম শ্লোকে বলেছেন : "মধ্যা নায়িকা। গুর্জবীবাগেণ ঋষভাদিনা"—যদিও 'বিপ্রলম্ভাখ্যঃ শৃঙ্গাবো বসঃ'-ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন : "* * বসন্তবাগে ঝম্পাখ্যতালে মধ্যলযাশ্রিতে।' সুতবাং তৃতীয় অষ্টপদী বা প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে গুজবী রাগে ও মধ্যলয়ে গীত হবে তৃতীয় প্রবন্ধ।

৪। (ক) চতুর্থ অষ্টপদীপ্রসঙ্গের মূলে আছে : "রামকবীবাগযতিতা-লাভ্যাং গীয়তে।"

(খ) 'বাজ্ঞা কুম্ভেন তেন' প্রভৃতি বলে বাণা কুম্ভ বাগসম্পর্কে বলেছেন : "যত্র স্যাদ্‌গুর্জবীবাগস্তালো ঝম্পেতি ভাগশঃ * *।"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, চতুর্থ প্রবন্ধের তৃতীয় শ্লোক 'গোপবধূরনু-গায়তি * * পঞ্চমবাগম্'—এই পঞ্চমরাগ-সম্পর্কে পূজারী গোস্বামী অর্থ করেছেন : "* * উন্নীতঃ পঞ্চমস্বরো যত্র তং রাগামনুগায়তি"। রসমঞ্জরী-

ব্যাখ্যায় শংকরমিত্র বলেছেন: "পঞ্চমাখ্যো রাগো যত্র"। রাণা কুম্ভা বলেছেন: "পঞ্চমরাগো যেন বা, * * পঞ্চমস্বরোপলক্ষিতো রাগো যেন বা।"

৫। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে: "গুর্জরীরাগেণ যতিতালেন গীয়তে।"

(খ) রাণা কুম্ভা নবম শ্লোকের ব্যাখার পর 'গণগ্রামং'-পদপ্রসঙ্গে বলেছেন: (১) "ইদানীং রাধা তদেব রহস্যং ভঙ্গ্যন্তরেণাহ—'রাগো ধন্যাসিকো যত্র তালো বর্ণয়তিঃ স্মৃতঃ * *। স চায়ং মধুরিপুরত্নকণ্ঠিকা নাম পঞ্চমঃ প্রবন্ধো ভৈরবরাগেণ গীয়তে গণয়তীতি।" অর্থাৎ পঞ্চম প্রবন্ধ ধন্যাসিক বা ধানসী এবং ভৈরবরাগে ও যতিতালে গেয়।

৬। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে: "মালবগৌডরাগেণ একতালেন চ গীয়তে।"

(খ) রাণা কুম্ভা বলেছেন: "তথা চ সংগীতরাজে—গীতৌ ভৈরবরাগেণ তালে বর্ণযতৌ যথা। আভোগান্তস্থিতৈঃ পাটৈঃ স্বরৈঃ পদ্যাঞ্চিতস্ততঃ॥" অর্থাৎ যষ্ঠ প্রবন্ধ ভৈরবরাগে ও যতিতালে গীত হবে।

৭। (ক) মূলে আছে: "গুর্জরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।"

(খ) বাণা কুম্ভা বলেছেন: "রাগো গৌডাকৃতির্যত্র প্রতিমণ্ঠপুরস্কৃতঃ। আভোগান্তে তথা পাটস্বরৈঃ পদ্যগণাঞ্চিতঃ॥ শৃঙ্গাররসসংপূর্ণ * *।" অর্থাৎ ষষ্ঠ প্রবন্ধ গৌড় বা গৌড়াকৃতি রাগে ও প্রতিমণ্ঠতালে গেয়।

৮। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে: "কর্ণাটরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।"

(খ) এ' প্রসঙ্গে রাণা কুম্ভা বলেছেন—

প্রতিমণ্ঠকতালেন রাগে দেশাক্ষসংজ্ঞিতে।
পদান্ত্যর্ধাক্ষরৈর্যুক্তঃ পদাৎ সংগমতস্তথা॥
আকারোপচিতালাপগমককাকুবিগ্রহঃ।
আভোগান্তেনকৈঃ পাটৈঃ প্রচুরৈরতিপেশনঃ॥

মোটকথা সপ্তম প্রবন্ধ দেশাক বা দেবশাখ-রাগে ও প্রতিমণ্ঠতালে গান করা কর্তব্য।

৯। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে: "দেশাখরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।"

(খ) বাণা কুম্ভা বলেছেন—

মালবশ্রীঃ স্মৃতো বাগস্তালো নিঃসাবসংজ্ঞকঃ।
বাগ্ গেয়কাবনামাঙ্কপদতস্তেন সন্ততিঃ ॥
ততঃ পাটাঃ পদানি স্যুঃ পঞ্চমানি বসোঽত্র যঃ।
শৃঙ্গাবো বাসুদেববস্য ক্রীডনং বাসকাদিভিঃ ॥"

অর্থাৎ অষ্টম প্রবন্ধ মালবশ্রী রাগে ও নিঃসারতালে গেয।

১০। (ক) গীতগোবিন্দেব মূলে আছে : "দেশীবড়ীবাগেণ রূপকতালেন গীযতে।"

(খ) বাণা কুম্ভা বলেছেন : "সংগীতবাজে—

নিঃসাবতালবচিতো বাগে কেদাবসংজ্ঞকে।
কবিনামাঙ্কিতপদাৎ পাটৈঃ স্বল্পতবৈশ্চিতঃ ॥

অর্থাৎ নবম প্রবন্ধ কেদাববাগে নিঃসাবতালে গেয।

১১। (ক) মূলে আছে : "গুর্জবীবাগেণ একাতালীতালেন গীয়তে।"

(খ) বাণা কুম্ভা এ'প্রসঙ্গে বলেছেন : "গীত্যাদি পূর্বোক্তমেব।" 'পূর্ববৎ' বলতে দশম প্রবন্ধ যে কেদাববাগ ও নিঃসাবতালেব প্রযোগ আছে, এখানে সে প্রয়োগই বুঝতে হবে।

১২ (ক) গীতগোবিন্দেব মূলে আছে : "গুণকবীবাগেণ রূপকতালেণ গীযতে।"

(খ) বাণা কুম্ভা বলেছেন : "তথা চ সংগীতবাজে—

মালবীযঃ স্মৃতো গৌড়ো বাগস্তালোঽড্ডতালকঃ।
শৃঙ্গাবো বিপ্রলম্ভাখ্যো বসো দেবাদিবর্ণনম।
পদসন্ততিস্তেনাঃ পাটাঃ স্ববসমুচ্চয়ঃ ॥
তত পদ্যানি যত স্যুর্লমধ্যমমানতঃ।

রাণা কুম্ভার অভিমতে দ্বাদশ প্রবন্ধ মালবরাগে ও অড্ডতালে গেয়।

১৩। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে : "মালবরাগ-যতিতালাভ্যাং গীয়তে।"

(খ) রাণা কুম্ভা বলেছেন : "তথা চ সংগীতরাজে—

রাগঃ স্যাৎ স্থানগৌড়াখ্যস্তালো-বর্ণযতি-রসঃ।
শৃঙ্গারো বিপ্রলম্ভাখ্যঃ প্রমদা মদনাকুলা ॥

অর্থাৎ ত্রয়োদশ প্রবন্ধ স্থানগৌড় তথা গৌড়রাগে এবং যতিতালে গীত হবে।

১৪ (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে : "বসন্তরাগ-যতিতালাভ্যাং গীয়তে

(খ) রাণা কুম্ভা বলেছেন : "তথাত্র সংগীতরাজে—
শ্রীরাগো যত্র রাগঃ স্যাত্তালস্তু দ্রুতমণ্ঠকঃ।
বর্ণনং বাসুদেবস্য হরিস্তদ্ব্যত্যয়ে স্ত্রিয়াঃ॥
পদেভ্যঃ পাটসন্তানং স্বরাস্তেনাস্তথৈব চ।

অর্থাৎ চতুর্দশ প্রবন্ধে শ্রীরাগ ও দ্রুত মণ্ঠকতালের ব্যবহার হবে।

১৫। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে : "গুর্জরীরাগৈকতালীতালেন গায়তে।"

(খ) রাণা কুম্ভা বলেছেন : "তথা চ সংগাতবাজে—
দ্রুতমণ্ঠেন তালেন দ্রুতেনৈব লয়েন চ।
মহ্লারে রসরাজে স্যাৎ পদানাং সংততে পুনঃ॥
স্বরগ্রামস্তথা পাটাস্তেনা অপি যথাক্রমম্।"

অর্থাৎ পঞ্চদশ প্রবন্ধ মহ্লার বা মল্লাররাগে ও দ্রুতমণ্ঠতালে গীত হবে।

১৬। (ক) মূলে আছে : "দেশবরাডীরাগেণ রূপকতালেন গীয়তে।"

(খ) রাণা কুম্ভা বলেছেন—
"তথা চ সংগাতরাজে—
রাগো বরাটিকা যত্র তালো বর্ণ-যতিস্তথা।
পদানি স্বেচ্ছয়ালাপ ভূষিতানি যথাদ্যুতি॥
ততঃ স্বরাশ্চ পাটাশ্চ ততঃ পদ্যানি কানিচিৎ।"

অর্থাৎ ষোড়শ প্রবন্ধ বরাটিকা বা বরাটি রাগে ও যতিতালে গেয়।

১৭। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে : "ভৈরবীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।"

(খ) রাণা কুম্ভা বলেছেন : "তথা চ সংগীতরাজে—
তালো বর্ণযতির্মেঘরাগো দেবাদিবর্ণনম্।
বিপ্রলম্ভাখ্যশৃঙ্গারো রসঃ করুণবেদনম্।
কবিনামাঙ্কিতপদপ্রান্তে পাটস্বরাবলিঃ॥"

অর্থাৎ সপ্তদশ মেঘরাগে ও যতিতালে গীত হবে।

১৮। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে : "গুর্জরীরাগ-যতিতালাভ্যাং গীয়তে।"

(খ) রাণা কুম্ভা বলেছেন : "তথা চ সংগীতরাজে—
নট্টরাগস্তৃতীয়াখ্যস্তালো মধ্যে ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
পদানাং শোভয়ালাপগুম্ফানাং নানাহেতুকম ॥
অন্তে পাটাঃ স্বরান্তেনান্তদন্তে পদগুম্ফনম।'

অর্থাৎ অষ্টাদশ প্রবন্ধ নটরাগে ও তৃতীয় তালে বা ত্রিতালে গীত হয় (বা কখনো কখনো গীত হয়)।

১৯। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে : "দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালী-গীয়তে।"

(খ) রাণা কুম্ভা বলেছেন : "তথা চ সংগীতরাজে—

তালো বর্ণযতী রাগাঃক্রমাদষ্টাদশ স্মৃতাঃ।
মধ্যমাদিশ্চ ললিতো বসন্তো গুর্জরী তথা ॥
ধনাশ্রী ভৈরবী গৌণ্ডকৃতিদেশাখ্যিতাপি চ।
মালবশ্রীশ্চ কেদার মালবীযাদিগৌণ্ডকৌ ॥
স্থানগৌণ্ডশ্চ শ্রীরাগো মহ্লারশ্চ বরাটিকা।
মেঘরাগশ্চ ভদ্রারদযোবনীনিয়তা ইমে ॥
যাবদ্রাগং পদানি স্যুঃ প্রান্তে পাটস্বরাণি তু।
ক্বচিৎক্বচিদগতালাপভূষিতাণি যথারুচি ॥
*　　　　*　　　　*
যত্র স্যাৎ স প্রবন্ধোঽয়ং রাগরাজি-বিরাজিতঃ ॥

এই উনবিংশ প্রবন্ধটি গীতিরূপে প্রকাশ করায় বৈচিত্র্য আছে। এতে যতিতালে এবং মধ্যমাদি বা মধুমাধবী, ললিত, বসন্ত, গুর্জরী, ধনাশ্রী, ভৈরবী, গৌণ্ডকৃতি, দেশাখ বা দেবশাখ, মালবশ্রী, কেদার, মালব, গৌণ্ডকী, স্থানগৌণ্ড বা স্থানগৌড, শ্রীরাগ, মহ্লার বা মল্লার, বরাটিকা বা বরাটী, মেঘ এই আঠারোটি রাগের সমাবেশ দিয়ে গান করতে হয়। শ্লোক বা পদসংখ্যা ১৬ কিম্বা ১৭, কিন্তু ১৮টি রাগের বিকাশ থাকে এই প্রবন্ধে। মোটকথা রাণা কুম্ভার মতে, ১৯শ সংখ্যক প্রবন্ধটি রাগমালা দিয়ে গান করতে হয়।

২০। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে: "বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।"

(খ) রাণা কুম্ভা বলেছেন: "তথা চ সংগীতরাজে—
আদিতালঃ প্রথমতঃ প্রতিমণ্ঠস্ততঃ পরম্।
চতুর্মাত্রাহ্বমণ্ঠশ্চ তুর্যঃ স্যাদড্ডতালকঃ॥
তালো বর্ণ-যতিঃ পশ্চান্নবমাত্রিকমণ্ঠকঃ।
নিঃসারশ্চ তথা ঝম্পা দ্রুতমণ্ঠশ্চ রূপকঃ॥
প্রতিতালস্ত্রিপুটক একতালীতি সংজ্ঞয়া।
ত্রয়োদশ ক্রমাত্তালাঃ প্রতিতালং পদানি চ
* * *
প্রতিতালং প্রয়োগোঽপি রাগো নন্দো নিগদ্যতে॥

অর্থাৎ বিংশ সংখ্যক প্রবন্ধে ১৩টি পদের সমাবেশ আছে, সুতরাং নন্দরাগে এবং ১৩টি তালে ১৩টি পদ গান করতে হবে। ১৩টি তাল—আদি, প্রতিমণ্ঠ ৪ মাত্রাবিশিষ্ট মণ্ঠ, অড্ড, যদি, ৯ মাত্রাবিশিষ্ট মণ্ঠ বা মণ্ঠক, নিঃসার, ঝম্প দ্রুতমণ্ঠ, রূপক, প্রতি ত্রিপুটক বা ত্রিপুট ও একতালী। এতগুলি তালের সমাবেশ থাকার জন্য হরিপ্রেমিক রাণা কুম্ভা এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন 'শ্রীহরিতালরাজিজলধরবিলসিতঃ'। অন্যান্য টীকাকারগণ নাম দিয়েছেন 'সানন্দ-গোবিন্দ' প্রবন্ধ। এতে পটহ, মুরজ, করট, শৃঙ্গ, শঙ্খ, ডমরু, ঢক্কা, কাহলী, মর্দল, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যের সহযোগ থাকবে।

২১। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে: "বরাড়ীরাগ-রূপকতালাভ্যাং গীয়তে।"

(খ) রাণা কুম্ভা একবিংশ ও দ্বাবিংশ প্রবন্ধের রাগ ও তাল বর্ণনা একসঙ্গে করেছেন, কারণ বরাডীরাগের সমাবেশ উভয় প্রবন্ধেরই আছে। তবে দ্বাবিংশ প্রবন্ধের তাল যতি।

২২। (ক) মূলে আছে: "বরাড়ীরাগ-যতিতালাভ্যাং গীয়তে।"

(খ) রাণা কুম্ভা (একবিংশ ও দ্বাবিংশ এই উভয়-প্রবন্ধ সম্বন্ধে) বলেছেন:

ক্রমেণ নট্টকেদারশ্রীরাগস্থানগৌড়কাঃ।
ঘোরণী মালবীয়শ্চ বরাটী মেঘরাগকঃ॥

মালবশ্রীর্দেবশাখো গৌণ্ডকৃচ্চাথ ভৈরবী।
ধন্নাসিকা বসন্তশ্চ গুর্জরী চ মহ্লারকঃ॥
ললিতঃ সপ্তদশমো বাগাস্তাবন্তি চ ক্রবাৎ।
পদানি যেষু তালাঃ স্যুরিতস্তন্নাম কীর্ত্যতে॥
আদ্যত্রিসপ্তদশমদ্বাদশে দ্রুতমণ্ঠকাঃ।
দ্বিতীয়ে নবমে চৈকাদশে চৈব ত্রয়োদশে॥
পদে পঞ্চদশে সপ্তদশে রূপক ইবিতঃ।
চতুর্থে প্রতিপালব্যা দ্রুততালঃ পঞ্চাম স্মৃতঃ॥
ত্রিপুট ষষ্ঠাষ্টময়োঃ স্যাদ্রুতপ্রতিমণ্ঠকঃ।
চতুর্দশে ষোডশে চ ভদ্রঃ স্যাৎপ্রতিতালকম্॥
মধ্যমাদৌ পুনর্মুক্তিঃ শৃঙ্গাবঃ সাভিলাষয়োঃ।

* * *

স রাগশ্রেণীনামায়ং প্রীতিকৃৎ কমলাপতেঃ॥

এই প্রবন্ধ-দুটিতেও বাগমালাব সমাবেশ আছে। নট, কেদার, শ্রী, স্থানগৌড, ঘেবণী (?), মালব বা মালবী, বরাটী, মেঘ, মালবশ্রী, দেবশাখ, গৌডকৃতি, ভৈববী, ধন্নাসিকা বা ধনাসি বা ধানসি, বসন্ত, গুর্জরী, মহ্লার বা মল্লাব ও ললিত—এই ১৭টি রাগ। ১ম, ৩য়, ৭ম, ১০ম, ও ১৮শ পদে দ্রুতমণ্ঠক; ২য়, ৯ম, ১১শ, ১৩শ, ১৫শ, ১৭শ পদে রূপক ৪র্থ ও ৫ম পদে প্রতিতাল, ৬ষ্ঠ পদে ত্রিপুট ও ৮ম পদে দ্রুতমণ্ঠ। ১৪শ ও ১৬শ পদে প্রতি-তাতেব ব্যবহাব হবে।

২৩। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছেঃ “বিভাসবাগৈকতালী-তালাভ্যাং গীয়তে।”

(খ) বাণা কুম্ভা বলেছেন—

পদানাং দশকং যত্র তালে বর্ণ-যতৌ ভবেৎ।
ধ্রুবঃ প্রতিপদং গেয়ঃ কবিনামাঙ্কিতাৎ পদাৎ॥
গীতালাপান্ যথাশব্দং প্রতিতালে ততঃপবম্।
পাটাস্তেনাঃ স্ববাশ্চৈব শৃঙ্গাবো রস-উত্তমু॥
দেবাশাখাভিধৌ বাগঃ প্রবন্ধে সংপদৃশ্যতে।

দেবশাখে বা দেশাক রাগে ত্রয়স্ত্রিংশ প্রবন্ধ গান করতে হবে। পদের দশক

যতিতালের থাকবে। পুনরায় 'দোভ্যা সংযমিতঃ পয়োধরভরেণাপীডিতম্' প্রভৃতি পদ-প্রসঙ্গে রাণা কুম্ভা বলেছেন—

বিজয়ানন্দতালেন গৌডীরাগে বিরচ্যতে।
পদ্যং পাটাঃ স্বরান্তেনা লীলা নায়কসংভবাঃ।

*　　　*　　　*

রাগে কর্পটবঙ্গালে স পৌরুষরসাৎপবঃ॥"

সেভাবে 'তস্যাঃপাটালাপনিজাঙ্কিতমুরো' প্রভৃতি চতুর্থ পদটি মরুকৃতি-(মারু) রাগে ও যতিতালে গান করতে হবে—

যতিতালেন তালেন পদ্যং পাটস্বরাস্তথা।

*　　　*　　　*

রাগো মরুতকৃতির্যত্র দ প্রবন্ধে নিগদ্যতে॥

২৪। (ক) গীততগোবিন্দের মূলে আছে: "বামকরীরাগষতিতালাভ্যাং গীয়তে।"

(খ) রাণা কুম্ভা বলেছেন—

আদিতালস্তথা পঞ্চ হরবক্ত্রসমুদ্ভবাঃ।
প্রতিমণ্ঠশ্চতুর্মাত্রো মণ্ঠশ্চৈবাড্ডতালকঃ॥
তালো বর্ণযতিশ্চৈব জয়মঙ্গলসংজ্ঞিতঃ।
বিজয়ানন্দনামা চ জয়শ্রীসংজ্ঞকঃ পরঃ॥
প্রতিতালং পদানি স্যুঃ পাটাস্তদুভয়ং তথা;
মধ্যে মধ্যে যথাশোভালপ্তিযুক্তির্বিশেষবৎ॥
বিশেষতো বর্ণযতৌ যদা শ্রীসংজ্ঞিকোঽপি চ।
তেনকাঃ স্যুঃ পদস্থানে প্রতিতালেন বেশ্যতে॥
মুক্তিপাদাক্ষরৈর্যুক্তৈরালাপেন পুরস্কৃতৈঃ।
পদান্যেবং ষোডশ বৈ তালা একোনবিংতিঃ।
গৌডঃ স্যাদ্দেশতালাদিরাগঃ সর্বপদাশ্রয়ঃ॥

অর্থাৎ আদি, প্রতিমণ্ঠ (৪ মাত্রাবিশিষ্ট), মণ্ঠ, অড্ড, যতি, জয়মঙ্গল, বিজয়ানন্দ ও জয়শ্রী প্রভৃতি তালের এবং গৌড়রাগের সমাবেশ থাকবে চতুর্বিংশ প্রবন্ধে।

এভাবে রাণা কুম্ভা 'গীতগোবিন্দ'-পদগানে রাগ, তাল এবং রাগমালা ও

তালশ্রেণীব সমাবেশ ঘটিয়েছেন নূতন ভাবে। মনে হয়, বাণা কুম্ভাব সময়ে (১৫শ শতক) গীতগোবিন্দে নূতন বাগ-সমাবেশেব প্রয়োজন হয়েছিল তদানীন্তন রুচি ও ধাবা অনুযাযী। ভাবতেব ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে গীতগোবিন্দ-গানে বাগপ্রকাশে ও গায়কীপদ্ধতিতে অনেক বকম মতভেদ দেখা যায়। যেমন বাঙলাদেশেব গীতবীতিব ও মহাবাষ্ট্রের কিংবা দক্ষিণ-ভাবতেব—বিশেষ ক'বে তাঞ্জোবেব গীতিপদ্ধতিব মধ্যে অনেকাংশে মিল নাই। মনে হয়, ১২শ শতবেব শেষার্ধে কবি জয়দেব ও জয়দেব-অনুসাবীবা গীতগোবিন্দপদ যেভাবে গান কবতেন বাগেব যে প্রকাশভঙ্গীকে অনুসবণ ক'রে, পববর্তী-কালে সে ধাবা বা পদ্ধতি নানান্ কাব ণ লুপ্ত হয়ে যায়।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ গীতগোবিন্দে রাগ ও তালের সমাবেশ ॥

'গীতগোবিন্দ'-পদগানে বাণা কুম্ভা যেভাবে বাগ ও তালেব সমাবেশ কবেছেন পূর্বে সে' বিষযে আলোচনা কবেছি। গীতিধাবাব পবিবর্তন সাধাবণত সমাজ ও শিল্পীব রুচিকে অপেক্ষা কিংবা অনুসবণ কবেই হয। বাণা কুম্ভা বিশেষভাবে তাঁব 'সংগীতবাজ'-গ্রন্থকে অনুসরণ কবেছেন গীতগোবিন্দে রাগ-বিশ্লেষণেব ক্ষেত্রে। পূজাবী গোস্বামী-প্রমুখ অধিকাংশ টীকা ও ভাষ্যকাররা মূলবীতিকেই অনুসবণ ক'বে গীতগোবিন্দে বাগনামেব পবিচয় দিয়েছেন। রাগগুলিব নাম—মালব, মালব-গৌড, গুর্জর বা গুর্জরী, বসন্ত, বামকিবী, বাগগুলি হোল গোণ্ডকিবী, ভৈববী, বিভাস ও ববাডী প্রভৃতি।[১] গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত রাণা কুম্ভাব বাগগুলিব নাম—মধ্যমাদি বা মধুমাধবী, গুর্জরী, ললিত, বসন্ত রামকিবী, পঞ্চম, ধন্যাসিক বা ধানসী, মালবগৌড, ভৈবব, গৌডকৃতি[২], দেশাক বা দেবশাখ, মালবশ্রী, কেদাব, মালব, স্থানগৌড,

১। এ' প্রসঙ্গ পূর্বে কবেছি।

২। পাশ্বদেব (৭ম-১১শ শতক) 'সংগীতসমযসাব'-গ্রন্থে গুণ্ডকৃতি ছাড়া গুণ্ডকীবাগের স্ববরূপের পবিচয দিযেছেন। প্রকৃতপক্ষে গুণ্ডকৃতি বা গুণ্ডক্রী গুণক্রী নামেবই পবিচায়ক (ক্রী = কৃতি)। গুণ্ডকৃতি বা গুণ্ডক্রী শৃঙ্গাব ও হাস্যবসে প্রযুক্ত। গুণ্ডকৃতিব পরিচয—'প-মন্দ্রা হাস্য-শৃঙ্গাবে গেযা গুণ্ডকৃতির্ভবেৎ',—অর্থাৎ মন্দ্র-পঞ্চম পর্যন্ত গুণ্ডক্রীব বিস্তাব। গুণ্ডকৃতি—গুণ্ডাকৃতি, গুণ্ডক্রী, গুণ্ডক্রিযা, গুণকিরী বা গুণকবী প্রভৃতি নামেও প্রচলিত। 'মানসোল্লাস'-গ্রন্থে সোমেশ্ববদেব এর নাম 'গুণকিরী (গুণকবী, গুণকিবী, গুণকৃতি, গুণক্রী) দিযেছেন। এ' সম্বন্ধে লেখকেব 'বাগ ও রূপ' (১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্কবণ, পৃঃ ২৫৫) দ্রষ্টব্য। যাহোক রাণা কুম্ভ-উল্লিখিত সকল বাগের নাম-সার্থকতা ও স্বররূপের বিস্তৃত পরিচয দেওযা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে।

শ্রীরাগ, মহ্লার, বরাটি, মেঘ, নট, গৌণ্ডকৃতি বা গৌণ্ডক্রী বা গৌণ্ডকী, নন্দ, শ্রী, ভৈরবী, কর্ণাটবঙ্গাল, মরুকৃতি বা মারবিকা (মারু), রামক্রী বা রামকিরী প্রভৃতি, আর তালগুগির নাম—আদি, নিঃসার, যতি, লঘু-আদি, ঝম্প, একতালী, প্রতিমণ্ঠ, অড্ড, দ্রুতমণ্ঠ, তৃতীয়তাল বা ত্রিতাল, রূপক, প্রতি, ত্রিপুটক বা ত্রিপুট, জয়শ্রী, জয়মঙ্গল, বিজয়ানন্দ প্রভৃতি। সুতরাং প্রচলিত মূলরাগ ছাড়া রাণা কুম্ভা আরো অনেক অধিক সংখ্যক রাগ ও তালের সমাবেশ করেছেন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'রসিকপ্রিয়া'-টীকায়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে মেবাররাজ কুম্ভার রাগ ও তালের পরিবর্তন-সম্পর্কে দক্ষিণ-ভারতের বিদগ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ কৃষ্ণমাচারিয়াবের অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গীতগোবিন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর *History of Classical Sanskrit Literature* (১৯৩৭)-গ্রন্থে[৩] লিখেছেন :

"The melody, for instance, of the first *Astapadi*, the notes of which are C, D-flat, E, F, G, A-flat and B as the keynote.

"In the Hindu, dated 16. 11. 1927, P. R. Sundara Ayer, Head Master, Training School, Trichinopoly, writes : "There has been some doubts among musicians here about the authenticity of the *Rāgas*, assigned to each *Astapadi*. Let us examine the *Rāga's* of *Astapadi* as per Kumbhā. The *Rāga*, assigned to first *Astapadi* as per heading, is *Mālava*. Kumbhā clearly states that he is making a change and signs the first *Astapadi* in *Madhyamādi* (*Shādava*) in *Madhyama-grāma* He states as his reason that the thought, that is conveyed, has to be adjusted and expressed in that *Rāga* alone. He says :

প্রতজ্ঞায়ি প্রবন্ধো যো জয়দেবেন ধীমতা।
ন তস্য বিদ্যতে লক্ষ্ম সর্বাঙ্গৈরুপলাক্ষতম্।
অতঃ স্বরাদিভিঃ ষড্‌ভিরঙ্গৈঃ সংযোজ্য তথ্যতাম্।
নীত্বা গীত্বা তদা হিত্বা কুটীকাসু (-স্তু) প্রবর্ত্যতে॥

which means : 'The composition was made by Jayadeva and

৩। ঐ গ্রন্থের ৩৪০ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

it is musically imperfect in so many ways. I shall, therefore, provide it with the *Svaras* and the other limbs of music and give it its true colour etc. So Kumbhā, a musician himself, of course an expert musician of the northern side—clearly means that the music of Jayadeva in the original was bad, and he was constrained to effect a change in the melody as evidenced by the further statement in the preface—'গমকালাপপেশলতয়া মধ্যম-গ্রামে যাড়বেন মধ্যমগ্রহেণ মধ্যমাদিরাগেন গীয়তে'। As it is provided with flourishes and is fit for sweet singing *Rāga*, it has to be sung in *Madhyamādi*—a *Sādava-Rāga* (six note *Rāga*) of the *Madhyama-grāma*.

"It has to be noted that Kumbhā of Mewar, a musician-king as he was, had the necessity to change the original tunes of Jayadeva even as early as the 14th centry.[4] Perhaps or more than that, the very reason, assigned by Kumbhā, the Southern musicians have adjusted the *Astapadi* to the South Indian *Rāgas* now current. By the way, there is in South India a system in which particular *Rāgas* are assigned to particular ideas for the expression of the lover in particular stages. Take the *Nāyaki* in sixteenth *Astapadi—Punnagavarāli* has been specially selected for the expression of the same stage of the same sentiment by the musicians of the South like Kshetrajna" (*Italics ours*).

ক্রমবিবর্তনশীল সমাজে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে উত্তর- ও দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতধারায় বহুবারই পরিবর্তন এসেছে। বাঙলাদেশে স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রেরণায় তদানীন্তনকালের বিদগ্ধ গীতশিল্পী ও সংগীতশাস্ত্রী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীও 'গীতগোবিন্দ'-পদগানে নূতন নূতন রাগ যোজনা করেছিলেন এবং

৪। প্রকৃতপক্ষে এটি খ্রীষ্টীয় ১৫শ কিংবা ১৬শ শতকের মাঝামাঝি হওয়া উচিত।

তাতে মালবকৌশিকাদি রাগের সমাবেশ পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী-রচিত 'গীতগোবিন্দগান-স্বরলিপি' গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও বর্তমানে তা দুষ্প্রাপ্য। গোস্বামীজী গীতগোবিন্দে বাগ ব্যতীত নূতন নূতন তালেরও সমাবেশ কবেছিলেন। তাছাড়া বিষ্ণুদিগম্বরের জনৈক সংগীতশিষ্য মারাঠী-ভাষায় 'গাতগোবিন্দ-স্বরলিপি' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

সুতরাং রুচির প্রযোজনে 'গীতগোবিন্দ'-পদগানে রাগ ও তাল নূতনভাবে যে সংযোজিত কোনদিন হয় নি একথা ঠিক নয়। তাছাড়া একথা সকলেই জানেন যে, প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রীয় বাগ ও তাল যেভাবে গীত ও তাদেব প্রয়োগ কবা হোত, অষ্টাদশ শতকেব শেষভাগে কিংবা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে তাদের প্রকাশ ও প্রয়োগরীতিব যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল এবং বর্তমানে সেই পরিবর্তিত ধাবাবই অনুসরণ ক'রে আসছেন সংগীতেব যন্ত্র ও কণ্ঠ-শিল্পীরা। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, প্রধান থাটরূপের পরিবর্তন হওয়ায় (প্রাচীন মুখারী বা কাফীপ্রায় থাটের বিবর্তিত রূপ বিলাবল-থাট) বর্তমান রাগরূপেও পরিবর্তন এসেছে। যেমন, প্রাচীন গৌরী-সংস্থান বা গৌবী-থাটের বর্তমান রূপ ভৈরব-থাট (হিন্দুস্তানী) বা মায়ামালবগৌড় কিংবা মায়ামালবগৌল (দক্ষিণী)। প্রাচীন কর্ণাট-থাট বর্তমানে খাম্বাজ-থাট, দেশাখ বা দেবশাখ বর্তমানে বৃন্দাবনাসারঙ্গেব অনুরূপ প্রভৃতি। কিন্তু এখানে 'tradition' বা ঐতিহ্যবাহী ধারার একটি প্রশ্ন আছে। বৈজু বাওরা, নায়ক গোপাল, স্বামী হরিদাস, মিঞা তানসেন প্রভৃতি সংগীত-সাধকরা মধ্যযুগে যে যে প্রবন্ধগান যে যে বাগে রচনা করেছিলেন, কথিত যে, কিছু কিছু বিকৃত হলেও গুরু-শিষ্যপরম্পরায় সেই সেই গান সেই সেই রাগে আজও অনুশীলিত হয়ে আসছে। সংগাতশিক্ষার ক্ষেত্রে গায়কীধারার (style) অনুবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক।

সুতরাং রাগরূপের প্রকাশে বা প্রতিফলনে কিছু কিছু বিকৃতি আসা অনিবার্য হলেও মোটামুটিভাবে বাঙলার বিদগ্ধ কীর্তনীয়াসমাজ যদি ঐতিহ্যবাহী গুরুশিষ্যপারম্পর্য রক্ষা ক'রে থাকেন, তবে রুচি অনুসারে কিংবা প্রয়োজনবোধে রাগরূপে পরিবর্তন সৃষ্টি করা কতটুকু সমীচীন তা ভেবে দেখার বিষয়। একথাও আবার ইতিহাসের দিক থেকে সত্য যে, প্রাচীন থাটে, রাগরূপে ও গীতিরীতি বা গায়কীপদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে প্রাচীনের চেয়ে নূতন বা বর্তমান হিন্দুস্তানী ও কর্ণাটকী-

পদ্ধতিতে। সুতরাং ইতিহাসের দৃষ্টি ও মান উভয় ক্ষেত্রেই গৃহীত ও সমাদৃত। ইতিহাস পুরাতনের অনুবর্তন করার ক্ষেত্রে যেমন প্রেরণা দান করে, তেমনি অপরিহার্য প্রাকৃতিক বিবর্তনরীতি অনুসরণ ক'রে নূতনের সংযোজন ও প্রতিফলনের ক্ষেত্রেও প্রেরণা দান করে। সুতরাং প্রাচীন ও নবীন এই কোন্ রীতির অনুসরণ গীতগোবিন্দ-পদগানে ও তদনুসারী পদাবলী-কীর্তনে সমীচীন তা নিয়ে নির্দিষ্ট আলোচনা আজো-পর্যন্ত ভারতের গীতশিল্পী ও সংগীতশাস্ত্রীরা বিশেষভাবে করেন নি। কাজেই গীতগোবিন্দ ও কীর্তনপদাবলী গীত হয়ে আসছে এখনো-পর্যন্ত নূতন নূতন রাগে ও তালে নিজ নিজ পদ্ধতি, দেশীয় রুচি, সম্প্রদায় ও গুরুশিষ্যবাহী শিক্ষার প্রমাণের কিংবা ইঙ্গিতের অনুপাতে। বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, কবি জয়দেবের পরই (১) বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তনে গুর্জরী, সৌবী (সৌরাষ্ট্রী ?), দেশাগ-দেশাক-দেবশাক, দেশবরাড়ী, ভাটিআলী, মারহাঠা বা মারহাটি, কেদার, ধানুষী বা ধানসী, কোড়া, পাহাড়ীয়া বা পাহাড়ী, বেলাবলী, মল্লার, বসন্ত, মালবশ্রী, শ্রীরাগ প্রভৃতি রাগের ব্যবহাব করেছেন। তারও পূর্বে (২) রায় বামানন্দের পদগানে দেখা যায়, নাটিকা, তুড়ী (তোড়ী) প্রভৃতি বাগেব ; (৩) মুবারী গুপ্তের পদে পটমঞ্জরী, কামোদ, তথা (?), সুহই বা সুহা (৪) বাসুদেব ঘোষেব পদে বরাড়ী, জয়জয়ন্তী, ভূপালী, গান্ধার, মায়ুর ; (৫) রূপ গোস্বামীর পদে গৌরী, গান্ধার প্রভৃতি এবং (৬) অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতির 'ভক্তিরত্নাকর', 'সংগীতসারসংগ্রহ', 'গীতচন্দ্রোদয়', 'পদামৃতসমুদ্র' প্রভৃতি গ্রন্থেব পদগানে মঙ্গল, সিন্ধুড়া, নট, খাম্বাব্‌তী, সাঙ্গ (সারঙ্গ), কানর (কানাড়া), তিরোথা-ধানসী, পঠমঞ্জরী বা পটমঞ্জরী প্রভৃতি রাগ এবং তাল হিসাবে মঠক, কন্দর্প, একতালি, জয়মঙ্গল, প্রতিমঠক, দশকোষী, রূপক-মঠক, পট, মধুর, বিজয়ানন্দ, মঠ বা উৎসাহ, নন্দন (নন্দরাগের নাম করেছেন রাণা কুম্ভা), সম, ধ্রুব, বৃহদেকতালী প্রভৃতি। এ' সকল রাগ ও তালের রূপ ও প্রকাশ-সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করবো পরে পদাবলীকীর্তন-প্রসঙ্গে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিদগ্ধ মহাজন বা পদকর্তারাও কালের প্রবাহে নূতন নূতন রাগ ও নূতন নূতন তালের সমাবেশ করেছেন তাঁদের বিভিন্ন রচনায়। কিন্তু পুরাতন ও নূতন রাগ-সম্পর্কে একটি কথা এই যে,

রচয়িতা ও শিল্পীরা রাগগুলির রূপপ্রকাশে প্রাচীন ধারারই অনুসরণ করেছেন সর্বতোভাবে। সামাজিক দৃষ্টি ও মানসিক রুচির মান ও রহস্য তাঁদের কাছে অবিদিত ছিল না, অথচ কীর্তনের সুর বা রাগপ্রয়োগনৈপুণ্যে তাঁরা প্রাচীন রীতিরই অনুসারী। তাই এ'প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বাঙলার বিদগ্ধ কীর্তনিয়াসমাজ চিরদিনই ছিলেন এবং এখনো আছেন ঐতিহ্যবাহী গুরুশিষ্যপরম্পরার অনুরাগী এবং সেই প্রাচীন ধারার উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিয়েই তাঁরা অনুশীলন ও পরিবেশন করেন পদাবলীকীর্তন।

'গীতগোবিন্দ-'পদগানসম্পর্কে প্রবাদ যে, পুরীতে জগন্নাথ-মন্দিরে গীতগোবিন্দের গীতরীতিই নাকি স্মরণ করিয়ে দেয় আজো-পর্যন্ত বিশুদ্ধ পদ্ধতির কথা। কিন্তু যতটুকু অনুশীলন করার সে সম্বন্ধে সুযোগ পেয়েছি, তাতে প্রবাদাশ্রয়ী প্রামাণিকতা স্বীকার্য নয় বলেই মনে করি। হয়তো একথা ইতিহাসের দিক থেকে সত্য যে: "The poem was held in much esteem in Orissa. It was orderd to be sung in temples by King Prataparudradeva and King Purusottamadeva (1470-1497 A.D.) the composed *Abhinava Gitagovinda*"।[৫] কিন্তু পুরীর বর্তমান গীতরীতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রবাদ-প্রামাণিকতারই সাক্ষ্য বহন করে। দক্ষিণ-ভারতের তাঞ্জোরীয় গীতিপদ্ধতির পক্ষেও ঠিক এই এক কথাই বলা যায়, কেননা তাঞ্জোরে গীতগোবিন্দ-পদগান যেভাবে গান করা হয়, তা অনেক বিশেষজ্ঞের মতে সঠিক ও প্রাচীন গীতরীতির ধারক। কিন্তু মনে হয়, তাও বিশেষ পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত। বাঙলাদেশে কীর্তনীয়াসম্প্রদায়ও যেভাবে ও যে ধারায় বর্তমানে গীতগোবিন্দের পদগান পরিবেশন করেন তাও যথাযথ কিনা অনুসন্ধানের বিষয়।

৫। *vide. History of Classical Sanskrit Literature* (1967), p. 339.



চতুর্দশ পবিচ্ছেদ

॥ গীতগোবিন্দ ও পদাবলীকীর্তনে নায়ক-নায়িকা ॥

বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনে নায়ক-নায়িকাভেদ, তাব রসবিকাশ ও ভাবতত্ত্বই প্রধান। তাছাড়া অপার্থিব বাধাকৃষ্ণলীলাতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবাধাব বিচিত্র লীলাকাহিনীব আকাবে পদাবলীকীর্তনেব প্রধান বিষয়বস্তু। পদাবলীকীর্তনে মাথুব, বাস, কলহান্তবিত, দান, নৌকাবিলাস, খণ্ডিতা প্রভৃতি পালা শ্রীবাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলাকাহিনীকে কেন্দ্র কবেই সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীবাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সকল পালা বা কীর্তনকাহিনীবই প্রাণবস্তু। কিন্তু পদাবলী-কীর্তনে সমগ্র বাধাকৃষ্ণলীলাকাহিনীব উৎসই গীতগোবিন্দকাব্য বা গীতগোবিন্দপদগান।

গীতগোবিন্দেব প্রথম সর্গেব প্রথম শ্লোকেই দেখি, কবি জয়দেব যমুনা-কূলবিহারী শ্রীবাধা-কৃষ্ণেব জয়গান কবেছেন—'বাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা-কূলে বহঃ কেলয়ঃ'। শৃঙ্গাবরসপ্রধান শ্রীবাধা কৃষ্ণেব যমুনাকূলে বিজনকেলি এবং বাধাকৃষ্ণলীলামুখরিত এই গীতগোবিন্দকাব্য শৃঙ্গাবপ্রধান— শৃঙ্গাববস-প্রধানং হি কাব্যম'। গীতগোবিন্দে শ্রীবাধা-কৃষ্ণ-সম্পর্কিত পদাংশ, যথা—

(ক) বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমাবৈববয়বৈ-
ভ্রমন্তীং কান্তাবে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসারণাম।

* * *

বলদ্‌রাধাং রাধাং সবসমিদমূচে সহচরী। ১।২৭

মাধবীকুসুমতুল্য কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা নিভৃত প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে ব্যাকুলা।

(খ) চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী।

* * *

হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি
বিলসতি কেলিপরে। ১।৪০

পীতবসনপরিহিত বনমালী শ্রীকৃষ্ণ বিলাসমত্তা মুগ্ধা গোপবধূগণকে নিয়ে কেলিবিলাসে রত।

(গ) রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবাম
অভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া। ১।৪৯

রাসোল্লাসে বিহ্বলচিত্ত গোপিগণের সম্মুখেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দৃঢ়ভাবে প্রেমালিঙ্গন দান করলেন।

(ঘ) বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ। ২।১

শ্রীরাধা নির্বিচারে সকল গোপীর সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করছেন।

(ঙ) গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ। ২।১৯

ব্রজসুন্দরীগণপরিবৃত গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ ক'রে সকলে আনন্দিত।

(চ) কংসারিরপি * * রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ
ব্রজসুন্দরী। ৩।১

কংসারী শ্রীকৃষ্ণ * * রাধার পূর্ণ-অনুধ্যানে ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন।

(ছ) ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ, * * বিষসাদ মাধবঃ। ৩।২

অনঙ্গবাণে ব্যথিতচিত্ত মাধব শ্রীকৃষ্ণ * * রাধিকার দর্শন না পেয়ে অনুতাপ করতে লাগলেন।

(জ) যমুনাতীর-বানীরনিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্।
প্রাহ প্রেমভরোদভ্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী॥ ৪।১

যমুনাতটবর্তী বেতসকুঞ্জে * * মাধব শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকার সখী এসে বল্লেন।

(ঝ) স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।

* * *

রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ ৪।১১

হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বিরহে শ্রীরাধা গৃহকে অরণ্যপ্রায় জ্ঞান করছেন। এভাবে ৪।২০, ৫।১, ৫।২১, ৫।২, ৬।১২, ৭।৪২, ১০।১৭, ১১।১, ১১।২, ১১।২৪, ১১।৩২, ১২।১, ১২।২, ১২।১৬ শ্লোকগুলিতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নামের উল্লেখ পাই এবং গীতগোবিন্দপদ-রচয়িতা কবিশেখর জয়দেব যে একান্তভাবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণেরঅনুগত ছিলেন তা 'তৎ সর্বং জয়দেব পণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ' (১২।২৭)[১] শ্লোকই প্রমাণ করে এবং তারি জন্য তাঁর গীতগোবিন্দকাব্য 'হরি-চরণস্মরণামৃতনির্মিতকলিকলুষজ্বরখণ্ডনে' সমর্থ।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, কবি জয়দেব শ্রীকৃষ্ণেরই পদ বন্দনা করেছেন, শ্রীকৃষ্ণেরই তিনি শরণাগত, কিন্তু সেখানে শ্রীরাধিকার বা শ্রীরাধার নামের কোন উল্লেখ নাই। তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, গীতগোবিন্দের সর্গবন্ধে তথা প্রতিটি সর্গের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নামই সম্পর্কিত, যেমন ১ম সর্গের নাম 'সামোদ-দামোদর' ২য় সর্গের নাম 'অক্লেশ-কেশব' ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম সর্গের নাম 'মুগ্ধমধুসূদন', 'স্নিগ্ধমধুসূদন' 'সাকাঙ্ক্ষা-পুণ্ডরীকাক্ষ' 'ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ', 'নাগর-নারায়ণ' প্রভৃতি। এ'সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। তাছাড়া কবি জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও মহিমা-বর্ণনাভঙ্গীও একটু ভিন্ন ধরনের, কেননা শ্রীমদ্ভাগবতে বৈষ্ণবভক্তিনিষ্ণাত ও মধুররস-সমুজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণলীলার বর্ণনার সঙ্গে গীতগোবিন্দে জয়দেব-বর্ণিত মধুরোজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণ-লীলাবর্ণনার ঠিক ঐক্য ও সামঞ্জস্য নাই, বরং গীতগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনার সাদৃশ্য পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকারের শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনার সঙ্গে। গীতগোবিন্দে বর্ণিত শ্রীরাধিকা বা শ্রীরাধার যে 'উজ্জ্বলরসের নায়িকা'-রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সাদৃশ্যও ঠিক শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় না। মোটকথা "ভগবদুপাসনার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য এই দু'টি দিক গীতগোবিন্দে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সমান ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে"।[২] শ্রদ্ধেয় ডঃ সুশীল কুমার দে এ'সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন: "বাঙালাদেশে রাধাকৃষ্ণের

১। 'শ্রীকৃষ্ণে একতানঃ একাগ্রোঽনন্যবৃত্তিবাত্মা মনো যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণৈকান্তভক্তস্যৈব সর্বগুণাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ'—পূজারী গোস্বামী।

২। ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দে-প্রণীত 'নানা-নিবন্ধ' (১ম সংস্করণ ১৯৫০)-গ্রন্থে 'জয়দেব ও গীতগোবিন্দ', পৃঃ ৪৬

রসোপাসনা কি ভাবে বা কাহার দ্বারা প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা দুরূহ, কারণ তদানীন্তন বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসের সুস্পষ্ট পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। যতটুকু জানা যায়, তাহা হইতে এরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, জয়দেব, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকার ও নিম্বার্ক এই তিনজনই আপন-আপন অনুভবের দ্বারা কোন অধুনালুপ্ত বৈষ্ণব-ভাবের কোন একটি ধাবা অনুসরণ করিয়াছেন। এই ধারা বোধ হয় পরবর্তী শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবর্তিত ধারা হইতে স্বতন্ত্র এবং ইঁহাদিগকে পরস্পরের নিকট ঋণী বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন প্রমাণ নাই।"[৩]

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ'কথা নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে, কবি জয়দেব শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শৃঙ্গাররসবহুল শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গীতগোবিন্দপদগান রচনা করেন নি, কেননা শ্রীমদ্ভাগবতে রাধাকৃষ্ণলীলামাধুর্য রসতত্ত্বে পরিণত এবং অপ্রাকৃত সেই তত্ত্ব ও তত্ত্বের আস্বাদন। কিন্তু কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ-রচনাব রসমাধুর্য একেবারে শুদ্ধ অপ্রাকৃত তত্ত্বেব রূপ গ্রহণ কবে নি। "ববং তাঁহার বচনায় অপ্রাকৃতেব সহিত প্রাকৃত, ভক্তিব সহিত প্রীতি, কল্পনাব সহিত বাস্তব-অনুভূতি একাকারে মিশিয়া গিয়াছে"। কবি জয়দেব শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমলীলাই বর্ণনা করেছেন। তার পদগানে সেই প্রেমলীলা বাস্তব বিরহ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাব অতীত হয়ে ধ্যানগম্য নিত্যবৃন্দাবনের সৃষ্টি কবেনি, বরং "প্রাকৃত প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবি-রূপে অপ্রাকৃতিক বৃন্দাবন-লীলা, মানবোচিত ভাব ও আশার উজ্জ্বল ও গীতিময় শব্দচিত্রপরম্পরায় সর্বসাধারণেব অধিগম্য হইয়াছে। এই বাস্তব ও কল্পনাব সংযোগ অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গত ভাবেব মিশ্রণ,—ইহাই গীতগোবিন্দের অন্তর্গত কাব্যবস্তু"।[৪] সুতরাং এই গীতগোবিন্দকাব্য সবিশেষ থেকে পরিশেষে নির্বিশেষ রসোপলব্ধির আনন্দরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "শ্রীমদ্ভাগবতে যে রহস্য গুপ্ত ছিল, গীতগোবিন্দে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে"[৫] এবং এই মতের

৩। ঐ, পৃঃ ৪৭

৪। ডঃ এস. কে. দে: 'নানা-নিবন্ধ' (জয়দেব ও গীতগোবিন্দ), পৃঃ ৫২

৫। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ (৩য় সংস্করণ, ১৩৬২), পৃঃ ১২৫

পরিপোষণে তিনি পুনরায় বলেছেন : "কবি জয়দেব যে শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, উভয় গ্রন্থের শ্রীশ্রীরাসলীলার বর্ণনাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।"[৬] কিন্তু শ্রীভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের "কাচিং সমং মুকুন্দে * * তস্যৈ মামঞ্চ বহ্বদাৎ' (৯-১০ শ্লোক) এবং গীতগোবিন্দের 'পীনপয়োধরভারভবেণ * * কাচিদুদঞ্চতপঞ্চমরাগম্" (১।৪১) শ্লোকদুটির অর্থ ও ভাবের যথার্থ কোন সাদৃশ্য নাই, কেননা ষড্‌জাদি সাত লৌকিক স্বর এবং রামায়ণোক্ত (৪র্থ কাণ্ড) ও নাট্যশাস্ত্রোক্ত (২৮শ অধ্যায়) ষাড়্‌জী, আর্ষভী প্রভৃতি সাতটি শুদ্ধজাতি, জাতিরাগ বা জাতিগানের সঙ্গে পঞ্চম-উপলক্ষিত পঞ্চমরাগের কিংবা গীতগোবিন্দের 'বাগ্‌দেবতাচরিত * * করোতি জয়দেব-কবিঃ প্রবন্ধম্' (১।২) এবং শ্রীমদ্ভাগবতের 'তদ্বাগ বিসর্গো * * শৃণন্তি সাধবঃ (১ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়) শ্লোকদু'টির ভাববস্তুর মধ্যেও কোন প্রাসঙ্গিক ঐক্য নাই।[৭] তাই 'গীতগোবিন্দ'-পদগান শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, শ্রীচৈতন্যপরিকরগণ এবং পরবর্তী বৈষ্ণবসমাজ ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের একান্ত উপজীব্য ও পরমশ্রদ্ধার বস্তুরূপে পরিগণিত হলেও[৮] শ্রীমদ্ভাগবতের কোন প্রভাব অধিকাংশ পণ্ডিত গীতগোবিন্দকাব্যে বা গীতগোবিন্দপদগানে লক্ষ্য করেন নি। এ'প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুশীলকুমার দে-র সুচিন্তিত অভিমত উল্লেখ ক'রে বলি : "আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শৃঙ্গাররসবহুল রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসই জয়দেবের কবি-কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। গীতগোবিন্দর—

আকাশ মেদুর মেঘে, ক্রমে শ্যাম-বনভূমি,
রাত্রি এখন ভীরু এরে রাধে, গৃহে লয়ে যাও তুমি,—

৬। ঐ পৃঃ ১৪১

৭। কেননা স্বর, তাল, বাগ, তাল, পাট, ধাতু প্রভৃতি ষড়ঙ্গযুক্ত প্রবন্ধগান গীতগোবিন্দ এবং সাধুজনগণের শ্রুতি, গীত ও গৃহীত শব্দালঙ্কারযুক্ত শ্লোকবাক্য এক পর্যায়ভুক্ত নয়।

৮। পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন : "গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রেমধর্মের অন্যতম সূত্রগ্রন্থরূপে-শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্যরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন"। ('কবি জয়দেবও শ্রীগীতগোবিন্দ', ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৩৯)। তাছাড়া রায় রামানন্দ নাকি স্বীকার করতেন যে, কবি জয়দেব শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা গীতগোবিন্দে রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। গীতগোবিন্দ ৩।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

নন্দের এই আদেশে চলিত আধারকুঞ্জনীড়ে
রাধামাধবের নির্জন-কেলি জয়তু যমুনাতীরে !

এই ভাবের উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রাচীনতর পুরাণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বরং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়েব সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। জয়দেবেব কাব্যে বসন্ত-কালীন রাসেব বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের রাস শরৎকালীন। গোপীলীলার কথা আছে, কিন্তু শ্রীরাধার প্রত্যক্ষ উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতো জয়দেবেব কাব্যে শ্রীরাধাকে রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেব সকল বিলাসলীলাব কেন্দ্ররূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহা আবও উল্লেখযোগ্য, যে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকার শ্রীকৃষ্ণ-রাধার নিয়মিত বিবাহেব অনুষ্ঠান করিয়া পরকীয়াবাদের সমর্থন করেন নাই, গীতগোবিন্দ আলোচনা করিলেও 'পরকীয়াভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলব্ধি হয় না'—এ'কথা গীতগোবিন্দের সুযোগ্য বৈষ্ণবপ্রবব শ্রীযুক্ত হবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যাও স্বীকার করিয়াছেন। ভগবদুপাসনাব ঐশ্বর্য ও মাধুর্য এই দুইটি দিকই গীতগোবিন্দে ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে সমানভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।"[৯] ডঃ সুশীলকুমাব তাঁব *Sanskrit Literature*-গ্রন্থেও[১০] অনুরূপ মন্তব্য ক'বে বলেছেন:

"There are parallellisms between the treatment by Jayadeva on the one hand and the ***Brahma-vaviarta-purāna*** on the other, of the Rādhā-Krishna legend and its erotico-religious possibilities in a vivid background of sensuous charm; but there is no conclusive proof of Jayadeva's indebtedness to the Purāna. Nor is it probable that the source of Jayadeva's inspiration was the Krishna-Gopi legend of the ***Srimad-bhāgavata***, which avoids all direct mention of Rādhā and describes the autumnal and not the vernal (as in Jayadeva) Rāsalilā. There must have been other widespread tendencies of similar kind from which Jayadeva, like Vidyāpati, derived his inspiration"।[১১]

৯। 'নানা নিবন্ধ (জয়দেব ও গীতগোবিন্দ), পৃঃ ৪৫-৪৬

১০। Cf ***Indian Studies*** : Past & Present, vol- 1, No. 4, p. 440.

১১। Cf. Dr. S. K. De : ***Pre-Chaitanya Vaisnivism in Bengal*** (Festschrift

পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীমদ্ভাগবদোক্ত 'শারদ-রাস' ও গীতগোবিন্দে-বর্ণিত 'বাসন্ত-রাস'-বর্ণনা ক'রে দু'টির পার্থক্য সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "শারদ-রাসে কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা কুমারীগণের কামনা পূর্ণ করাই শ্রীকৃষ্ণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্রতপরায়ণা কুমারীগণ—শ্রুতিচরী ও ঋষিচরী গোপীগণ—কাত্যায়ণীদেবীব নিকট নন্দগোপনন্দনকে পতিরূপে পাইবার কামনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীবাধিকা অথবা তাঁহার যুথভুক্তা কোন গোপী ছিলেন না। * * কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা সকলেই আত্মবিস্মৃত হইযাছিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যকে সম্পূর্ণ করিবাব জন্য কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ কবিযাছিলেন, এবং তাঁহাদেব পথপ্রদর্শনের জন্যই সকলেব মধ্য হইতে পৃথক করিয়া শ্রীমতী বাধাকে পথের মাঝখানে একাকী রাখিযা গিয়াছিলেন। যুগল-পদাঙ্ক অনুসরণ কবিতে করিতে গোপীগণ শ্রীমতীর সঙ্গ লাভ করেন এবং তাঁহারই কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ প্রাপ্ত হন। রাসমণ্ডলে কৃষ্ণ সকলকেই সন্তুষ্ট কয়িয়াছিলেন। * * ইহাই শাবদ-রাস। বাসন্ত-রাস কিন্তু অন্যরূপ। এই লীলার শ্রীবাধা সম্যক্ সচেতন রহিয়াছেন। * * শ্রীকৃষ্ণকে তিনি একা পাইতে চাহেন না। কিন্তু তিনি দান না করিলে শ্রীকৃষ্ণ কেন অন্যের হইবেন, কিরূপে তিনি অন্যের নিকট যাইবেন—এ'কথা তিনি বুঝিতে পারেন না। এই অভিমানেই তিনি কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা। * * শ্রীমতীর এই অভিমান ছিল বলিয়াই বাসন্ত বাসে তিনি রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়াছিলেন। বাসন্ত-রাসে শ্রীবাধাকে হারাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিবহ এক অপূর্ব বস্তু। কবি জয়দেব এই অভিমান—এই অপূর্বতার উজ্জ্বল আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। এই আলেখ্যই বাসন্ত-রাস।"[১২] সুতরাং কবি জয়দেবের বর্ণনা থেকে এ'কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নি, অথবা তত্ত্বপ্রধান শ্রীমদ্ভাগবতের ঠিক আপ্রকৃত রাধাকৃষ্ণমাধুর্যলীলা তিনি অনুসরণ করেন নি।

এক্ষণে বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের পাদভূমি বা পটভূমিকা গীতগোবিন্দ-

M. Winternitz, pp. 196) and *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal* (1942). pp. 7-10.

১২। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ (৩য় সংস্করণ,১৩৬৫), পৃঃ ১৩৯-১৪০

পাদগানের নায়ক-নায়িকা-সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পদাবলী-কীর্তনের মাধুর্য ও লীলার নায়ক-নায়িকার কথাই বিশেষ ভাবে মনে পড়ে এবং পদাবলীকীর্তনের প্রসঙ্গে পরে এ' সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করলেও এখানে নায়ক-নায়িকা সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-প্রণীত 'সাহিত্যদর্পণ', পীতাম্বরদাসের সংস্কৃত 'রসমঞ্জরী', ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর পদ্যানুবাদ, শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জলনীলমণি' প্রভৃতি অলঙ্কার ও রস-গ্রন্থে বিশেষভাবে অষ্টনায়িকার রসোজ্জ্বল বর্ণনা নিহিত থাকলেও ঐ অষ্ট নায়িকার প্রত্যেকের আট প্রকার ভেদ দর্শিত হয়নি। তবে পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী' কিংবা শশিশেখর তথা শেখর-ভ্রাতৃদ্বয়ের 'নায়িকারত্নমালা'-য় অষ্টনায়িকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অষ্ট প্রকার ভেদের উল্লেখ দেখা যায়। অবশ্য প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকদের অনুসৃত তর্কশাস্ত্রের বিচারে বা তাদের দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষণে অষ্টনায়িকার কল্পিত ভেদগুলির স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা স্বীকৃত হয়নি, পরন্তু তাঁরা নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন অনুভাব ও ব্যভি-চারীভাব রূপেই স্বীকার করেছেন, তথাপি পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী'-গ্রন্থে ও বিশেষভাবে 'নায়িকারত্নমালা' গ্রন্থে সঙ্কলয়িতা শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের ভনিতাযুক্ত পদাবলীতে তাদের সত্তার ও নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টনায়িকার প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পীতাম্বরদাসের 'রস-মঞ্জরী' -গ্রন্থে 'প্রোষ্যৎপতিকা' নাম্নী নবমী নায়িকারও উল্লেখ দেখা যায় এবং মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগলভা, পরকীয়া ও গণিকাভেদ এবং অভিসারিকা প্রভৃতি নববিধ নায়িকার প্রত্যেকটির পাঁচটি ক'রে কবিত্ব ও রসপূর্ণ পদের সন্ধান পাওয়া যায় (ভানুদত্ত-কৃত পদ্যানুবাদও দ্রষ্টব্য)। সুতরাং পরে পদাবলীকীর্তনের নায়ক-নায়িকাদের ভেদ, ভাব ও রসমাধুর্যের বিশদভাবে আলোচনা করলেও বর্তমানে প্রাচীন পদসাহিত্যে সুপণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীনায়িকারত্নমালা'-গ্রন্থে চৌষটি নায়িকা ও প্রাচীন পদকর্তা শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের ভনিতাযুক্ত পদাবলীর কিছু অংশ এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করবো পরবর্তী আলোচনার পটভূমিকা ('background') রচনা করার জন্য।

'নায়িকারত্নমালা' গ্রন্থের[১৩] প্রারম্ভে উদ্ধৃত দেখা যায়,

যথা শ্রীগীতাবল্যাম্—

১৩। সন ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত।

অথাভিসারিকা বাসকসজ্জাপ্যুৎকণ্ঠিতা তথা।
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা চ কলহান্তরিতাপরা ॥
প্রোষিতপ্রেয়সী প্রোক্তা তথা স্বাধীনভর্তৃকা।
ইত্যষ্টৌ নায়িকাভেদা রসতন্ত্রে প্রকীর্তিতাঃ ॥

অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতপ্রেয়সী বা প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা এই আট প্রকার নায়িকাভেদ-সম্পর্কে আলোচনাব পূর্বে এখানে বলা প্রয়োজন যে, 'নায়িকারত্নমালা' বা শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের-ভনিতাযুক্ত পদাবলী সম্ভবত ১৫০ বৎসরের অধিক প্রাচীন নয়, কেননা ১৫৮০ শকে লিখিত পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থেব পুঁথিতে (অনূ্যন ২৬৯ বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত) শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের কোন পদের উল্লেখ দেখা যায় না। তাছাড়া মহারাজ নন্দকুমারের আচার্যদেব বৈষ্ণবাচার্য ও পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুরের[১৪] পরবর্তী পদকর্তা বা পদসঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের বিরাট 'পদকল্পতরু'-গ্রন্থেও শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর এবং নায়িকারত্নমালার বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এজন্য অনেকে শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর ভাতৃদ্বয়ের সঙ্কলিত পদগুলিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন। কিন্তু পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় 'নায়িকারত্নমালা'-গ্রন্থে পদাবলী-কীর্তনের অন্যতম উপদান-রূপে শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের পদগুলির প্রামাণ্য ও সার্থকতা স্বীকার করেছেন। তাছাড়া এই পদগুলি অনেক কারণে দুষ্প্রাপ্যও ছিল, এজন্য বর্তমানে আমাদের আলোচনায় পূর্বাভাস-রূপে 'নায়িকারত্নমালা-'র ভিত্তিতে শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের পদের পরিপ্রেক্ষিতে নায়ক-নায়িকা ও বৈষ্ণব-পদাবলীতে রস ও ভাব-বিকাশের কথঞ্চিৎ আলোচনা করতে এখানে চেষ্টা করেছি।

'নায়িকারত্নমালা'-গ্রন্থে অষ্টনায়িকার উল্লেখের পরেই প্রথম নায়িকা 'অভিসারিকা'-র অষ্টবিধ লক্ষণ 'গীতাবলী' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে—

যা পর্যুৎসুকচিত্তাতিমদেন মদনেন চ।
আত্মনাভিসরেৎ কান্তং সা ভবেদভিসারিকা ॥

১৪। পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুরের পদাবলী ও সাঙ্গীতিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এ'গ্রন্থেব পববর্তী ভাগে করবো।

অর্থাৎ যে নায়িকা অতিশয় যৌবন-মদ ও মদন-বিকার দ্বারা উৎকণ্ঠিত চিত্ত হয়ে নিজ কান্ত বা নায়কের নিকট অভিসার করেন তাঁকেই 'অভিসারিকা' বলা হয়। এই অভিসারিকা আট প্রকার—

জ্যোৎস্নী চ তামসী চৈব বর্ষাস্বথ দিবা মতা।
কুজ্ঝটিকা তীর্থযাত্রা চোন্মত্তা সঞ্চরাপি চ॥

অর্থাৎ অভিসারিকা জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষাভিসারিকা, দিবাভিসারিকা, কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, তীর্থযাত্রাভিসারিকা, উন্মত্তা ও সঞ্চরা-ভেদে অভিসারিকা আট প্রকার।

এরপর জ্যোৎস্নী প্রভৃতি আট প্রকার অভিসারিকার পরিচয় দিয়েছেন পদরচয়িতারা সুললিত সংস্কৃত পদের মাধ্যমে। যেমন—

কুচ-কলসভরার্তা কেশরি-ক্ষণ-মধ্যা;
বিপুলতর-নিতম্বা পক্ক-বিম্বাধরৌষ্ঠী।
ধবল-বসন-বেশা, মালতী-বদ্ধ-কেশা
নিধুবন-রস-পুঞ্জং যাতি রাধা নিকুঞ্জম্॥

পদগুলির ছন্দসজ্জা, রচনা ও সাহিত্য সুললিত ও রসপূর্ণ। অনেকে এই বৈষ্ণব-পদ-সাহিত্যে শৃঙ্গাররসাত্মক বর্ণনায় মধ্যে কামগন্ধের সন্ধান পান, কিন্তু এই শৃঙ্গাররস বিশ্বসৃষ্টির আদিরস ও অপূর্ব কল্পনা—যে রস ও কল্পনাকে নিয়ে বিশ্ব-রচয়িতা ঈশ্বর বিরাট সৃষ্টি রচনা করেছেন অগণিত মানুষের শান্তি ও মুক্তির জন্য। পরবর্তী প্রস্তরমন্দির বা গুহামন্দিরগুলিতে শৃঙ্গাররসাত্মক মূর্তির লীলা-বিলাসের পিছনেও অপার্থিব ভাবমাধুর্যের বিকাশ বা প্রলেপ দেখা যায় সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্রষ্টা ভগবানের সন্নিধানে রসপিপাসু মানুষকে উপনীত হবার জন্য।

শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর-রচিত পদগুলির সঙ্গে শাস্ত্রীয় ধানশী (ধানেশ্রী), মল্লার বা মল্লারিকা, ভূপালিকা বা ভূপালী, মঙ্গল-ধানশী, বরাড়ী, সৌরঠী (সৌরাষ্ট্রী), মায়ুরী। কল্যাণ বা কল্যাণী প্রভৃতি রাগেরও সমাবেশ দেখা যায়, যেমন দেখা যায় সকল প্রাচীন ও নবীন বৈষ্ণব-পদাবলীতে। 'নায়িকা-রত্নমালা' গ্রন্থে দেখা যায়, অষ্টনায়িকার প্রতিটি রূপভেদের প্রারম্ভে গীতাবলী কিংবা শ্রীমদ্ভাগবত থেকে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে। যেমন, অনুকূলার বর্ণনার প্রারম্ভে দেখা যায়—

শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

নন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনযদ্রহঃ॥

অর্থাৎ অনুকূলা স্বাধীনভর্ত্তৃকার বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় যে, এই নায়িকা-কর্তৃক নিশ্চয়ই ভগবান শ্রীহরি আরাধিত হয়েছেন, যে জন্য গোবিন্দ প্রসন্ন হয়ে ও আমাদের পরিত্যাগ করে এ' অনুকূলা নায়িকাকে সঙ্গে নিয়েই নির্জনে গমন করেছেন। শশিশেখর করুণাশ্রী-রাগে (?) রসায়িত ব্রজবুলি-ভাষায় বর্ণনা করেছেন—

এই যে নাগরী আরাধিল হরি
নিশ্চয় কহিলুঁ তোরে।
প্রাণের গোবিন্দ পাইয়া আনন্দ
সঙ্গতি লইল যারে॥
আমা সবাকারে পরিহরি দূরে
তারে লৈয়া সঙ্গোপনে।
মদন-বিলাস করে পরকাশ
বুঝিলাম অনুমানে॥
রমনী-রমন দুঁহুঁ পদচিহ্ন
পড়িয়া আছয়ে পথে।
মাফরী পতাকা ধ্বজ ঊর্ধরেখা
বজর অঙ্কুশ তাতে॥
আমরা গোপিনী সবে ভাগিহীনী
ভাগ্যবর্তী এই নারি।
শশি (শশী) কহে সতি বরজ-যুবতি
তারে অনুকূল হরি॥

পিতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থটি বিদগ্ধ বৈষ্ণব-সাধকগণের সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। অষ্টনায়িকার প্রসঙ্গে 'শ্রীশ্রীনায়িকারত্নমালা'-র মতো পীতাম্বরদাস-রচিত এবং ভানুদত্তের পদ্যানুবাদ 'রসমঞ্জরী' থেকে সামান্য-কিছু রস-ভাব তত্ত্ব নিয়ে এখানে আলোচনা করছি। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ বসু

'রসমঞ্জরী'[১] গ্রন্থের সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছেন। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, মিথিলাবাসী গণপতিনাথের পুত্র ভানুদত্ত পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থটির পদ্যানুবাদ করেন। 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের উপর অনন্ত পণ্ডিতরচিত 'ব্যঙ্গার্থকৌমুদী', আনন্দশর্মা-রচিত 'ব্যঙ্গার্থদীপিকা', নাগেশভট্ট-রচিত 'রসমঞ্জরীপ্রকাশ', হরিবংশভট্ট-রচিত 'রসমঞ্জরীটীকা', হরিবংশভট্টের পুত্র গোপালভট্ট-রচিত 'রসিকরঙ্গিনী', নৃসিংহাত্মজ বোপদেব-কৃত 'রসমঞ্জরী-বিকাশ', লক্ষ্মীধরাত্মজ বিশ্বেশ্বর-রচিত 'সমঞ্জসা', শেষনৃসিংহাত্মজ শেষ-চিন্তামণি-রচিত 'রসমঞ্জরীপরিমল', ব্রজরাজ দীক্ষিতের 'রসিকরঞ্জন' প্রভৃতি টীকা ও ভাষ্য প্রসিদ্ধ।

বাংলাভাষায় সম্ভবত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায়গুণাকর ভারত-চন্দ্রই প্রথমে 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের প্রচারক। অবশ্য তিনি সংস্কৃত 'চোরপঞ্চাশৎ' কাব্যের যে পদ্যানুবাদ ও শিখরিণী ছন্দে 'নাগাষ্টক' রচনা করেন তাদের ভাব ও ভাষা 'রসমঞ্জরী'-গ্রন্থের ভাবের উদ্বোধক। তাছাড়া পীতাম্বরদাসের সংস্কৃত 'রসমঞ্জরী' ও ভানুদত্তের পদ্যানুবাদযুক্ত রসমঞ্জরীর আদর্শে ভারতচন্দ্র একখানি 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থও রচনা করেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারত-চন্দ্রের রসমঞ্জরীর বিশেষ সমাদর দিয়েছেন। 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'-গ্রন্থকে শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য বলে প্রশংসা করেছেন। শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় ভানুদত্ত-কৃত 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের বাংলা-পদ্যানু বাদের[২] ভূমিকায় করেছেন: "ভানুদত্ত প্রোষিতভর্তৃকা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার প্রত্যেকের মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, পরকীয়া ও গণিকা-ভেদে যে স্বতন্ত্র উদাহরণ দিয়াছেন, সেস্থলে ভারতচন্দ্র প্রোষিতভর্তৃকা ইত্যাদির মুগ্ধা প্রভৃতি নায়িকা-নির্বিশেষে কেবল একটি করিয়া উদাহরণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং সংস্কৃত রসমঞ্জরীর বিচারাত্মক অধিকাংশ স্থলই বাহুল্য-ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছেন।" তাহলেও ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর বাংলা-পদ্যানুবাদের মতো ভারতচন্দ্রে রসমঞ্জরীও রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আদরণীয় বলে গণ্য।

১। পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বঙ্গাব্দ ১৩০৬ শকে প্রকাশিত হয়।

২। বসন্তকুমার চক্রবর্তী-কর্তৃক কলিকাতা মডেল লাইব্রেরী থেকে ১৩২০ সালে প্রকাশিত।

শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় লিখেছেন, সংস্কৃত ভাষায় ভরত মুনি-প্রণীত 'নাট্য-শাস্ত্র' সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ নির্বাচিত হইলেও রুদ্রভট্ট-প্রণীত 'শৃঙ্গারতিলক' ভানুদত্ত-প্রণীত-'রসমঞ্জরী' পদ্যানুবাদ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-প্রণীত 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার যে বিস্তৃত বিভাগ ও পরিচয় আছে, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ঠিক সে রকম নাই!" পুনরায় "শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে মধুরভাবাত্মক বৈষ্ণবধর্মের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় পরবর্তী বৈষ্ণবাচার্য ও বৈষ্ণব-কবিদিগের দ্বারা এই বিষয়টি যেইরূপ উৎকৃষ্টরূপে আলোচিত ও পল্লবিত হইয়াছে সেইরূপ আর কোথাও হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ রূপ গোস্বামী-প্রণীত 'উজ্জ্বলনীলমণি' নামক অপূর্ব গ্রন্থ রসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ দর্শন ও প্রায় সার্ধশত বৈষ্ণব-কবির সুললিত পদাবলীকে ইহার কবিত্বপূর্ণ উদাহরণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। * * বাংলাভাষায় বৈষ্ণব-কবি কৃষ্ণদাস-প্রণীত 'ভক্তমাল' গ্রন্থের অন্তর্গত রস-পরিচ্ছেদে ও ভারতচন্দ্র রায়ের প্রণীত 'রসমঞ্জরী প্রভৃতি ২।৩ খানা গ্রন্থ ব্যতীত যদিও এই বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয় নাই, তথাপি বৈষ্ণব-কবি ও কীর্তন-গায়কদিগের প্রসাদে পরকীয়া, মুগ্ধা, মধ্যা, বাসকসজ্জা, অভিসারিকা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি রসশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি আমাদিগের অধিকাংশের নিকটেই অপরিচিত নহে। 'পদকল্পতরু' নামক সুবৃহৎ পদাবলী-সংগ্রহের সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস ঐ গ্রন্থে উজ্জ্বলনীলমণির বর্ণিত ক্রম অনুসারে বৈষ্ণব-কবিদিগের পদাবলী বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে পারিভাষিক শব্দগুলির লক্ষণ দেওয়ার জন্য 'উজ্জ্বলনীলমণি' হইতে সংস্কৃত কারিকাতে সংস্কৃত উদাহরণ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।"

পীতাম্বরদাসের সংস্কৃত 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে অভিসারিকা-সম্পর্কে দেখি—

কান্তার্থিনী তু যা যাতি-
সঙ্কেতং সাভিসারিকা।

পদ্যানুবাদে দেখি—

সেই অভিসার হয় পুন অষ্ট প্রকার
জোৎস্নী তামসী বর্ষা দিবা-অভিসার॥
কুজ্ঝটিকা তীর্থযাত্রা উন্মত্তা সঞ্চরা।
গীতপদ্যরসশাস্ত্রে সর্বজনোৎকরা॥

এর পর গ্রন্থকার সঙ্গীত-দামোদর (১৬শ শতক) থেকে এর নিদর্শন দিয়েছেন (সুতরাং রসমঞ্জরী ১৬শ শতকের পরবর্তী রসগ্রন্থ)—

"শ্রীসঙ্গীত-দামোদরে—

স্ফারিকুজ্‌ঝটিহেমন্তরজনীধ্বান্তসঞ্চরা।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নবাতাদি-কোলাহলবিধূদয়াৎ॥
রাষ্ট্রভঙ্গনিরাতঙ্ক—
পুবদারমহোৎসবঃ।
প্রদোষশ্চেতি কথিতা
দ্বাদশৈবেদৃশাঃ ক্রমাৎ॥

পীতাম্বরদাসের সংস্কৃত 'রসমঞ্জরী'গ্রন্থে অভিসারিকার প্রসঙ্গচ্ছলে জ্যোৎস্নী, তামসী, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা, সঞ্চার, বাসকসজ্জা, মোহিনী, জাগর্তিকা, মধ্যোক্তিকা, প্রগল্‌ভা, সুপ্তিকা, সুরসা, উদ্দেশা, উৎকণ্ঠিতা, বিকলা, স্তব্ধা, চকিতা, অচেতনা, উৎকণ্ঠিতা-মধ্যা প্রভৃতির পরিচয় আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিসারিকাগুলিতে সংযোজিত—ভূপালি, আসোআরি বা আসাবরী ধানসী, কেদারিকা, মঙ্গল-গুর্জরী, গান্ধার প্রভৃতি রাগগুলির উল্লেখ আছে। রসমঞ্জরীতে গীতাবলী, পদ্যাবলী, রসকদম্ব, কৃষ্ণমঙ্গল, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্ধৃতি আছে। সংস্কৃত রসমঞ্জরীর সমাপ্তিভাগে উল্লিখিত দেখি—

খণ্ডিতাদি অষ্ট রস আট আট করি।
চৌষট্টি প্রকার করি গ্রন্থ রসমঞ্জরী॥
গদ্য পদ্য সঙ্গীত ইহার প্রমাণে।
অবোধ না বুঝে ইহা রসিক সে জানে।
শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বরদাস কহে রসের বিস্তার॥
'রসকল্পবল্লি'-গ্রন্থে যে অবশিষ্ট ছিল।
তাহা বিবরিঞা ইহা বর্ণনা করিল॥

পীতাম্বরদাসের গুরুর নাম শচীনন্দন ঠাকুর, বর্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড নামক স্থানে তাঁর বাসস্থান। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ বসু রসমঞ্জরীর ভূমিকায় লিখেছেন : "মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে নীলাচলে ছিলেন, সেই সময়ে চক্রপাণি ও

মহানন্দ নামে দুই ভাই তথায় গিয়া মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন। (রামগোপাল-দাস স্বরচিত 'রসকল্পপবল্লী' গ্রন্থের মধ্যে এরূপে পরিচয় দিয়েছেন—'চক্রপাণি মহানন্দ দুই মহাশয়। নীলাচলে দুই ভাই প্রভুকে মিলয়॥') এই চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নিত্যানন্দ, তৎপুত্র গঙ্গারাম, গঙ্গারামের পুত্র শ্যামরায়, তাঁহার দুই পুত্র: জ্যেষ্ঠ 'গোবিন্দ-লীলামৃত'-রচয়িতা মদনরায় চৌধুরী ও কনিষ্ঠ 'রসকল্পবল্লী'-প্রণেতা রাম-গোপাল। এই বামগোপালের পুত্র পীতাম্বর বা পীতাম্বরদাস।" সুতরাং পীতাম্বরদাস শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী বৈষ্ণব-কবি বা গ্রন্থকার। অনুবাদক ভানুদত্ত পরে সংস্কৃত 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের পদ্যানুবাদ রচনা ও প্রকাশ করেন। সুতরাং 'শ্রীশ্রীনায়িকারত্নমালা'-র মতো 'রসমঞ্জরী' (১৬শ শতকের) পরবর্তী কালের রসগ্রন্থ হলেও এবং এই 'পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস' গ্রন্থের পরবর্তী ভাগে নায়ক-নায়িকাভেদ ও রসপর্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকলেও পূর্বসূচনারূপে সামান্যভাবে রস ও ভাব এবং নায়ক-নায়িকার এখানে আলোচনা করলাম মাত্র।



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ বৈষ্ণব-পদাবলীতে পঞ্চরাত্রসংহিতার প্রভাব ॥

মনে রাখতে হবে যে, সার্থক কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-পদগান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক ও রসাস্বাদনপ্রধান। শ্রীচৈতন্যপরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগোস্বামী-গণ-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম পববর্তীকালে আব ও অধিক তত্ত্বপ্রধান ও রসসাধনাত্মক হলেও কবি জয়দেবের সময়েই বৈষ্ণবধর্মের নবজাগরণচেতনা সমগ্র বাঙলাদেশকে প্রবুদ্ধ কবেছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকেই আমরা শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনকাদি এই চারপ্রকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ লক্ষ্য করি এবং এ' সম্প্রদায়গুলি রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ ও নিম্বার্ক প্রভৃতি ধর্মাচার্যদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এই চারটি বৈষ্ণবধর্মসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয় আসলে আচার্য শঙ্কব-প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে। আচার্য শঙ্কব যেমন ভাষ্য রচনা করেছিলেন ব্যাস-রচিত বেদান্তসূত্রের উপর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ ও নিম্বার্কও তেমনি বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদমূলক ভাষ্য রচনা করেছিলেন ঐ একই সূত্রগুলিকে অবলম্বন করে। তবে এ'চারটি ভাষ্যেরই প্রাণকেন্দ্র ছিল শ্রীবিষ্ণু-ভগবান, এবং ভক্তি, আত্মনিবেদন বা প্রপত্তি ও আরাধনাদি ছিল শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণের প্রসাদ বা অনুগ্রহ লাভের উপায়স্বরূপ।[১] কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, এ' চারজন আচার্য কিংবা তাঁদের তত্ত্বপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম ও বিষ্ণু-উপাসনাও কবি জয়দেবের উপর বিশেষ কান প্রভাব

১। ডঃ শ্রীসুশীলকুমাব দে: *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal* (1942), pp. 2-3 দ্রষ্টব্য।

বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। কবি জয়দেবও ছিলেন বৈষ্ণবধর্মাশ্রয়ী পরম-ভাগবত এবং তাঁর ভক্তিসাধনা ছিল সহজ সরল শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাগান ও লীলা-আস্বাদনকে নিয়ে সার্থক ও কেন্দ্রায়িত। তবে মুখ্যত কবি জয়দেব ছিলেন কাব্যরসপিপাসু কবি ও সংগীতশিল্পী।

অনেক ঐতিহাসিকের অভিমত যে, পঞ্চরাত্রসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনরচিত ও লীলাবৈচিত্র্য যেভাবে ভারতবর্ষীয় সমাজে বা বৈষ্ণবসমাজে প্রকাশিত ও প্রচারিত ছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ-কর্তৃক পরিকল্পিত, প্রতিপাদিত ও প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের রূপে ও বিকাশে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। বিশেষ ক'রে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, পঞ্চরাত্রসহিতাগুলিতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-বৃন্দাবন-দ্বারকা-লীলার রূপ ও বিকাশ পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবাহিত ও পরিকল্পিত শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাললীলা ও কৌমারকৃতি থেকে বেশ ভিন্ন ছিল বলে মনে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যেরা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলার তত্ত্বাংশই বিশেষভাবে প্রচার করেছিলেন ভক্তি-সাধনা ও ভক্তিদর্শনের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার অপার্থিব লীলাকে নব রসে ও বিচিত্র ভাবে উপলব্ধি করার জন্য এবং সেই উপলব্ধির রূপ আরও নিবিড় ও ঘনীভূত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের মধ্যে যখন পরবর্তীকালে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তির আবেশ শ্রীচৈতন্যে আরোপিত হয়েছিল। পদাবলী-কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকার পরিকল্পনা ও প্রবর্তনপ্রচেষ্টাই অবশ্য সেকথা প্রমাণ করে। এ'সিদ্ধান্তের বিপক্ষেও যে অন্য মতবাদের প্রচলন নাই—তা নয়, তবে পঞ্চরাত্রসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিধর্ম ও শ্রীকৃষ্ণলীলার রূপ ও তত্ত্ব পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে রূপায়িত ভক্তিধর্ম ও শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বেরও বিকাশ যে কিছুটা ভিন্ন ছিল এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম-সম্পর্কে আলোচনাকালে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

তারপর কবি জয়দেব যে তত্ত্বাশ্রয়ী বৈষ্ণবরসতত্ত্বের অনুসরণ ক'রে তাঁর অপূর্ব গীতিকাব্য গীতগোবিন্দ-পদগান রচনা করেন নি, বাঙলার ইতিহাসই আমাদের সেকথা নিঃসংশয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়। ডক্টর সুশীলকুমার দে এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, জয়দেবের অন্তত তিনশত

বৎসর পরে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তৎসম্প্রদায়-প্রবর্তিত রসশাস্ত্র বৃন্দাবন-গোস্বামীগণ-কর্তৃক আরও পরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং গোস্বামীমতের প্রচার জয়দেবের এত পরবর্তী সময়ে হইয়াছিল যে, তাঁহাকে গোস্বামীমতের প্রচারিত বৈষ্ণবমত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কবি হিসাবে বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য তাঁহাকে মুগ্ধ ও বিভোর করিয়াছিল, কিন্তু তিনি রূপ-গোস্বামীর মতো রসশাস্ত্রের উদাহরণস্বরূপ অথবা সেই শাস্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন একথা বলিলে শুধু ইতিহাসের অপলাপ নয়, তাঁহার (জয়দেবের) কবি-প্রতিভারও অসম্মান করা হয়। * * কিন্তু তিনি তত্ত্বান্বেষী ছিলেন না। তাঁহার কল্পনা-প্রবৃত্তির স্বরূপ ছিল মুখ্যত কবিধর্মী।"[২] ডক্টর দে অন্যত্র পুনরায় বলেছেন : "It should not be forgotten that Jayadeva flourished at least three centuries before the promulgation of the Rasa-shastra of Rupa Goswamin, and the Krisnaism, which emerges in a finished literary form in his poem, as in the Maithili songs of Vidyāpati, should not be equalished with that, presented by the dogmas and doctrines of later scholastic theologians. * * If he selected the love-story of Rādhā and Krishna, fascinating to mediaeval India, the divine love that he depicts, is considerably humanised in an atmosphere of passionate poetic appeal".[৩]

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কী গীতগোবিন্দ-পদগান, এবং কী কৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীকীর্তন—সকলেরই উপজীব্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রাকৃত কিংবা অপ্রাকৃত লীলামাধুর্যের বর্ণনা ও তার রসাস্বাদন এবং সকলেরই প্রাণকেন্দ্র ছিল বিচিত্র লীলাবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। তাছাড়া ভক্তিকেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্মকে অবলম্বন করেই এ' সকল পদগান বা পদাবলীগানের প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মের পরমপ্রতিষ্ঠা বিষ্ণুদেবতা—যিনি বিচিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারায়ণ, বাসুদেব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বাসুদেব প্রভৃতি

২। (ক) 'নানা-নিবন্ধ' (জয়দেব ও গীতগোবিন্দ), পৃঃ ৪৮।

৩। *Sanskrit Literature*, pubished in Indian Studies: Past, & Present, Vol. 1, No. 4. p. 646। এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত লীলার কথাই বলা হয়েছে।

নামে ও রূপে বিকাশ লাভ করেছিলেন। বৈদিক সাহিত্যে 'বিষ্ণু' শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, কখনো বিষ্ণু শব্দে সূর্য, কখনো অগ্নি, কখনো যজ্ঞ, আবার কখন বা সকল দেবতার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—'যো বৈ বিষ্ণুঃ স যজ্ঞঃ' (শতপথ ব্রাঃ ৫।২।৩৬), 'বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ' (গোপথ ব্রাঃ, উত্তরভাগ ১।১২ ; তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ ৩।৩।৭।৬, যজুর্বেদ ২২।২০), 'স যঃ স যজ্ঞোঽসৌ স আদিত্যঃ' (১৪।১।১।৬), 'বিষ্ণুঃ সর্বা দেবতাঃ (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ১।১), 'বৈষ্ণবো হি যুপঃ' (শতপথ ব্রাঃ ৩।৮।৪।১)। শতপথব্রাহ্মণে বিষ্ণুর অভিন্ন রূপ 'হরি'-শব্দের অর্থও আদিত্য বা সূর্য—'এষ বৈ বৃষা হরির্য এষ (আদিত্য) তপতি' (১৪।৩।১।২৬)। পুরাণে নারায়ণের সঙ্গে প্রকৃতি বা শক্তিরূপ লক্ষ্মীর উল্লেখ আছে, যেমন নারায়ণ কারণসলিলে শায়িত ও লক্ষ্মী তাঁর পদপ্রান্তে আসীনা সৃষ্টির কারণ পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তিরই প্রতিচ্ছবি—লক্ষ্মী-নারায়ণ। পঞ্চরাত্রসংহিতাগুলিতে বিষ্ণু (ব্যাপনশীল) বাসুদেব পরমদেবতা : 'সমস্তভূতবাসিত্বাদ্বাসুদেবঃ প্রকীর্তিতঃ' (অহির্বুধ্ন্যসংহিতা ২।২৮)। ব্রাহ্মণসাহিত্যেও 'বাসুদেব' নামের উল্লেখ আছে। সেখানে বসুদেবপুত্র'বাসুদেব এই অর্থসার্থকতাকে আরো ব্যাপক ও প্রবৃদ্ধ করেছে।

ঋগ্বেদের ১।১৫৫।৪-৬ এবং ১।১৫৬।১-৫ মন্ত্রগুলি বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশে লেখা। ১।১৫৫।৭ ঋক্‌মন্ত্রটি হোল : "চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং * * বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্কভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্"। এই 'ঋক্কভিঃ যুবা অকুমার প্রতি এতি আহবম্' মন্ত্রের অর্থ করতে গিয়ে আচার্য সায়ণ বলেছেন : "ঋক্কভিঃ স্তুতিমদ্ভির্মন্ত্রবদ্ভির্বাবিমানঃ যদ্যপিবিভুঃ তথাপি ভক্ত্যধীনত্বাৎ স্তুত্যামীয়তে যুবা সর্বত্রমিশ্রণশীলঃ নিত্যতরুণোবা অতএবাকুমারঃ অনল্পঃ এবংভূতো মহাবিষ্ণুরাহবমাহ্বানংপ্রতি এতি গচ্ছতি যজ্ঞদেশম্।" ঋগ্বেদের ১।১৫৬।১ মন্ত্রেও 'অথাতেবিষ্ণোবিদুষা * *'—বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের ১।৫৬।৩ মন্ত্রে আছে : "বিষ্ণোসুমতিং ভজামহে"। এই স্তুতিযোগ্য বিষ্ণুদেবতা যজ্ঞের সঙ্গে সর্বদাই সম্পর্কিত। পুনরায় ঋগ্বেদের ১।১৫৪।১ মন্ত্রে পাই—'বিষ্ণোঃ নু কং বীর্যাণি প্রবোচং' প্রভৃতি। ১।১৫৪।২ মন্ত্রে—'প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ, যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধি ক্ষিয়ংতি ভুবনানি বিশ্বা"। ঋগ্বেদের ১।১৫৪।৩ থেকে ১।১৫৪।৬ মন্ত্রগুলি হোল—

প্র বিষ্ণবে শূষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে।
য ইদং দীর্ঘং প্রযতং সধস্থমেকো বিমমে ত্রিভিরিৎপদেভিঃ ॥৩
যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদংতি।
য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত দ্যামেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা ॥৪
তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদংতি।
উরুক্রমস্য স হি বংধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥৫
তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃংগা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমব ভাতি ভূরি ॥৬

এই মন্ত্রগুলিও বিষ্ণুর বা বিষ্ণু-ভগবানের উদ্দেশ্যে রচিত। এখানে বিষ্ণু ব্যাপনশীল বা সর্বব্যাপী। সায়ণ তাঁর ভাষ্যে লিখেছেন: "হে নরাঃ বিষ্ণোর্ব্যাপনশীলস্য দেবস্য বীর্যাণি-বীরকর্মাণি" (২।১৫৪।৪)। 'ত্রিধাতু পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ এক দাধার ভুবনানি বিশ্বা' মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণ বলেছেন: "ত্রিধাতু পৃথিব্যপ্তেজোরূপধাতুত্রয়বিশিষ্টং যথা ভবতি তথাদাধার ধৃতবান * * ত্রিবৃৎ-করণসৃষ্টিরূপপাদিতা যদ্বা ত্রিধাতু কালত্রয়ং গুণত্রং বা দাধারেত্যন্বয়ঃ।" ১।১৫৪।৫ ঋক্‌মন্ত্রে 'উরুক্রমস্য' শব্দের ব্যাখ্যায় সাযণ 'সর্বজগদ্বীজরূপী ব্যাপক বিষ্ণুর' কথা বলেছেন এবং তিদি 'বৃষ্ণঃ পরমং পদম্'! সায়ণের বক্তব্য যে, এই পরমপদ ত্রিগুণাত্মক ত্রিবিক্রম বিষ্ণুই বামন-রূপে (ত্রিপাদে) বলি রাজার নিকট সর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই তিন লোকের অধিকার গ্রহণ বা হরণ করেছিলেন। এই 'ত্রিপাদ -যুক্ত বিষ্ণুই সর্বব্যাপক পরমদেবতা। ত্রিপাদ = অ + উ + ম এবং এই ত্রিদেবতা বা ভু, ভুবঃ, স্বঃ তিন লোকের অতীত কলা ও বিন্দু বা নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্য। ঈশোপনিষদে "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" মন্ত্র সর্বব্যাপক বিষ্ণুরই বোধক, সুতরাং বিষ্ণু বিশ্বপ্রাণময় ও সর্বব্যাপক বৃহদ্ চৈতন্য—ব্রহ্ম।

এ'প্রসঙ্গে 'পঞ্চোপাসনা' গ্রন্থে ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোকপাত উল্লেখযোগ্য। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিষ্ণ—বৈষ্ণব'-প্রসঙ্গে লিখেছেন: "ঋগ্বেদে এবং অন্যান্য বেদে বিষ্ণু 'ত্রিবিক্রম', 'উরুগায় ইত্যাদি নামে খ্যাত। শেষোক্ত দুইটি শব্দের অর্থ এই যে, 'যিনি বিস্তৃতভাবে বিচরণশীল'। কিন্তু 'ত্রিবিক্রম' শব্দের একটি বিশেষ অর্থ আছে। এই অর্থ বিষ্ণুদেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত একটি বৈদিক বাক্য হইতে উদ্ভূত, উহা এইরূপ

—'ত্রেধা নিদধে পদম্', অর্থাৎ (তিনি) তিনবার পদক্ষেপে করেছিলেন।[৪] প্রকৃতপক্ষে 'ত্রিবিক্রম'-শব্দটি বিষ্ণু-সূর্যের ত্রিপাদ তথা আকাশে ত্রিভাগ-বিচরণ বা সঞ্চরণেরই দ্যোতক। ডক্টর বন্দোপাধ্যায়ও 'সূর্যের নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণের তিনটি পর্যায়' বলে উল্লেখ করেছেন। মোটকথা 'ত্রিপাদ' "প্রাতঃকালীন সূর্যের পূর্বাকাশে স্থিত রূপ যেন তাঁর প্রথম পাদ, মধ্যাহ্নের গগনমধ্যস্থ সূর্য দ্বিতীয় এবং সায়াহ্নে পশ্চিম দিকচক্রবালে বিলীয়মান সূর্যদেবতার শেষ তৃতীয় পাদ সূচিত করে। দেবতা এরূপে তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা যেন সমগ্র অন্তরীক্ষমণ্ডল অতিক্রম করেন"।[৫] শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরাও একমত যে, ব্রাহ্মণ-আরণ্যকে বর্ণিত কাহিনী থেকেই বামন-অবতারের পৌরাণিক বলি-ছলনা-উপাখ্যানের সৃষ্টি। সূর্য-নারায়ণের ত্রিপাদ-সংক্রমণকে কেন্দ্র করেই পৌরাণিক দেবতা দুর্গা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী এই তিন রূপেরও কল্পনা করা হয়েছে। দেবী দুর্গা স্বয়ং সূর্যদেবতার মধ্যাহ্নকালীন প্রকাশ, দেবী সরস্বতী সূর্যের প্রাতঃকালীন এবং দেবী লক্ষ্মী সূর্যের সায়ংকালীন প্রকাশ। সূর্যরূপী বা সূর্যসম্ভূত দেবী দুর্গা যে সর্বদিক ও সর্বদেশব্যাপিণী বিরাট ও বিস্তৃত, দেবীর তিন রূপ সে' তত্ত্বের প্রকাশক।[৬] বেদের সর্বব্যাপকত্বের প্রতীক সূর্যরূপী বিষ্ণুদেবতার ত্রিবিক্রম রূপ তার প্রমাণ।

পুনরায় ১।১৫৫।৬ ঋক্‌মন্ত্রে 'বিষ্ণু' বা বিষ্ণুদেবতা-সম্বন্ধে বলা হয়েছে: 'যুবা অকুমারঃ' এবং ১।২২।১৮ ঋক্‌মন্ত্রে বলা হয়েছে—গোপা'। 'যুবা অকুমারঃ' অর্থে যে বিষ্ণুদেবতা চিরকিশোর বা চিরনবীন এবং 'গোপা' অর্থে গাভীগণের রক্ষক—রাখাল বা গোপাল। সুতরাং ঋগ্বেদেই কৃষ্ণদেবতাকে একবার চিরযুবা (ever young), আর একবার গাভীগণের রক্ষক বা রাখাল তথা 'protector of cows' ও 'herdsman' বলা হয়েছে।[৭] এ' প্রসঙ্গে ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী *Materials for the Stndy of the Early History of the Vaishnava Sect* (2nd ed.) গ্রন্থে বলেছেন: "The epithets Gopā and *Yuvā-akumārah* of the Vedic Vishu might

৪। পঞ্চোপাসনা (১৯৬০), পৃঃ ৩৪

৫। ঐ

৬। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-রচিত 'শ্রীদুর্গা' গ্রন্থে এ' বিষয় আলোচিত হয়েছে।

have been suggestive of the Pauānic tale of the three strides of the same god,suggested the legend of the Dwarf Avatāra।" অর্থাৎ ডক্টর চৌধুরীর অভিমতে,ত্রিবিক্রম বামন-অবতারই বেদের বিষ্ণু। ঐতিহাসিক ডক্টর জয়সোয়াল বলেছেন, বৌধায়নধর্মসূত্রের পূর্বে বিষ্ণুকে 'দামোদর' ও 'গোবিন্দ' নামেও অভিহিত করা হোত। খ্রীষ্টীয় ২০০ থেকে ৪৫০ শতকের মধ্যে রচিত সাতবাহনরাজ হালের (১ম-২য় শতক) 'গাহা-সত্তসঈ' বা গাথা-সপ্তসতীর ২।১২ শ্লোকে 'দামোদর' শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে রূপান্তরিত : 'অজ্জিবি বালো দামোঅরো ত্তি ইঅ জমিপএ জসোআত্র, কহ্নমুহপেসিঅচ্ছং নিহুঅং * *।" এখানে দামোদর বালক শ্রীকৃষ্ণ এবং যশোদা ও ব্রজবধূগণের মতো হালের সপ্তসতীতে রাধিকার উল্লেখও বাদ পড়েনি—'বহিআত্র' অবণেন্তো' (১।৮৯)। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপিতে 'বিষ্ণু গোপ'-শব্দের উল্লেখ আছে এবং পণ্ডিত হপকিন্স্ এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষীদের অভিমতে 'বিষ্ণু-গোপ' শব্দ গোপাল-বিষ্ণু বা গোপাল-কৃষ্ণের পূজারই বোধক। রাজপুতনায় ঘোসুণ্ডী-লিপিমালার ব্রাহ্মী-অক্ষর কৃষ্ণ-বাসুদেবের দেবভাব ও দেব-মহিমার সাক্ষ্য দান করে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০-১৫০ শতকে। ঘোসুণ্ডীলিপিতে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবকে 'সর্বেশ্বর' এবং দিয়রপুত্র হেলিওডোরাস প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ শতকে বেসনগরলিপিতে বাসুদেবকে 'দেবদেব' বলা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ পতকে নানাঘাট-লিপিমালায় বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক এ. বি. কিথ বলেন, খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকের সমাজে পাঞ্চরাত্রতন্ত্র-কথিত ভাগবতসম্প্রদায়েরও প্রচলন ছিল। একথাও আবার সত্য যে, নারায়ণ-বিষ্ণু ঠিক কবে থেকে কৃষ্ণ-বাসুদেবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তৈত্তিরীয়-অরণ্যকে (১০।১।১৬) এই তাদাত্ম্য-ধারণায় একটা নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণীত না হওয়ায় ঐ ধারণায় নির্দিষ্ট সময়ও জানা যায় না। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের ভূমিকায় ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছেন, এই আরণ্যকটি খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে রচিত : 'At least in the beginning of the Christian era'। কিন্তু ডক্টর কিথের অভিমতে তৈত্তিরীয়-আরণ্যক রচিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকে, কেননা নারায়ণ-বিষ্ণুর নামের পরিবর্তে 'বাসুদেব'-শব্দটি যে ব্রাহ্মণসাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে, তার

রচনাকাল (কিথের মতে) খ্রীষ্টীয় ৩য় শতক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে ভাগবত-সম্পর্কীয় কোন প্রস্তরলিপিতেই বাসুদেবের অভিন্নতাসূচক 'নারায়ণ-বিষ্ণু' নামের উল্লেখ নাই, বরং তার পরিবর্তে দেখা যায় বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের নামোল্লেখ। মহাভারতের (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০) ভীষ্মপর্বে ও অহির্বুধ্ন সংহিতায় সাত্ত্বত বা পাঞ্চরাত্রসংহিতার বক্তা ও নিয়ামক-রূপে বাসুদেবের মতো সঙ্কর্ষণের নামও পাওয়া যায়! মহাভারতের ২য় পর্বে (২।৭৯।২৩) সঙ্কর্ষণকে কৃষ্ণ-বাসুদেবের জ্যোষ্ঠভ্রাতা ও (২।১৮।৬৪) কৃষ্ণ-কংস-সংগ্রামে কৃষ্ণের সহায়ক বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরায় মহাভারতের শান্তিপর্বের নারায়ণীয়ভাগে (১২।৩৩৯।২৫ এবং ১২।৩৩৯।৪০) বাসুদেবকে 'পরমাত্মা' ও সঙ্কর্ষণকে 'জীবাত্মা' নামে অভিহিত করা হয়েছে: "যে বাসুদেবো বিজ্ঞেয় পরমাত্মা সনাতনঃ" এবং "জ্ঞেয়ঃ স এ এব রাজেন্দ্র জীবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ"।

আসলে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ-পূজার বীজ আমরা পাই পাঞ্চরাত্রদর্শনের ব্যূহতত্ত্বের মধ্যে। ঘোসুণ্ডীলিপিতেও বাসুদেব-সংকর্ষণের নাম উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু মহাভারতের (২।৭৯।২৩) মতে সঙ্কর্ষণকে বাসুদেব বা কৃষ্ণ-বাসুদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কিংবা বাসুদেব থেকে সৃষ্ট দেবতা বলা হয় নি, বরং সঙ্কর্ষণ সেখানে বাসুদেবের মতো সমান আসনে অধিষ্ঠিত। ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রধর্মে ব্যূহতত্ত্বটির সারমর্ম এই যে, বাসুদেব তাঁর শিষ্যের মধ্য থেকে প্রথমে প্রকৃতি বা মহাপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কর্ষণচৈতন্যও সৃষ্টি করেছিলেন। প্রকৃতি ও সঙ্কর্ষণের সংমিশ্রণে মন বা সাংখ্যীয় বুদ্ধি ও প্রদ্যুম্নচৈতন্যের সৃষ্টি। এটি তৃতীয় ব্যূহ। আবার অহংকার ও অনিরুদ্ধচৈতন্যের সংমিশ্রণে মহাভূত ও ব্রহ্মাচৈতন্যের সৃষ্টি। এটি চতুর্থ ব্যূহ। ভাগবতদর্শনে একেই সৃষ্টিতত্ত্ব বলা হয়েছে এবং এই সৃষ্টিতত্ত্বের কেন্দ্র বা মূল-উৎস বাসুদেব বা কৃষ্ণ-বাসুদেব। উল্লেখযোগ্য যে, এই চতুর্ব্যূহই পরবর্তীকালে বিংশতি ব্যূহে, তত্ত্বে বা মূর্তিতে পরিণত হয়েছিল। বিংশতি মূর্তি যেমন—উপেন্দ্র, হরি, অনন্ত, কেশব, নারায়ণ, ত্রিবিক্রম, জনার্দন, পদ্মনাভ, দামোদর, অচ্যুত, মাধব, গোবিন্দ, মধুসূদন, অধোক্ষজ, শ্রীধর, বিষ্ণু, বামন, হৃষীকেশ, পুরুষোত্তম ও নৃসিংহ।[৮] পাঞ্চরাত্রীয় ব্যূহবাদের সৃষ্টি গুপ্তযুগের পূর্বে এবং গুপ্তযুগের তা বিশেষভাবে পরিপুষ্ট ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৮। ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'পঞ্চোপাসনা', পৃ° ৬৬



ষোড়শ পরিচ্ছেদ

॥ কৃষ্ণ-বাসুদেব-তথ্য ও তত্ত্ব ॥

কৃষ্ণ-বাসুদেবেব বিকাশেব ইতিহাস পুবাণ-সাহিত্য থেকে অল্পই জানা যায়। ডক্টব হেমচন্দ্র বায়চৌধুবীব অভিমত যে, মোটামুটিভাবে (১) ছান্দোগ্য-উপনিষৎ, (২) পতঞ্জলিব মহাভাষ্য[১], (৩) বৌদ্ধ-ঘটজাতক ও জৈন উত্তবাধ্যয়ণ-সূত্র (৪) মহাভাবর্ত, ও হবিবংশ, (৫) কতকগুলি পুবাণ ও (৬) কোন কোন সম্প্রদাযগত উপনিষৎ থেকে কৃষ্ণ-বাসুদেব-সম্বন্ধে আমরা তথ্য সংগ্রহ কবতে পাবি। ডক্টব শ্রীসুশীলকুমার দে প্রাচীন বিষ্ণুধর্ম ও মহাভারতেব নাবায়ণীয় আলোচনাসম্পর্কে '***Early History of the Vaisnava–Faith and Movement in Bengal*** (1942)-গ্রন্থে বলেছেন: "Stretching into the early Vaisnavism and Nārāyaniya worship of the ***Mahābhārata,*** it loses itself in complex body of myth, legend, superstition, belief, sentiment and philosophy, but it emerges in a more or less definite from in the Bhāgāvatism and Krishna-Vāsudeva worship of the *Bagavad-Gitā.* On this basis, it was systematised and erected into a philosopheme in such late Bhakti-works as the *Nārada-Sāndilya-Sutras*, and it continued as a doctrine till about the end of eighth century A. D when the theory of spiritual

---

১। 'হেতুমতি চ'—৩।১।২৬ পাণিনীয় সূত্রেব ভাষ্যে মহর্ষি পতঞ্জলি কংসভক্ত ও বাসুদেব ভক্ত-সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

non-dualism and world-illusion promulgated by the great Sankarāchārya and his followers appears to have imperilled its dualistic metaphysical foundation ।"[২]

বৌদ্ধযুগপূর্ব ছান্দোগ্য-উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে : "তদ্ধৈতদ্‌ঘোর-আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচ, অপিপাস এব স বভূব, * * তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ" (৩।১৭।৬)। আচার্য শঙ্কর এর ভাষ্যে লিখেছেন : "তদ্ধৈতৎ যজ্ঞদর্শনং ঘোরো নামত আঙ্গিরসো গোত্রতঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায় উক্ত্বা উবাচ * *" ;—অর্থাৎ অঙ্গিরা নামক ঋষির বংশ-জাত 'ঘোর'-নামে ঋষি নিজ শিষ্য দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞ-বিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে তিনটি মন্ত্র দান করেছিলেন এবং সে তিনটি মন্ত্র হোল : (১) অক্ষিতমসি, (২) অচ্যুতমসি, (৩) প্রাণসংশিতমসি। এই মন্ত্র-তিনটির অর্থ (১) পরিপূর্ণ, (২) অক্ষয়, ও (৩) প্রাণরূপে সূক্ষ্মতত্ত্ব। কিন্তু উপনিষদের এই পূর্ণ, অক্ষয় ও সূক্ষ্ম প্রাণমন্ত্রের অধিকারী দেবকীপুত্র কৃষ্ণ কে? পণ্ডিত মোক্ষ-মূলার, গ্রিয়ারসন, গার্বে প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এই কৃষ্ণকেই পৌরাণিক গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বলে প্রতিপন্ন করেছেন, কিন্তু অধ্যাপক কিথ, ম্যাকডোনেল প্রভৃতি মনীষীরা এ' মন্তব্য গ্রহণ করেন নি। অধ্যাপক কিথ প্রভৃতির অভিমতে ছান্দোগ্য-উপনিষদে উল্লিখিত 'কৃষ্ণ' ব্রাহ্মণ্যধর্মের বৈর বা বিপরীতধর্মী ক্ষত্রিয়-উপদেষ্টা—"A Kshatriya teacher of morals, as opposed to Brāhminism" ।[৩]

ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবকীপুত্র 'কৃষ্ণ'-সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে মোটামুটি অনুরূপ সিদ্ধান্তই করেছেন। তিনি বলেছেন : "ঋগ্বেদের সূক্তসমূহে এবং অল্পপরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে 'বাসুদেব'-নামটির কোন উল্লেখ না থাকিলেও 'কৃষ্ণ'-নামধারী বিভিন্ন গোত্রীয় ঋষিগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলের ১১৬ এবং ১১৭ সূক্তে

২। Vide, p. 2.

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কে তাঁর *Bhagavad Gita, the Divine Message* গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

৩। স্বর্গত ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে (ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক) আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত)।

বিশ্বকায়ের পিতা ঋষি-কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়, আবার ঐ বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তে অংশুমতীনদীতীরবর্তী জনপদনিবাসী অন্য এক কৃষ্ণ-ঋষির নামের সন্ধান পাই। কৌশিতকীব্রাহ্মণের এক অংশে (৩০।৯) আঙ্গিরসগোত্রীয় এবং ঐতরেয়-আরণ্যকে (৩।২,৬) হারীতগোত্রসম্ভূত দুইজন কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সব কৃষ্ণ-ঋষিগণের সহিত মহাকাব্যোক্ত সাত্বত বা বৃষ্ণিবীর ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।"[৪] শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার, ডঃ রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি মনীষীরা কিন্তু অংশুমতীতীরবাসী কৃষ্ণের সঙ্গে বাসুদেব-কৃষ্ণের ঐক্য স্বীকার করেছেন, কেননা তাঁদের মতে, অংশুমতী এবং যমুনা এক ও অভিন্ন নদী। আবার ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "কিন্তু হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, অংশুমতী ও যমুনা যে বিভিন্ন নদী ইহা 'বৃহদ্দেবতা'-গ্রন্থ হইতে সমর্থিত হয় এবং এজন্য ঋগ্বেদের অন্যতম কৃষ্ণের সহিত মহাকাব্যের বাসুদেব-কৃষ্ণের একীকরণ-সমর্থনযোগ্য নহে।"[৫]

ছান্দোগ্য-উপনিষদের ৩।১৭।৬ মন্ত্রে ঋষি ঘোর-আঙ্গিরসের শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। মহাভারতেও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "উপনিষদোক্ত কৃষ্ণ ও বাসুদেব-কৃষ্ণ যে একই ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কোন কারণ নাই, যেহেতু উভয়েই দেবকীর পুত্র বলিয়া বর্ণিত।" তিনি আরো বলেছেন: "গীতোক্ত ভগবান কৃষ্ণ এবং ছান্দোগ্য-উপনিষদের আঙ্গিরস-শিষ্য কৃষ্ণ যে একই ব্যক্তি উহা উভয়ে কেবল দেবকী-সন্তান বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে না। আঙ্গিরস-গোত্রীয় ঘোর-ঋষির নিকট হইতে কৃষ্ণ যে বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশাবলীর মধ্যে উহা সমস্তই নিহিত আছে।"[৬] ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, অধিকাংশ পাশ্চাত্য

৪। পঞ্চোপাসনা, পৃঃ ৪২-৪৩

৫। ঐ, পৃঃ ৪৩

৬। ঐ পৃঃ ৪৪

৭। *Cf. Materials for the Study of the Early History of the Vaisnava Sect* (2nd ed.), pp. 78-82.

মনীষীরা এ' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। ঋগ্বেদের ১।১৫৪।১—১।১৫৬।১-৬ মন্ত্রগুলির মতো ১।২২।১৮—১৯ মন্ত্রগুলিতেও ব্যাপনশীল 'বিষ্ণু'-র নামের উল্লেখ আছে এবং সেখানে বলা হয়েছে 'বিষ্ণুঃ গোপাঃ'। ঋক্‌মন্ত্র ১।২২।১৮-৯ হোল—

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুঃ গোপাঃ অদাভ্যঃ।
অতো ধর্মানি ধারয়ন্।১৮
বিষ্ণোঃ কর্মানি পশ্যত যতো ব্রতানিপস্পর্শে।
ইন্দ্রস্যযুজ্যঃ সখা।১৯

ভাষ্যকার সায়ণ ১।২২।১৮ ঋক্‌মন্ত্রের প্রসঙ্গে বলেছেন : "অদাভ্যঃকেনাপিহিংসিতুমশক্যঃ গোপাঃ সর্বস্য জগত্যোরক্ষকোবিষ্ণুঃ পৃথিব্যাদিস্থানেসু অত এতেষু ত্রীণি পদানি বিচক্রমে কিংকুর্বন্ * *। গোপাঃ গোপামৃতস্যেত্যত্রোক্তম্।" ১।২২।২০-২১ ঋক্‌মন্ত্র-দুটিতেও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে 'পরম্' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, অনেক পণ্ডিতই 'গোপ'-শব্দটির অর্থ করেছেন গোপালক—'গোপাল' ও 'গোবিন্দ'। এ' সম্বন্ধে আমরা পূর্বেও কিছুটা আলোচনা করেছি। কিন্তু ভাষ্যকার আচার্য সায়ণ ১।১৫৪-১৫৬।৪-৫ ঋক্‌মন্ত্রের অনুরূপ ১।২২।১৮- ৯ ঋক্‌মন্ত্রেরও অর্থ করেছেন —ত্রিবিক্রম বামন-বিষ্ণু। শতপথব্রাহ্মণেও (১।২।৫।৫) বিষ্ণু 'বামন' নামে অভিহিত এবং মহাভারতে (১২।৪৩।১২) কৃষ্ণকেই 'বামন' বলা হয়েছে। বৌধায়নধর্মসূত্রে (২।৫।২৪) বিষ্ণুকে কৃষ্ণ ও বাসুদেবের পরিবর্তে 'গোবিন্দ' বলা হয়েছে। অধ্যাপক কিথ ও ম্যাকডোনেল বলেন যে, ঋগ্বেদের ঐ 'বিষ্ণুঃ গোপাঃ' (১।২২।১৮) মন্ত্রের মধ্যেই বিষ্ণুর 'গোবিন্দ'-নামের বীজ নিহিত রয়েছে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত-কর্তৃক উৎকীর্ণ এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপিতেও 'বিষ্ণু-গোপ' নামের উল্লেখ দেখা যায়। এখানে 'বিষ্ণু' বা 'গোবিন্দ' কৃষ্ণ-বাসুদেব বা কৃষ্ণ নাম থেকে সাধারণত ভিন্ন বলে প্রতীত হলেও বৈদিক সাহিত্যের অনেক জায়গায় এবং পুরাণেও বিষ্ণুকে 'কৃষ্ণ-বাসুদেব' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বনাথের তাম্রলিপির কথা ছেড়ে দিলেও 'চুল্লনির্দেশ' ও 'মহানির্দেশ' নামে দুটি বৌদ্ধ-নির্দেশে স্পষ্টভাবে 'বাসুদেববটিকা' ও 'বলদেববটিকা' নামের উল্লেখ আছে। তাছাড়া সর্বনাথের তাম্রলিপি থেকে প্রমাণ হয় যে, আদিত্য ভট্টারক তথা সূর্যোপাসক

সৌর-সম্প্রদায়ের পাশাপাশি ভগবত বা ভাগবত-সম্প্রদায়েরও অস্তিত্ব ছিল। চুল্লনিদে'শ ও মহানির্দেশ থেকে প্রমাণ হয়, বাসুদেব বা কৃষ্ণ-বাসুদেব ও বলদেব বা সঙ্কর্ষণ-দেবতাদের উপাসক-সম্প্রদায়েরাও বৌদ্ধযুগে তথা খ্রীষ্টপূর্ব যুগে বর্তমান ছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত যে, সাত্বতাদি ভাগবত ও পঞ্চরাত্র-নির্দিষ্ট বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণই খ্রীষ্টীয় শতকে পৌরাণিক যুগে কৃষ্ণ ও বলরাম বা বলদেবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। সুতরাং সকল দিক থেকে বিচার করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বেদের যজ্ঞ-সম্পর্কিত সৌরদেবতা বিষ্ণুই বাসুদেব বা কৃষ্ণ-বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

এ' সম্পর্কে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-লিখিত *A History of Indian Philosophy*, Vol II (1932) গ্রন্থে 'Visnu, Vāsudeva and Krisna' বিষয়ক আলোচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করি। ডক্টর দাশগুপ্ত বলেছেন : 'Visnu, Bhāgavat, Nārāyana Hari and Krishna are often used in a large section of Indian religious literature as synonymous names of the Supreme Lord. Of these, Visnu is an important god of the *Rig-veda* who is one of the *ādityas*, and who makes three strides in the sky, probably as he manifests himself in the eastern horizon, as he rises to the zenith and as he sets in the west. He is also represented in the *Rig-veda* as a great fighter and an ally of Indra. It is further said that he has two earthly steps and another higher step which is known only to himself. But, in the *Rig-vedv*, Visnu is certainly inferior to Indra, with whom he was often associated, as is evident from such names as *Indra-Visnu* (R. V. iv, 55.4 ; vii. 99.5, viii. 10 2, etc.). According to later tradition Visnu was the youngest ,the twelfth of the *ādityas* * *. Again is the *Taittiriya-samhitā*, 1.7.5 4, in the *Vājasaneya-samhitā*, 1.30 ; 1.68 ; V, 21, in the Atharva-veda, V. 16.7, VIII. 5.10. etc. Visnu is referred to as the chief of the gods (*Visnumukhā devā*). * * The word

Vaisnava is used in the literal sense of 'belonging to Visnu' in the *Vājasaneya-samhitā*, 111. 38 ; *Satapatha-brāhmana*, 1. 1. 1,9 ; III. 532, etc., but the use of the word in the sense of sect of religion is ont to be found anywhere in the earlier literature. * * In the *Satapatha-brāhmana*,XIV.3,4. *Purusa* isidentified with *Narayana* ('*nārāyanam prajāpatir uvācha*') * *. The etymological definition of *nārāyana* as 'one who has descended from man (*nara*)' as herein suggested in accordance with Pānini, IV 4,99, is not, however, accepted everywhere. Thus, I, 10, derives *nārāyana* from *nāra* meaning 'water' and *ayana* meaning, abode, and *nāra* (water), again, is explained as 'that which has descended from *nāra*', or supreme man, The *Mahābhārata*, III, 19, 952 and 15 819 and XII 13. 198, accepts Manu's derivation, but in V 2569, it savs that the supreme God is called *nārāyana*, because he is also the refuge of men The *Taittiriya-āranyaka* XI 1 6, identifies *nārāyana* with Vāsudeva and Visnu.

"The word *Bhāgavata*, in the sense of blissful and happy, is a very old one and is used in the *Rig-veda*, 1. 194-40 ; VII. 41, 4 ; X. 60. 12 and other such early literature, it came to denote Visnu or Vāsudeva, and the word *Bhāgavata* denoted the religious sect whieh regarded Visnu as their supreme god, * * ।[৭] মহাভারতে বিষ্ণু বা নারায়ণের কৃষ্ণ, জনার্দন, কেশব, হরি প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই মনে হয় যে, বিষ্ণু, বাসুদেব, হরি, জনার্দন, নারায়ণ প্রভৃতি দেবতা পরবর্তীকালে ও বিশেষ ক'রে শ্রীমদ্ভাগবতে ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীতে কৃষ্ণ-দেবতায় পরিণত বা রূপান্তরিত হয়েছে। পরবর্তী কালে কৃষ্‌ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ থেকে সর্বধারক ও সর্বপালক 'কৃষ্ণ' বা শ্রীকৃষ্ণ-শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল।

৭। *A History of Indian Philosophy*, Vol. II (1932) pp. 535-44.



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

।। কীর্তনের প্রাণকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ।।

অষ্টাধ্যায়ীকার পাণিনি (খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতক), মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি (খ্রীষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক) থেকে আরম্ভ ক'রে মহাভারত (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০)-সংকলয়িতা ব্যাস পর্যন্ত সকলেই কংসের নিধনকারী শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেছেন। পতঞ্জলি[১] তাঁর মহাভাষ্যে 'কংসবধ'-নাটকের উল্লেখ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কংস ও কৃষ্ণের ভূমিকায় নটদের মুখে কিভাবে লালরঙ ও কালোরঙ মাখানো হোত তার বর্ণনা করেছেন। শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর ইংরাজী 'পতঞ্জলি'-নিবন্ধে লিখেছেন: "Patanjali has clearly shown how the incidents of *Kamsha-badha* and *Bāli-badha* formed the subject of theatrical representations, and he particularly states how the actors, representing the sides of *Kamsha* and *Krishna*, besmeared their faces with black and reddish tinge respecting"।[২] পাতঞ্জল-মহাভাষ্যে কংস ও কৃষ্ণের উল্লেখ থাকায় পতঞ্জলি যে কংসনিধনকারী কৃষ্ণের শৌর্য-বীর্য-মহিমা অবগত ছিলেন সেকথা বোঝা যায়। মোটকথা অভিনয়ে বাসুদেব বা কৃষ্ণ কংসরাজকে নিহত করলে বাসুদেবের অনুচরগণ উল্লসিত ও কংসরাজের অনুচরগণ মুহ্যমান হয়েছিল

১। যোগদর্শনকার পতঞ্জলি এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এক ব্যক্তি নন এটি অনেক পণ্ডিতের অভিমত।

২। *Cf. The Indian Historical Quarterly*. Vol. II. December, 1926. p. 751.

এ'কথাই ভাষ্যে পতঞ্জলি বলতে চেয়েছেন। মৌর্য ও গুপ্তযুগে (খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৭—খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক) ও বিশেষ ক'রে গুপ্তযুগের শিল্পে ও ভাস্কর্যে শ্রীকৃষ্ণের গোপীলীলা ও গোবর্ধনগিরি-ধারণকাহিনীর অভাব নাই। পাল রাজাদের সময়ে পাহাড়পুর-মন্দিরের ভিত্তিচিত্রাবলীতে কৃষ্ণলীলাকাহিনীর সাক্ষ্য পাওয়া যায় এবং আরও পাওয়া যায় 'রাধা', 'সত্যভামা', 'উৎকণ্ঠিত মাধব'-প্রভৃতি নামাবলীর। দক্ষিণ-ভারতে ভাগবতধর্মের প্রবর্তন হয় সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতকের গোড়ার দিকে। যজ্ঞ-শাতকর্ণির সময় চীনা-প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে ভাগবতধর্ম কৃষ্ণাজেলায় বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল। 'শিলপ্পাধিকরম্' প্রভৃতি তামিল-নাটকে মাদুরা, কাবিরিপদ্দিনম্ ও অন্যান্য সহরে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট মন্দিরের নিদর্শন বিরল নয়। দক্ষিণ-ভারতে ভাগবতধর্ম-বিস্তারের কাহিনী ভাগবতপুরাণেও উল্লেখ আছে। বৈষ্ণবধর্মের বাহক ও ধারক-রূপে আল্‌বারের (আড্‌বার বা আলোয়ার) নাম দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। ভাগবতধর্মের সাধক বা ভগবদ্‌প্রেমিকদের বলা হোত 'আল্‌বার' বা আড়্‌বার। সেই সাধকদের মধ্যে জাতি ও বর্ণের কোন বিচার ছিল না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ভক্তিপথের সাধক ও সাধিকা হতে পারতেন। এরা 'দিব্যপ্রবন্ধ' বা কৃষ্ণ-ভগবানের কীর্তিগাথাযুক্ত অসংখ্য পদগীতি বা কীর্তন রচনা করেছেন। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকে আচার্য নাথমুনি সে সকল পদগান বা কীর্তন সংকলন ক'রে সর্বসাধারণের সমাজে প্রচার করেন। কাঞ্চী, মহাবলীপুরম্, ও ময়লাপুর-অঞ্চলেও আল্‌বারদের প্রাচীন তিনজন সাধক ও প্রচারক নাকি বাস করতেন। এঁরা নারায়ণকেই আদি ও পরম দেবতা বলে গণ্য করতেন এবং বিশেষ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপ ত্রিবিক্রমকে শ্রদ্ধা ও পূজা করতেন।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'রাধার ক্রমবিকাশ—দর্শন ও সাহিত্য'-গ্রন্থে আল্‌বারদের প্রসঙ্গে লিখেছেন : "এই আল্‌বারগণ কখন আবির্ভূত হইয়াছেন এ'বিষয়ে নানা মতানৈক্য রহিয়াছে, কিন্তু মোটামুটিভাবে এই রাগমার্গে ভজনশীল বৈষ্ণবগণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে নবম শতকের ভিতরে বিভিন্ন-কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই আল্‌বারগণ নিজদিগকে নায়িকা এবং বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে নায়ক মনে করিয়া

রাগমার্গে ভজনা করিতেন। তাঁহাদের এই ভজন-সংগীতগুলির চারি সহস্র সংগীতযুক্ত 'দিব্যপ্রবন্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। আল্‌বারগণ দিব্যভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর যে-সকল বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভারতের বহুস্থানেই বিষ্ণুর কৃষ্ণ-অবতারে বৃন্দাবনলীলায় নানাভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। অন্যান্য বহু বহু লীলার সহিত গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলারও অনেক স্থানে নানা-ভাবে উল্লেখ রহিয়াছে।"[৩]

আল্‌বারদেব পরেই দক্ষিণ-ভারতে বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক-রূপে বিভিন্ন আচার্যদের নাম উল্লেখযোগ্য। তামিলীয় বৈষ্ণবধর্মে তত্ত্ববিচার ও জ্ঞানের দিকটাই ভক্ত সাধকেরা বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন। নাথমুনি বা রঙ্গ-নাথাচার্য এই আচার্যদের প্রধান ও প্রথম গুরু। সম্ভবত ১১শ শতকে ত্রিচিন-পল্লীর কাছে শ্রীরঙ্গমে তিনি বাস কবতেন। নাথমুনি তাঁর 'ন্যায়তত্ত্ব'-গ্রন্থে যে ভাগবতপ্রপত্তিধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন তা গীতা ও পঞ্চরাত্রতন্ত্রের মূলতত্ত্ব থেকে মোটেই পৃথক নয়। মোটকথা তিনি তামিল-ভারতে বৈষ্ণবধর্মের এক নব-চেতনার উদ্বোধন করেছিলেন।[৪] তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায় দক্ষিণ-ভারতে এখনো বর্তমান আছে। তাছাড়া আচার্য পুণ্ডরীকাক্ষ, রামমিশ্র, যমুনাচার্য প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতের বৈষ্ণবাচার্যদের নাম উল্লেখযোগ্য। যমুনাচার্য-কৃত 'সিদ্ধিত্রয়' বা 'আত্মসিদ্ধি', 'ঈশ্বরসিদ্ধি' 'সম্বিৎসিদ্ধি' সাধক রঙ্গ-রামানুজকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। নাথমুনি 'আগমপ্রামাণ্য'-গ্রন্থে ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়েব মতবাদের সাহায্যে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত-বাদকেও খণ্ডন করেছেন। দক্ষিণী বৈষ্ণবাচার্য বেদান্তদেশিকও যমুনাচার্যের মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক ফার্কুহার বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টিই নাকি দ্রাবিড়দেশে তথা দক্ষিণ-ভারতে, আর তারি জন্য ভাগবতধর্মে বিশেষভাবে প্রেরণা লাভ

৩। পৃঃ ১১১। তাছাড়া গোবিন্দাচায-কৃত (1) *The Divine Wisdom of the Dravida-Saints*, (2) *The Holy Lives of the Alvars* (3) গোপীনাথজিউ-কৃত *Sir Subrvh-manya Ayyar Lectures (1923)*; (4) এস. কে. আয়েঙ্গার-কৃত *Early History of Vasnavism in South India*, (5) J. S. M. Hooper-কৃত *Hymns of the the Alvars* গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

৪। *Cf. An Outline of the Religious Leterature of India* (Oxford, 1926). p. 232.

করেছিলেন যমুনাচার্য, রঙ্গ-রামানুজ প্রভৃতি বিদগ্ধ বৈষ্ণবাচার্য এবং পরবর্তী-কালে উত্তর-ভারতেও সংক্রমিত হয়েছিল সেই ভাগবতধর্মের প্রভাব।

এই মতের কোন কোন সমর্থক বলেন, চেদীরাজ কর্ণদেবই দক্ষিণদেশ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্ম বিশেষভাবে বাঙলাদেশে প্রবর্তন করেন—যার ফলে সেন রাজারাও বৈষ্ণবধর্মের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং তার প্রমাণও ভিন্ন ভিন্ন তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ফারকুহার ও তাঁর অনুবর্তীরা এই অভিমত পোষণ করেন। তবে তাঁদের এই মতের প্রামাণিকতা কতটুকু তা বিচারের বিষয়। কেননা শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের (১৪৫৬-১৫৩৩) বহুপূর্বেই উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ স্থানে ভাগবত-ধর্মের সমধিক প্রচার ও প্রসার ছিল এবং সেই ভাগবতধর্মের ক্রমপ্রসারণের ফলে বেদের বিষ্ণুদেবতা ও খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে কৃষ্ণ-বাসুদেবই পরবর্তী যুগে নন্দগোপসুত চিরকিশোর বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণে পরিণত বা রূপান্তরিত হয়েছিলেন মনে হয়। তাছাড়া দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য-দেব ভাগবতভাববিদগ্ধ 'ব্রহ্মসংহিতা' ও লীলাশুকের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' ভক্তি-গ্রন্থদুটির কিছু কিছু অংশ সংগ্রহ ক'রে বাঙলাদেশে (পুরীতে) এনেছিলেন।

নারদভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্রের ভক্তিবাদই খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের শেষ পর্যন্ত যে সমানভাবে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল সেকথা পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। হরিবংশে এবং বিষ্ণু, পদ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি পুরাণে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলাবিলাস অঙ্কুরাকারে নিহিত ছিল, শ্রীমদ্ভাগবতে সে বিলাসই ফুল-ফল-সুশোভিত বৃক্ষে পরিণত হয়ে প্রকাশ পায়। তাছাড়া মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র লীলামাধুর্যের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে দেখি শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের অপ্রাকৃত বাল্য ও যৌবনলীলার বিলাস। গীতার শ্রীকৃষ্ণলীলা থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলা বেশ কিছুটা পৃথকভাবে বিকাশ লাভ করেছিল, কেননা শ্রীমদ্ভাগ-বতের কৃষ্ণলীলায় যেখানে শৈশব-কারুণ্যের সরল মাধুর্য প্রকাশিত, গীতার শ্রীকৃষ্ণে সেখানে ক্ষাত্রবীর্য ও পুরুষত্বের সঙ্গে সঙ্গে কোমল-কঠোর ভাবের প্রকাশই সমধিক। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই অভিমত পোষণ করেন।

এই অভিমত ডক্টর সুশীলকুমার দে এবং ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অভি-মতের অনুরূপ; ডক্টর দে বলেছেন: "The *Srimad-bhāgavata* is indeed

the one great *Purāna* which appears to have exercised an enormous influence on the development of Bhakti ideas in mediaeval times. No satifactory theory of its date and origin has yet been advanced, but there can be no doubt that its emergence marks a turning point in the history of the Vaisnava faith, and that a whole series of sects, who take it as their leading scripture, appears in a sense to have been born out of this remarkable work. Contrasted with the *Harivamsa* and the *Visnu-purāna*, the *Bhāgavata* scarcely deals with the whole life of Krishna, but concentrates all its strength upon his boyhood and youth. With the youthful Krishna at the centre, it weaves its peculiar theory and practice of intensely personal and passonate Bhakti, which is somewhat deferent from the speculation Bhakti of the *Bhagavad-Gita*."[৫]

পরবর্তী (খ্রীষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতক) বৈষ্ণবধর্মে বৃন্দাবনলীলায় কিশোর শ্রীকৃষ্ণ ও কিশোরী শ্রীরাধার অপ্রাকৃত প্রেমের মাধুর্যময়ী লীলাকাহিনী বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে যে 'রাধা' প্রচ্ছন্নভাবে থেকেও শ্রীকৃষ্ণের একান্ত সোহাগিনী গোপীর স্থান অধিকার করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যের সময়ে ও চৈতন্যোত্তরকালে বৈষ্ণব-সাধকসমাজে তিনিই হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার কেবলই প্রধানা সহচরী নন, শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাও লাভ করেছিলেন তিনি শ্রদ্ধার আসন। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন: "আমরা জানি যে, শ্রীচৈতন্য রাধা-কৃষ্ণকাহিনীতে একটু বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করেছিলেন, রাধাকে কৃষ্ণের চেয়ে বড় ক'রে ধরেছিলেন, মথুরা ও দ্বারকালীলার অনেক ঊর্ধ্বে বৃন্দাবনলীলা—এ'তত্ত্ব তিনি (বা তাঁর মুখ্য ভক্তেরা) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।"

ডক্টর সেন তাঁর বক্তব্য আরো পরিষ্কার ক'রে বলেছেন 'বলরামদাসের

৫। *Cf.* Dr. Dey: ***Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal*** (Calcutta. 1942) p. 5. Cf. also Dr. B. N. Dutta: ***Rise of Gaudiya Vaishnavism in Bengal***, Prachyavani, vol. II, July-October, 1945, pp. 161-171

পদাবলী'-গ্রন্থের[৬] ভূমিকায়ঃ "গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিলাস, মনে হয়, বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত ছিল প্রথমে মেয়েলি ও পরে সাধারণ লোক-গীতে। লোকগীতের মধ্যে দিয়েই কৃষ্ণের প্রেয়সী গোপী 'রাধা' নামে চিহ্নিত হন। 'রাধা'-শব্দটি আসলে সাধারণ বিশেষ্য-শব্দ ব্যক্তিবিশেষের নাম হয়। আরাধ্য অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত প্রেয়সী নারী—ইহাই 'রাধা'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ রক্ষিত আছে রাধাচক্রের রাধায়। যে চক্র ভেদ করলে রাধা অর্থাৎ ইষ্টনারী পাওয়া যায় তাহাই 'রাধাচক্র'। এর পুংলিঙ্গ-রূপ 'রাধ' সংস্কৃতে পাওয়া যায় নি, পাওয়া গেছে আবেস্তীয়। সেখানে অর্থ আরাধ্য অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় বা পতি। ক্লীবলিঙ্গে এর রূপ ছিল 'রাধস্',—অর্থ আরাধ্য অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বা উপহার। প্রথমে কৃষ্ণের প্রেয়সী রাধা বলতে কোন নির্দিষ্ট একটি গোপীকে বোঝাতো না, যখন সে কৃষ্ণের প্রিয়া তখন সেইই রাধা।[৭] কৃষ্ণলীলার বিবর্তনে পরে যখন দেখা গেল যে, কৃষ্ণের বিশেষ পছন্দে বিশেষ একটি গোপীরেই—যাকে নিয়ে তিনি রাসমণ্ডলী থেকে অন্তর্গত হয়েছিলেন, তারেই রাধা বলা হোল। ভাগবতে গোপীরা খেদ ক'রে বলেছে—

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ॥

তারপরে এটি তাঁর নামে হোয়ে দাঁড়াল, যদিও পুরানো অর্থ একেবারে লুপ্ত হোল না।"

কোন সৌভাগ্যবতী রমণী-কর্তৃক ভগবান ঈশ্বর হরি আরাধিত বা পূজিত হয়েছেন এবং এজন্য শ্রীগোবিন্দ গোপীগণকে পরিত্যাগ ক'রে সেই রমণীকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করেছেন। গোস্বামী-মহাজনগণ 'অনয়া রাধিতঃ' শব্দটির

৬। ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য-সম্পাদিত।

৭। পঞ্চরাত্রে 'রাধা'-শব্দের ব্যুৎপত্তি এভাবে দেওয়া হয়েছে—

রা-শব্দোচ্চারনাদ্ ভক্তো ভক্তিং মুক্তিঞ্চ রাতি সঃ।
ধা-শব্দোচ্চারণেনৈব ধাবত্যের হরেঃ পদম্ ॥২।৩।৩৮

'রা'-শব্দ উচ্চারণ করলে 'ভক্ত' পদবাচ্য হয় এবং সে ভক্তি ও মুক্তি লাভ করে এবং 'ধা'-শব্দ উচ্চারণ করলে হরির পদে ধাবিত হয়। অবশ্য এই ব্যুৎপত্তি-নির্ধারণের রীতি প্রাচীন কিনা সন্দেহ। 'রাধা-শব্দের একটি আধুনিক ব্যাখ্যায় দেখি, 'রা' শব্দ দ্বিবচনান্ত, সুতরাং রাধা ও কৃষ্ণ এবং 'ধা' শব্দে 'ধাবিত', সুতরাং 'রাধা' একটি শব্দেই রাধা-কৃষ্ণের সান্নিধ্য সার্থক হয়।

মধ্যে শ্রীরাধার সন্ধান লাভ করেছেন। বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতপুরাণে রাস-লীলা-বর্ণনায় অনুরূপ একটি শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্লোকটি হোল—

অত্রোপবিশ্য যা তেন বাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চিতো ময়া॥ ১৩।৩৪

'এখানে উপবিষ্ট সেই রমণী শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কোন পুষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃতা হয়েছে, কেননা সেই রমণী দ্বারা অন্য জন্মে সর্বাত্মা বিষ্ণু অভ্যর্থিত বা পূজিত হয়েছেন।' এখানে পাই 'রাধিত' বা 'আরাধিত' শব্দের পরিবর্তে 'অভ্যর্থিত' শব্দ।[৮] শ্রদ্ধেয় সনাতন গোস্বামী ও জীব গোস্বামীকে অনুসরণ ক'রে গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখেছেন,

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে।—আদিলীলা।৪

আসলে শ্রদ্ধের সনাতন, জীব, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি গোস্বামীগণ পদ্মপুরাণের 'যথা রাধা পিয়া (প্রিয়া?) বিষ্ণোঃ' প্রভৃতি শ্লোক থেকে 'রাধা'-সংগ্রহ করেছেন। তাছাডা পদ্মপুরাণের বহু স্থানেও 'রাধা'-নামের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত 'রাধার ক্রমবিকাশ'—দর্শন ও সাহিত্য'-গ্রন্থে এ'প্রসঙ্গে লিখেছেন: "পদ্মপুরাণে গোপীগণসহ বৃন্দাবনলীলার কোন বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই রাধার উল্লেখ পাইতেছি না; প্রায় উল্লেখই এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে পাইতেছি। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে জয়ন্তীব্রতমাহাত্ম্য-খ্যাপনপ্রসঙ্গে একবার রাধাষ্টমীব্রতের উল্লেখ পাই (বঙ্গবাসী সংস্করণ ৩৭।২৮,৪৪)। তৎপরে চত্বারিংশ সর্গে রাধাষ্টমীব্রতের মাহাত্মাই আখ্যাত হইয়াছে। * * পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে রাধার বহুভাবে উল্লেখ পাই।" পদ্মপুরাণের ৩৯শ অধ্যায়ে বৃন্দাবনে বালকৃষ্ণের উল্লেখও আছে। পদ্মপুরাণের রচনাবলী[৯] অনেকের মতে, আনুমানিক ৬ষ্ঠ-৮ম শতক, সুতরাং পদ্মপুরাণে বৃন্দাবনে বাল-কৃষ্ণের উল্লেখ অনেকের মতে বেশ সন্দেহজনক।

৮। ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত: শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শন ও সাহিত্য' (১৩৫৯), পৃঃ ১০১

৯। (ক) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শন ও সাহিত্য' পৃঃ ১০১
(খ) ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার: 'ষোড়শ-শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য' (১৯৬১), পৃঃ ১৭১—১৭৭

কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-পদগানে 'রাধা' ও 'রাধিকা' শব্দের উল্লেখ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। জয়দেবের সমসাময়িক কবি গোবর্ধনাচার্যও শ্রীরাধার পূর্বরাগ-সম্পর্কে একটি শ্লোক লিখেছেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামী 'পদ্যবলী' গ্রন্থে সে' শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া জয়দেবের সমসাময়িক কবি উমাপতিধরের 'রাধা'-সম্পর্কীয় একটি শ্লোকও শ্রীরূপ গোস্বামী 'পদ্যাবলী' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন এবং দেখা যায় যে, সেই শ্লোকে লক্ষ্মীদেবী, রুক্মিণীদেবী ও সত্যভামা অপেক্ষা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের 'অধিক প্রিয়' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীধরদাসও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-গ্রন্থে রাধার নামোল্লেখ করেছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রপারগ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার এ' প্রসঙ্গে লিখেছেন : "সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত রূপদেব নামে একজন কবির একটি শ্লোকে আছে : "এই জলবেতসের নিকুঞ্জের মাঝামাঝি স্থানে কোন রমনীর' জন্য কচিপল্লব দিয়া বিজনে শয্যা রচিত হইয়াছে? বৃন্দা অন্যান্য স্ত্রীগণকে এই কথা বলিলে রাধা ও মাধবের স্মিতহাস্যের দ্বারা বিচিত্রিত সে অবলোকন তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক' (১।৫৫।১)। বৃন্দাদেবীর সহিত রাধা-কৃষ্ণলীলার সম্বন্ধ যে অন্তত দ্বাদশ শতাব্দী হইতে তাহা ইহার দ্বারা প্রমাণিত বেতসকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মিলনের কথা প্রাচীন কিম্বদন্তীতে ছিল। জয়দেবের বহুস্থানে (১।৪৪,৪।১,৭।৯,৭।১১) বেতসকুঞ্জের উল্লেখ আছে। তাই শ্রীচৈতন্যদেব 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকের 'রেবারোধসি বেতসীতরুতলে বেতঃ সমুৎকণ্ঠতে' শুনিয়া পরমানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন (শ্রীচৈতচরিতামৃত ৩।১)। ষোড়শ শতাব্দীতে ও তাহার পরবর্তীকালে অবশ্য পদকর্তারা কেহ বেতস-কুঞ্জেও রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটান নাই, তাঁহারা মাধবীকুঞ্জই নির্বাচন করিয়াছেন।"[১০]

মধ্যযুগে বল্লভাচারী ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায় 'রাধা'-শব্দের অর্থ করেছেন শ্রীকৃষ্ণশক্তি; অর্থাৎ শ্রীরাধা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলার চিরসঙ্গিনী। আচার্য নিম্বার্ক 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ'-ভাষ্যগ্রন্থে শ্রীরাধা বা শ্রীরাধিকাকে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র অচিন্ত্য শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তিনি 'প্রাতঃস্মরণ', 'রাধাষ্টক', প্রভৃতি স্তোত্রে বা রচনায় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মহিমা

১০। ডক্টর মজুমদার : 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য' (১৯৬১). পৃঃ ১৬৯

বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিচারবিলাসী মাধ্ব-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের বিরোধী ছিলেন, সেজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণলীলাকে তাঁরা গৌণ এবং তার দার্শনিক তত্ত্বই মুখ্য বা প্রধান বলেছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সময়ে বৃন্দাবনলীলাই প্রাধান্য পেয়েছিল বিশেষভাবে এবং শ্রীরাধা হয়েছিলেন তখন পরমারাধ্যা ও উপাস্যতত্ত্ব এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপই পরিগণিত হয়েছিল ভক্তিসাধনদৃষ্টির পরাকাষ্ঠা-রূপে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে বৃন্দাবনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগোস্বামীরা শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে পুনরায় তত্ত্বরূপেই প্রচার করেছিলেন। পরমভাগবত জীব-গোস্বামী 'তত্ত্বসন্দর্ভ', 'প্রীতিসন্দর্ভ' প্রভৃতি দর্শনগ্রন্থে বিশেষ ক'রে শ্রীরাধাকে পরমতত্ত্বরূপে বর্ণনা করেছেন। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'রাধার ক্রমবিকাশ—দর্শন ও সাহিত্য'-গ্রন্থে এ' সম্পর্কে বলেছেন: জীব-গোস্বামী-কৃত 'তত্ত্বসন্দর্ভ', 'ভগবৎসন্দর্ভ', 'পরমসন্দর্ভ', 'কৃষ্ণসন্দর্ভ', 'ভক্তিসন্দর্ভ' ও 'প্রীতিসন্দর্ভ' এই ছয়খানি সন্দর্ভের ভিতর দিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সকল মতবাদ—রাধাবাদের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা।"[১] বৈষ্ণব-গোস্বামীদের এই রাধাতত্ত্ব শক্তিতত্ত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং এই শক্তিতত্ত্বও পূর্ব-পূর্ব বিদগ্ধ আচার্য ও শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত পরমাত্মতত্ত্ব—ভগবত্তত্ত্ব—ব্রহ্মতত্ত্বের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে,

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তং ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

এই পরমতত্ত্বই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অদ্বয়তত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা সেখানে শক্তিতন্ত্রের মিথুনাত্মক শিবশক্তিসামরস্যেরই প্রতিচ্ছবি। ডক্টর শ্রীসুশীল কুমার দে এ' সম্পর্কে বলেছেন: "The Vaisnava Sakti-tattva, the acceptance of Kāmā-gāyatri, and the idea of Rādhā as the Sakti or Energy of Krishna, point probably to Tāntric influence, both romote and direct. Quotations from Tantra works are scattered throughout the standard Vaisnava treatises of Rupa, Jiva and other authoritative theorists of the Bengal School. It is not surpising, therefore, that Rādhā figures in a Tāntric light in such later Vaisnava Tantras as the *Nārada-Panchātra*, and

১। পৃ: ১৮০

Rupa Gosvāmin in his *Ujjala-Nilamani* declares that Rādhā is already established in the Tantra (*'tantre pratisthitā'*) as the Hlādini Mahāsakti of Krishna" ।[১২]

১২। *Cf. Early History of the Vaisnava Eaith and Movement* (1942). pp. 21—22.



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

॥ বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের প্রাণতত্ত্ব ॥

এক

উল্লেখযোগ্য যে, কবি জয়দেব গীতগোবিন্দে 'রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ' (১।১০), 'রাসবসে-সহনৃত্যপরা হরিনা' (১।৪৫) প্রভৃতি কৃষ্ণের দিব্যসহচারিণী বা লীলাসঙ্গিনী-রূপে নির্বিচারে 'রাধা' বা 'রাধিকা' শব্দ ব্যবহার করেছেন প্রধানা গোপীর পরিবর্তে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও অন্যান্য প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যেও 'রাই,' 'রাহী', 'রাধা' এবং 'কিশোরী' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, কিন্তু বিকাশধারার দিক থেকে রাধা ও রাধিকা শব্দ-দুটির মধ্যে বেশ পূর্বাপর ভাবের সামঞ্জস্য আছে। যেমন, চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পাই—

(১) রাই, তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি।

(২) প্রেমেতে রাধিকা স্নেহেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাকান্ত নাম
পেয়েছি অনেক আশে।

(৩) উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।

কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী চরণ সার।[১]

এক্ষণে 'রাধা'-শব্দের অর্থ-সার্থকতা কতটুকু তা দেখার বিষয়। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এ'সম্বন্ধে বলেছেন: "রাধা-শব্দটি অর্থ ও ব্যবহার দু'দিক দিয়েই প্রাচীনতব। যাকে রাধন করা হয়,খাওয়া হয় —সে রাধা। 'রাধিকা' -শব্দটি অর্বাচীন, সংস্কৃতে বোধকরি দ্বাদশ শতাব্দীব আগে পাই না; প্রাকৃতে আবও তিন চারশো' বছব আগে মিলছে। শব্দটি যদি প্রাকৃত থেকে সংস্কৃতে এসে থাকে তবে এটি রাধা-শব্দেরই রূপান্তর ক্ষুদ্রার্থক বা স্নেহদ্যোতক 'ইক্' বিভক্তি যোগে। আর যদি সংস্কৃতে সৃষ্টি হযে থাকে তবে এটি হবে রাধক-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, আর অর্থ হবে, যে নারী রাধনা কবে—যে চায়। এ' ব্যুৎপত্তি স্বীকাব করলে রাধা ও রাধিকাব পার্থক্য স্পষ্ট করে বোঝা যাবে কালিদাসেব এই উক্তি থেকে—'ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ'। রাধিকা অন্বেষণ করে, রাধা অনিষ্ট হয়। * * একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী কিংবা তার কিছু আগে থেকে কৃষ্ণেব প্রেমলীলা একটু নতুন দৃষ্টিতে দেখা হতে লাগল। আগেকার সাহিত্যে গোপীদের প্রেমে কৃষ্ণ চতুব নায়ক, পথভ্রান্ত মধুকর মাত্র, সময় হলেই তিনি উড়ে পালালেন, আর কোন সম্বন্ধ রইল না তাঁর ব্রজের সঙ্গে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে দেখা গেল যে, দ্বারকায় ঐশ্বর্যবিলাসেব মধ্যে থেকে কৃষ্ণের চিত্ত থেকে থেকে উন্মনা হয় কৈশোরের সেই দিনগুলির জন্যে, রাধার জন্যে।"

'রাধা'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের নির্ণয় করে ডক্টব শ্রীসেন ***Indian Linguistics***, (Vol. VIII) 'The Etymology of the Name 'Rādhā' নামে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন: "The name Rādhā, the chief beloved *Gopi* of Krishna, does not occur in the older Purānas, e.g.in the ***Harivamsha***, the ***Vāyupurāna***,and the ***Bhāgavata-purāna***,where the Krishna legend has been elaboratary described. In secular literature, however, it occurs as early as seventh or the eighth century : it occurs in ***Gāthā-Saptasati*** (I' 89), and in Ananda-vardhana's ***Dhvanyāloka***

১। নীলবতন মুখোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' দ্রষ্টব্য।

(2, 6). The *Bhāgavata*, while mentioning *Gopi*, whom Krishna took aside during *Rāsa* dance, says : ***anayārādhito nunam bhagavan haririsvarah*** (X, 30. 28) ,[2] from this comes the traditional derivation of the word Rādhā 'who worship or placates.'

"The word *Rādhā* must have once became a common noun, and the meaning was 'beloved, a desired woman' Its neuter counterpart *Rādhas*', 'a desired object, a gift', occurs in Vedic and the masculine cognate appears in Avestan *Raoa* i e. 'lover', 'a desired husband', e.g.—

বাঙ্গালা— হওমো তাওস্-চিৎ যাও কইনীনো
ঁআংহইবে দবঘম্ অগবাবো।
হইতীম্ বাদম-চ বকষ ইতি
মোষু জইঘ্যো হুক্রতুমা ॥

সংস্কৃত অনুবাদ— সোমঃ তাশ্চিৎ যাঃ কন্যকাঃ
আসিবে দীর্ঘম্ অশ্রুবঃ।
সত্যং বাধং ব ভক্ষতি
মোক্ষু গদ্যমানং স্বক্রতুঃ ॥

'Those maidens who have remained husbandless for a long time, to them the wise Haomo, being entreated, soon give faithful lovers (husbands)', [Yasna 9. verse 10"][3]

ডক্টর সুকুমার সেন 'রাধা'-সম্বন্ধে মন্তব্য করার প্রসঙ্গে সেনরাজ-কবি উমাপতিধরের 'রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া * * রাধাকেলিভ-পরিমলধ্যানমূর্ছা মুরারেঃ' এই শ্লোক-সম্পর্কে বলেছেন, রাধার আধিদৈবিক উন্নয়নে এই প্রথম ধাপ। শেষ ধাপ শ্রীচৈতন্যের বিরহোন্মত্ত রূপ। পদাবলী-সাহিত্যে 'রাধা'-শব্দ ও তার অর্থ-সার্থকতার ক্রমবিকাশ কিংবা রাধা-রূপের ক্রমপরিণতি বেশ লক্ষ্য করার বিষয়। অবশ্য পরম ও চরম-তত্ত্ব রূপে শ্রীরাধার স্থান ও চিন্তা যে পার্থিব জগতের অনেক উচ্চে তার কিছুটা

২। পূর্বে এ' সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

৩। অন্যত্রও তিনি এ' ধরনের মন্তব্য করেছেন।

আভাস পূর্বে দিয়েছি। বৈষ্ণব-কবিচিন্তার পূর্বাপর বিকাশকাহিনী-রূপে চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যোত্তর পদাবলী-সাহিত্যে 'রাধা'-শব্দের প্রয়োগ ও বিকাশের যে বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য আছে তা স্বীকার্য। চৈতন্যপূর্ব পদাবলীতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের উচ্চেও নয়, নিম্নেও নয়, বরং সমান আসনেই অধিষ্ঠিত। কিন্তু চৈতন্যোত্তর পদাবলীতে শ্রীরাধার স্থান ও গৌরব শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকেও অতিক্রম করেছে, অর্থাৎ শ্রীরাধা সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা সচল ও মহান। মোটকথা শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের পর থেকে আজ-পর্যন্ত বৈষ্ণব-পদাবলীতে কোন পরিবর্তন দেখা না দিলেও ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে পদাবলীসাহিত্যে শ্রীরাধার বিকাশ শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুর শ্রীচৈতন্যের রূপ নিয়ে অন্ততঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধকেরা শ্রীচৈতন্যকে গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরাধারই অঙ্গদ্যুতি-রূপে, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের খোলে (শরীরে) শ্রীরাধার প্রকাশ। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে এ'তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন।[8] সুতরাং পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মচিন্তায় শ্রীরাধার সজীবতা পূর্ণ-সার্থকতার পাদপীঠে উন্নীত হয়েছিল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তাছাড়া চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব-দার্শনিকেরা যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণদর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন বৌদ্ধিক যুক্তিজালের আশ্রয় নিয়ে, তখন ব্রহ্মের সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তিত্রয়ের কল্পনা করেছিলেন সগুণব্রহ্ম-সত্তার প্রতিপাদক অপার্থিব গুণত্রয় সৎ, চিৎ ও আনন্দকে উপলক্ষ্য ক'রে। "ঈশ্বর সৎস্বরূপ হইয়াও যে শক্তির দ্বারা স্বয়ং সত্ত্ব ধারণ করেন এবং অন্যান্য সকলকে ধারণ করেন, সেই সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বদ্রব্যে ব্যাপ্ত

৪। তিনি 'বিদগ্ধমাধব' (১২) থেকে প্রমাণ্য দিয়েছেন—

হরিপুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতি বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামীকৃত কড়চা থেকেও তিনি প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবিপুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা ৪-৫

শক্তিকে 'সন্ধিনী' বলা হয়। 'হ্লাদিনী' বা আনন্দদায়িনী শক্তি যাহার দ্বারা ভগবান স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও নিজে আনন্দ-আস্বাদন করেন। শ্রীরাধা হ্লাদিনী শক্তি।"[৫] শ্রীচৈতন্যেব সমসাময়িক ও বিশেষ ক'রে শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী বৈষ্ণবাচার্যেরা ব্রহ্মশক্তি ও 'রাধা'-সম্বন্ধে এ' রকম ব্যাখ্যাই করেছেন। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদাস-কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে (১।৪) এই ব্যাখ্যা বা অর্থেব পবিচয় দিয়ে বলেছেন—

সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণেব স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁব ধরে তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥

শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'বে এই তিন শক্তির বিকাশ সম্ভব হলেও পববর্তী বৈষ্ণবাচার্যেবা যখন শ্রীচৈতন্যেব মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বাধাব অন্তর্নিবেশ কবেন তখন গোড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনতত্ত্বের রূপ আর একটি অভিনব তত্ত্ব ও অর্থ নিয়ে বিকাশ লাভ কবে। নীলাচলের শ্রীচৈতন্য-পবিকরদের মধ্যে—বিশেষভাবে বাসুদেব সার্বভৌম, বায় বামানন্দ, স্বরূপ-দামোদর, রাজা প্রতাপ-রুদ্রদেব, এবং বৃন্দাবন-মণ্ডলের প্রথম স্তবেব পরিকববৃন্দ সনাতন-গোস্বামী, রূপ-গোস্বামী, গোপালভট্ট-গোস্বামী প্রভৃতি অপেক্ষা বৃন্দাবনমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরের বিদগ্ধ বৈষ্ণবসাধক জীব-গোস্বামী, কৃষ্ণদাস-কবিরাজ, রাঘব-পণ্ডিত প্রভৃতি পববর্তী পরিকবগণের সময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিন্ন রূপ শ্রীচৈতন্যকেন্দ্রিক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব আরো উন্নত আকার ধারণ করেছিল। অবশ্য পদাবলীকীর্তনের প্রসঙ্গে এ' গ্রন্থের পরবর্তী ভাগে শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর সমসাময়িক ও তাঁর পববর্তী বৈষ্ণবসমাজ ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আলোচনার সময়ে এ'সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে অনুশীলন করার চেষ্টা করবো। পদাবলীকীর্তনের প্রতিষ্ঠা, প্রাণ বা অধিষ্ঠান একমাত্র পঞ্চরাত্রসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণাদি গ্রন্থ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণ-লিখিত বিভিন্ন দর্শন-গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় আচার্য যমুনাচার্য, রঙ্গ-রামানুজ ও নাথমুনি প্রভৃতির অনুসারী হলেও তা বিশেষভাবে শ্রীজীব-গোস্বামী ও শ্রদ্ধেয় বলদেব বিদ্যাভূষণ-ব্যাখ্যাত অচিন্ত্যভেদাভেদ-

৫। ডঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার: 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান' (১৩৬৮), পৃ: ৯৭।

তত্ত্বের অনুগামী। শ্রীজীব-গোস্বামী ও শ্রদ্ধেয় বলদেব বিদ্যাভূষণ দু'জনেই আচার্য রামানুজের অচিৎ (প্রকৃতি) পদার্থের বিশ্লেষণ ক'রে ঈশ্বর ও চিৎ-এর (জীবের) সঙ্গে কাল ও কর্ম-পদার্থদুটির যোগসূত্র রচনা করেছেন— যদিও শ্রীমদ্‌ভাগবতের ২।৫।১৪ শ্লোকে দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব, জীব ও বাসুদেব তত্ত্বসমূহের উল্লেখ ও অনুশীলন বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। শ্রীজীব-গোস্বামী ও বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল নিত্য পদার্থ এবং কর্ম বা অদৃষ্ট অনিত্য, সুতরাং বিনাশী পদার্থ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরের উপাসনাই অভিপ্রেত। শ্রীজীব-গোস্বামী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ সগুণ-ব্রহ্মে সেবা-সেবকভাবের দ্বারাই মুক্তিলাভের কথা বলেছেন। এই সেব্য-সেবকভাব পাঁচ রকম—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এদের মধ্যে মধুরভাবেই ভক্তির (এবং প্রেমেরও) পরাকাষ্ঠা। এই ভক্তি (ও প্রেম) পার্থিব নয়, একান্তভাবে অপ্রাকৃত ও অপার্থিব।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতো শ্রীজীব-গোস্বামী ও বলদেব পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তির কথা বলেছেন ও সে তিনটি অপার্থিব শক্তি হোল: (১) স্বরূপশক্তি— নিত্য লীলাধামে সন্ধিনী (অস্তি), সম্বিৎ (ভাতি) ও হ্লাদিনী (প্রীতি বা প্রিয়); (২) তটস্থাশক্তি—জীবশক্তি বা ভোক্তৃশক্তি, এবং (৩) বহিরঙ্গ মায়াশক্তি—সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মিকা শক্তি—যার পরিণাম দৃশ্য বিশ্বচরাচর। বহিরঙ্গ মায়াশক্তি ঈশ্বরকে স্পর্শ বা আবৃত করে না (অদ্বৈতবেদান্তেও তাই) এবং আচার্য রঙ্গ-রামানুজেরই মতো পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ অতিপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন ও চিজ্জড়শক্তির আশ্রয়স্থল এবং কারণ—'অবিচিন্ত্যশক্তিকত্বাৎ'। অদ্বৈতবেদান্তীরা যেখানে মায়ার অনির্বচনীয়তার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, সেখানে শ্রীজীব-গোস্বামী, বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যেরা শক্তি অবিচিন্ত্য (অচিন্ত্য) বলে তার আর স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন নি। অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন সম্পূর্ণভাবে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের তত্ত্ব এবং আদর্শও ঐ বাদ ও তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ-সম্পর্কে শ্রীজীব-গোস্বামী 'সর্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থে বলেছেন: "অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১১) ভেদেঽপ্য-ভেদেঽপি নির্মার্য্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং

স্বীকুর্বন্তি।" অর্থাৎ শ্রীজীব-গোস্বামী বলেছেন: 'অপর এক সম্প্রদায়ের বেদান্তীরা বলেন, তর্কের অপ্রতিষ্ঠার জন্য ভেদেও এবং অভেদেও নিখিল দোষ-সমূহ দর্শন করে ভিন্নত-রূপে চিন্তা করা অসম্ভব। সেজন্য যেমন ভেদসাধন করা কঠিন, তেমনি অভিন্নভাবে চিন্তা করে অভেদসাধন করাও দুষ্কর। এরূপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন করতে গিয়ে এঁরা ভেদাভেদসাধনে চিন্তার অসামর্থ্যতা উপলব্ধি করায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকার করাই সমীচীন মনে করেছেন। বলদেব বিদ্যাভূষণও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীজীব-গোস্বামীপাদ ও বলদেব বিদ্যাভূষণকে শ্রীমধ্ব ও শ্রীবল্লভেরই একটি নবীন সংস্করণ বলা যায়। আচার্য বল্লভাচার্যও জীব-গোস্বামী ও বলদেবের মতো স্বীকার করেন যে, মুক্তির আদর্শ নিত্যবৃন্দাবনে পতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবা ও আরাধনা করা উচিত। সেই নিত্য-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান পুরুষোত্তম-রূপে অতীন্দ্রিয় অক্ষর জ্যোতির্ময় নিরাকার ব্রহ্মকেও অতিক্রম ক'রে বর্তমান। মাধ্বাচার্য মুক্তির প্রসঙ্গে একটু ভিন্নভাবে বলেছেন: "মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা, ভক্তিশ্চ তৎসাধনম্, হ্যক্ষরাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ।" বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের প্রাণকেন্দ্র পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীহরি, এবং শ্রীরাধা বা শ্রীরাধিকা তাঁর পরমা শক্তি। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও প্রকৃতি শ্রীরাধার অপ্রাকৃত ও অপার্থিব লীলাকেই বিভিন্ন পালায় বা লীলাকর্মে বিভক্ত করে রসে, রূপে ও ভাবে বৈষ্ণব মহাজন বা পদকর্তাগণ কীর্তনের পদাবলী রচনা করেছেন ও শ্রীকৃষ্ণ-রাধার মহিমা বর্ণনা করেছেন শাশ্বত মুক্তিরসধারা আস্বাদনের জন্য। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ' গ্রন্থের পরবর্তী ভাগে 'পদাবলীকীর্তনে দর্শনতত্ত্ব' বিষয়বস্তুর আলোচনার সময়ে বিস্তৃতভাবে বৈষ্ণবদর্শনে ও কীর্তনগানে প্রকৃত তত্ত্বদৃষ্টিসম্পর্কে অনুশীলন করার চেষ্টা করবো। বর্তমান আলোচনা তার আভাস মাত্র।

দুই

কবি জয়দেবের পরবর্তীকালে পদাবলীকীর্তনের রূপবিকাশ নিয়ে অনুশীলন করলে দেখি যে, বৈষ্ণবসমাজে ও বৈষ্ণবসাধনতত্ত্বে বিশেষভাবে পদাবলীকীর্তনের উপাদান-সংবলিত জীবনরস সঞ্চার করেছিলেন বড়ু

চণ্ডীদাস[৬] ও মৈথিলী কবি বিদ্যাপতিপ্রভৃতি মরমীয়া বৈষ্ণব-মহাজনগণ। কবি জয়দেবের পদসাহিত্য ও পদলালিত্য আলোচনার পর আমাদেব অনুশীলনের বিষয়বস্তু হবে বড়ু চণ্ডীদাস বা অনন্ত-বড়ু চণ্ডীদাসের পদবচনাশৈলী ও পদমাধুর্য। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের পদসাহিত্যপ্রসঙ্গ আলোচনা কবার পূর্বে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্মেব অনুপ্রবেশ ও তা কীভাবে ঘটেছিল।

বৈষ্ণবধর্ম যে বহির্দেশ থেকে বাঙলার মাটিতে তাব আসন প্রতিষ্ঠা কবেনি একথা অধিকাংশঐতিহাসিকরা স্বীকাব কবেন। তাবপব একথাও স্বীকার্য যে, ভক্তিভাবপত্তনেব তিনটি প্রধান ও প্রয়োজনীয় সূত্র হোল: "(i) Vāsudeva-Krishna-worship, dating from the pre-Christian centuries. (ii) Gopa Krishna-worship, based on honey and cattle around; and (iii) Lokanātha-worship of Bengal Buddhism, which laid particular emphasis on all-round non-violence and compassion for living beings and on the attitude of perfect surrender to divine dispension. * * Sufi mysticism also contributed materially to its development"।[৭]

ঠিক এ'ধবনের ভক্তির ভাব ও প্রবাহ সৃষ্টি হযেছিল সমগ্র উত্তর-ভাবতে খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতকে এবং সে সৃষ্টিব কেন্দ্রমণি ছিলেন দু'জন ধর্মমনীষী—বামানন্দ স্বামী ও মাধবেন্দ্র পুরী। বারাণসী, সিন্ধু-পাঞ্জাব এবং মথুবা-বৃন্দাবন ছিল সেই প্রবাহসৃষ্টিব উর্বর ক্ষেত্র। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ১২শতকে সেন-রাজাদের সময়েই বাঙলাব সমাজে পাই বৈষ্ণবধর্মের এক নবচেতনাব ইঙ্গিত। পাল-রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ-তান্ত্রিকধর্মেব উপাসক ও সমর্থক। লামা তাবানাথেব 'ভারতেব ইতিহাস' সাক্ষ্য দেয় যে, পাল-বাজাদের সময়ে বৌদ্ধ মন্ত্রবজ্রাচার্যেব আবির্ভাব ঘটেছিল অলৌকিক সিদ্ধাই বা সাধন-বিভূতিব ঐশ্বর্য নিয়ে এবং সে সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয় প্রসিদ্ধ নালন্দা, বিক্রমশীলা, জগদ্দল, সোমপুবী, পাণ্ডুভূমি প্রভৃতি বৌদ্ধ-

---

৬। 'চণ্ডীদাস' নামধেয় ব্যক্তির আবির্ভাব বৈষ্ণবসমাজে কয়েকজন, যেমন অনন্ত-বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতি। এ' সম্বন্ধে পরে আলোচিত হবে।

৭। Ct. Dr. Sukumar Sen: *History of Bengali Literature* (New Delhi, 1960), p. 82.

বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারগুলি। এমন কি পাল-রাজাদের শাসনকালে দেখি, বৌদ্ধধর্ম আত্মসাৎ করেছিল বহু হিন্দুদেবী, এবং বৌদ্ধ ও শৈবদের মধ্যেও চলেছিল এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী দ্বন্দ্ব-মিলনের ভাব। কিন্তু রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের সময়ে বাঙলাদেশে হিন্দুধর্মের মধ্যে এলো আবার এক নবজাগরণ। বৈষ্ণবধর্মকে তাঁরা গ্রহণ করলেন এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য-দর্শন ও ব্রাহ্মণ্য-সাহিত্যের হোল পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তবে একথাও সত্য যে, পাল-রাজারা বৌদ্ধ-ধর্মের পরিপোষক হলেও হিন্দুধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না। তার ফলে সম্ভবতঃ সেন-রাজাদের সময়েই বৈষ্ণবধর্মের পুনঃপ্রবর্তন হয়েছিল বাঙলাদেশে। তাছাড়া ভবদেবভট্ট ছিলেন একান্তভাবে বৌদ্ধবিদ্বেষী এবং তারি জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাস্ত্রও রচনা করেছিলেন তিনি। রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের সময়ে রচিত হয়েছিল হিন্দুধর্মের স্বার্থপরিপোষক অনেক গান ও ছড়া, রাধাকৃষ্ণলীলাগান এবং গোপীচাঁদ, লাউ-সেন, লক্ষ্মীন্দ্র, শ্রীমন্ত-সদাগর ও কালকেতু প্রভৃতি রাজার প্রবাদ ও কাহিনী-সাহিত্য। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, যে, পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রভৃতি প্রাচীন যুগে বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের অনুপ্রবেশের কথা প্রমাণ করে। দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে কবি জয়দেব যে গীতগোবিন্দে রাধা-কৃষ্ণের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই উভয় প্রেমলীলার পরিচয় দিয়েছেন তা থেকেও প্রমাণ হয়, বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিজাহ্নবীধারা স্বতঃপ্রবাহিত ছিল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বাঙলাদেশের বুকে। তারপর অনন্ত-বড়ু চণ্ডীদাস ও কবি বিদ্যাপতির আবির্ভাবে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক যে পদামৃতধারার স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল তা থেকেও বাঙলায় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠার কথা প্রমাণ হয়। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য এবং চৈতন্যপরিকরদের অপ্রাকৃত প্রেম-ভক্তির বন্যা বাঙলার বৈষ্ণবধর্মকে আবার নূতন ধারায় প্রবাহিত করেছিল ১৫শ-১৬শ শতকের পরে বাঙলাদেশে।

কিন্তু তার অর্থ এ' নয় যে, শ্রীচৈতন্যের পূর্বে বাঙলায় বৈষ্ণবধর্মের প্রবাহ ও গতিবেগ উচ্ছল ও প্রখর ছিল না। কবি জয়দেব যে রাধাকৃষ্ণলীলাসচ্ছল গীত-গোবিন্দপদগান রচনা করেছিলেন তা থেকেও প্রমাণ হয় যে, তাঁর সময়ে ও পূর্বে বাঙলার সজল মাটিতে যে বৈষ্ণবধর্মধারা প্রবাহিত ছিল, তারই প্রেরণায় কবি জয়দেবের ভক্তি-উৎসারিত লেখনী গীতগোবিন্দের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণ-

লীলাতত্ত্ব বর্ণনা করেছিলেন সাবলীল ছন্দে। বঙ্গভূমে আবিষ্কৃত বিচিত্র লেখমালা থেকেও প্রমাণ হয় যে, বিষ্ণুর উপাসকরা রাঢ়দেশে ৪র্থ-৫ম খ্রীষ্টীয় শতকেও বিশেষভাবে প্রচলিত ছিলেন। আচারাঙ্গসূত্র, মহাবংশ, পবনদূত, দিগ্বিজয়প্রকাশ, দশকুমারচরিত ও অন্যান্য গ্রন্থে রাঢ়দেশ তথা সুহ্মের বর্ণনা আছে। রাঢ়দেশ বাঙলার আদিবাসীপ্রধান দেশ এবং পণ্ডিতদের মতে, আর্যসভ্যতার বিকাশ হয় বাঙলায় পরবর্তী সময়ে। কবি ধোয়ী 'পবনদূত'-গ্রন্থে লিখেছেন,

গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো।
বাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ॥

গঙ্গার জলপ্রবাহের দ্বারা প্লাবিত যে বিস্তীর্ণ দেশের অংশ তারই নাম সুহ্মদেশ। 'দিগ্বিজয়প্রকাশ'-গ্রন্থে সুহ্মের বর্ণনা একটু ভিন্ন প্রকারের—

গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে সুহ্মদেশঃ প্রকীর্তিতঃ॥

গৌড়দেশের পশ্চিম, বীরদেশে পূর্ব ও দামোদরের উত্তরদেশ সুহ্ম নামে কথিত।[৮] অধ্যাপক শ্রীবিনয় ঘোষ লিখেছেন: "সমস্ত বর্ণনা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বর্তমান হুগলীজেলারেই প্রাচীন সুহ্ম বা রাঢ়দেশের কেন্দ্র বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তার সীমানা মেদিনীপুর থেকে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল মনে হয়"।

বাঙলার বুকে রাঢ়দেশে বা সুহ্মে ৪র্থ-৫ম খ্রীষ্টীয় শতকে বিষ্ণুপূজার ও বৈষ্ণব-ধর্মের যথেষ্ট প্রচলন ছিল সেকথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। "বাঁকুড়া শহরের প্রায় বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে শুশুনিয়া-পাহাড়ের গুহাপ্রাচীরের একটি লিপিতে দেখা গেছে যে, পুষ্করণার অধিপতি ছিলেন রাজা চন্দ্রবর্মা। * * রাজা চন্দ্রবর্মা চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক। সুতরাং বিষ্ণুর উপাসনা রাঢ়দেশে চতুর্থ-পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে প্রবর্তিত হয়েছিল তাতে কোন সংশয় নেই। তাছাড়া বিষ্ণুমূর্তি এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে, চৈতন্যপূর্ব যুগেও যে বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবদের বেশ আধিপত্য

৮। অধ্যাপক শ্রীবিনয় ঘোষ: 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (১৯৫৭), পৃঃ ৬৮-৬৯ দ্রষ্টব্য। এ' সম্পর্কে শ্রীঅমিয়রতন বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'বাঁকুড়ার মন্দির' (১৩৭১), পৃঃ ১১-১২ দ্রষ্টব্য।

ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। বিষ্ণুর শিলামূর্তি ও দশাবতারের পূজা আগে থেকেই বাঙলাদেশে চলে আসছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁর শিষ্যরা গোপাল-মূর্তির পূজা প্রচলন করেন।[৯] পাল-রাজা ও সেন-রাজাদের সময়ে বাঙালায় শৈবধর্মের পাশাপাশি বৈষ্ণবধর্মের প্রচলনের কথা পূর্বে আলোচনা করেছি।

৯। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৮৫



উনবিংশ পবিচ্ছেদ

॥ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও শ্রীব্রহ্মসংহিতা ॥

খ্রীষ্টীয় ৯ম-১১শ শতকেব বৌদ্ধ-চর্যাগীতি ও ১২শতকেব শেষভাগে 'গীতগোবিন্দ' পদগান বৈষ্ণব-পদাবলীকির্তনেব পাদপীঠ ও উৎসস্বরূপ। গবেষকদেব মতে ১১শ শতক অথবা ১৩ শতকেব প্রথমভাগে লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুব 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' বচনা কবেন এবং বহু মনীষাব অভিমতও যে, কবি জযদেবেব 'গীতগোবিন্দ' বচনা প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতেব এবং পবোক্ষভাবে শ্রীব্রহ্ম-সংহিতাব পদমাধুর্যেব নিকট ঋণী। খ্রীষ্টীয় ১৫১০-১৫১১শতকে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যদেব সেখানকাব ভক্ত-সাধকগণেব মুখে ঐ দুটি গ্রন্থেব আবৃত্তি শুনে ভাবমুগ্ধ হন এবং পুবীধামে প্রত্যাবর্তনকালে ঐ দুটিব গ্রন্থের সামান্য অংশ মাত্র সঙ্গে এনেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ কবেছি যে, শ্রীকৃষ্ণকর্ণা-মৃতেব মতো তিনি পুবীধামে গম্ভাবাব নিভৃত কক্ষে ব্রহ্মসংহিতাবও আবৃত্তি শুনে ও রসাস্বাদন কবে মহাপ্রভু মহাভাবে অভিভূত হতেন। তাই পদাবলী-কীর্তনেব আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও শ্রীব্রহ্মসংহিতাব পদমাধুর্য্য নিয়ে অনুশীলন কবাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে কবি।

এক

॥ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ॥

লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের আবির্ভাবকাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ থাকলেও ভক্তিশাস্ত্রে পারগ ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন : "বিল্ব-

মঙ্গল ঠাকুর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে খ্যাতি লাভ করেন, তাহার কিছু পূর্বে হয়তো তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন"।[১] কেউ কেউ লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গলকে খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর (মমঃ রামকৃষ্ণ কবি) ও ১১শ শতকের (ডক্টর উইন্টারনিজ) কবি বলেছেন, কিন্তু ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের মতো আমরাও বলি, ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-কাব্য বা সংকলনগ্রন্থ রচনা করে ২৩৭০টি শ্লোক ও ৪৮৫ জন কবির নামোল্লেখ করেছেন। সুতরাং ডক্টর উন্টারনিজের মতে বিল্বমঙ্গলের আবির্ভাব যদি ১১ শতকে হয়, তবে সদুক্তিকর্ণামৃতে অবশ্যই তাঁর ও তাঁব সংস্কৃত কবিতার উল্লেখ থাকত। সেজন্য নানান কারণে আমরা লীলাশুককে ১৩ শতকের প্রথম ভাগের কবি বলে গ্রহণ করি।

সাধক লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল-রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণকর্ণামৃত' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ আদরণীয় ও শ্রদ্ধার গ্রন্থ ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পুরীতে গম্ভীরায় ভক্তগণের সঙ্গে তিনি নিভৃতে কবি জয়দেব-বিরচিত গীতগোবিন্দের পদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ ও রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটকের সঙ্গে সঙ্গে বিল্বমঙ্গল-রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ভক্তিনিষ্ণাত পদ শ্রবণ করতেন। ডক্টর বিমানবাবু লিখেছেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ১৪৩২-১৪৩৩ শকে অর্থাৎ ১৫১০—১২ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য-পবিভ্রমণকালে কৃষ্ণবেন্না নদীর নিকটে সাধক বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের আবৃত্তি শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃতের ২।৯।২৭৬-৮০) এবং সেজন্য "তিনি উহার প্রথম অধ্যায়, লহরী, আশ্বাস বা শতকেব ১১২টি শ্লোক লিখাইয়া লইয়া পুরীতে আনেন"। চৈতন্যচরিতামৃতের ২।২।৬৬ পদে শ্রীচৈতন্যদেব যে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত শ্রবণ করতেন তার উল্লেখ আছে। তাছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী 'সারঙ্গরঙ্গদা' টীকার প্রারম্ভে লিখেছেন, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেন্না নদীর পশ্চিম তীরে শ্রীবিল্বমঙ্গল নামে পণ্ডিত কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। কবি যদুনন্দন দাসও লিখেছেন,

> দক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেন্না-নদী।
> যাহার পশ্চিম পারে তাহার বসতি॥

১। 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্'—ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত (জিজ্ঞাসা, ১৯৬৬), ভূমিকা, পৃঃ ৵০

শ্রীবিল্বমঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।—প্রভৃতি

দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতদের অনেকেরই ধারণা যে, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কেরালা প্রদেশের কবি। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সমগ্র শ্লোক প্রথমে পাওয়া যেত না। শোনা যায়, বৃন্দাবনে ও বাঙলাদেশে মাত্র প্রথম শতকের ১১২টি শ্লোকের আবৃত্তি হোত। শ্রীচৈতন্যদেবই দক্ষিণদেশ থেকে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ১১২টি শ্লোক পুরীতে আনয়ণ করেন। তাছাড়া তিনি ১০০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থের একটি মাত্র অধ্যায় পুরীতে সঙ্গে এনেছিলেন। তবে একথা স্বীকৃত যে, ব্রহ্মসংহিতা গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণবদের আকরগ্রন্থ পববর্তী পদাবলীকীর্তনেব কাবাদেহে ও সর্বোপরি পদাবলীকীর্তনের অপার্থিব রসতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব এবং মধুর জীবনতত্ত্বের সৃষ্টিক্ষেত্রে প্রাণ সঞ্চার করেছিল।

কথিত আছে যে, লীলাশুক 'পুরুষকারম্' 'কৃষ্ণলীলাবিনোদ' ও 'গোবিন্দাভিষেক' নামে আবও তিনটি গ্রন্থ বচনা কবেছিলেন। তার মধ্যে 'পুরুষকারম্' নিছক ব্যকরণ বিষয়ক গ্রন্থ এবং 'কৃষ্ণলীলাবিনোদ' মহারাজ ভোজ-কৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণের টীকা ও 'গোবিন্দাভিষেক' মনীষী বররুচি-কৃত 'প্রাকৃত-ব্যাকবণ'-গ্রন্থেব টীকা। মনে হয় এ' তিনটি গ্রন্থই ব্যাকরণশাস্ত্র-সম্পর্কে লিখিত।[২] ডক্টর মজুমদার লিখেছেন, লীলাশুকের রচনা বলে আরও যে গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, 'অভিনবকৌস্তভমালা' (ত্রিবান্দম-সংস্কৃত গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ) ও 'কালবধম্' (কেরালা-বিশ্ববিদ্যালয়েব ১১৯ সংখ্যক গ্রন্থ) অন্যতম। এ'দুটি গ্রন্থেও নাকি লীলাশুক গোপসখাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্যকাহিনী বর্ণনা করেছেন।[৩] তাছাড়া লীলাশুকের রচিত বলে যে কটি স্তবমালার প্রচলন আছে তাদের মধ্যে দুর্গাস্তুতি, দক্ষিণামূর্তি-স্তবম্, বালকৃষ্ণস্তবম্, বালগোপালস্তুতি, গণপতিস্তোত্রম্, রামচন্দ্রাষ্টকম্, বৃন্দাবনস্তোত্রম্, নৃসিংহনবরত্নস্তোত্রম্, মহাকালাষ্টকম্, শ্রীকৃষ্ণবরদাষ্টকম্, অনুভবাষ্টকম্ প্রভৃতি স্তব অন্যতম। লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সাধক ও

২। 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্' গ্রন্থের ভূমিকা (ডঃ বিমান বিহারী মজুমদাব লিখিত), পৃঃ ৵০ দ্রষ্টব্য।

৩। লীলশুক-রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির প্রামাণ্য-সম্পর্কে অবশ্য আরও গবেষণার প্রয়োজন।

উদারদৃষ্টিসম্পন্ন ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে গোপাল বা বাল-গোপাল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণস্তব ছাড়াও শিব, গণপতি প্রভৃতি দেবী ও দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব রচনা করা অসম্ভব নয়। শোনা যায়, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শিব, দুর্গা, পার্বতী প্রভৃতি মন্দিরেও প্রণাম করতেন, যেমন আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী হলেও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তোত্র রচনা ক'রে তাঁর অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ছিলেন পরমভক্ত ও শ্রীকৃষ্ণের সাধক। মনে হয়, তিনি সহজিয়ামতে অধ্যাত্মসাধনার অনুষ্ঠান করতেন এবং চিন্তামণি বারবণিতাকে শক্তি-রূপে গ্রহণ তার সাক্ষ্য দান করে। সোমগিরি নামক একজন সাধকের তিনি শিষ্যত্ব বরণ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ একথা স্বীকার করেছেন। তিনি প্রথম পরিচ্ছেদে আদিলীলায় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে চিন্তামণি ও গুরু সোমগিরিকে প্রণাম করেছেন গ্রন্থরচনাসূচনায়—

> তথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথম শ্লোকে,
> চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে,
> শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
> যৎপাদকল্পতরু-পল্লবশেখরেষু,
> লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥২২

বিল্বমঙ্গলশক্তি সাধিকা চিন্তামণি ও গুরু সোমগিরি যে বৈষ্ণব-সাধক-সমাজেও চিরবরেণ্য তা জানা যায়।

অনেকে 'চিন্তামণি' ও 'সোমগিরি' শব্দগুলির ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে করেছেন। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের বসন্ততিলক ছন্দে লীলাশুক যেখানে চিন্তামণি ও আচার্য সোমগিরির বন্দনা বা নামোল্লেখ করেছেন সেখানে টীকাকার গোপালভট্ট বলেছেন: "চিন্তামণিঃ সোমগিরিঃ মে গুরুঃ শিক্ষাগুরুশ্চ" প্রভৃতি, কিংবা চৈতন্যদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন: "চিন্তামণিঃ সোমগিরিনামা মে গুরুঃ জয়তি" প্রভৃতি। এখানে শ্রদ্ধেয় গোপালভট্টের টীকা-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানকেই চিন্তামণি ও সোমগিরি-রূপ বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে এবং চৈতন্যদাস ও কবিরাজ-গোস্বামীর টীকা-অনুসারে দীক্ষাগুরু সোমগিরির বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়েছে চিন্তামণি।

তাছাড়া অনেক টীকাকার ও এমনকি গোপালভট্টও 'সোমগিরি' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন সোমগিরি বা অমৃতের গিরি, কিংবা উমার সঙ্গে বর্তমান থাকেন যিনি মহেশ বা দেবাদিদেব মহাদেব তিনিই—গিরির মতো প্রতীয়মান। সুতরাং সোমগিরি এবং চিন্তামণি বারবণিতাকে গোপালভট্ট কাল্পনিক বলেছেন। কিন্তু ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামীর 'সারদারঙ্গদা'-টীকা উল্লেখ ক'রে গোস্বামীর মন্তব্য-সম্পর্কে বলেছেন: "ইতি গুরুপরম্পরাগতা সার্বলৌকিকী প্রসিদ্ধিরিতি:"। কিন্তু সোমগিরি প্রকৃতপক্ষে আচার্য শঙ্করের সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন এবং বৃন্দাবনের বিদগ্ধ বৈষ্ণবাচার্যগণ সোমগিরি সন্ন্যাসী হয়েও যে লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গলের দীক্ষাগুরু ছিলেন তার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। সোমগিরির দৃষ্টিতে নাকি পরব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না। ডক্টর মজুমদার ঐ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: "কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের মূলস্তম্ভ মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহার শিষ্য ঈশ্বর পুরী এবং শ্রীরঙ্গ পুরীরও 'পুরী' উপনাম দেখা যায়। 'বৃহৎশঙ্করদিগ্বিজয়' গ্রন্থ হইতে 'শব্দকল্পদ্রুম' পুরীর লক্ষণ দিয়েছে—

জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণং পূর্ণতত্ত্বপথস্থিতিঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে॥"

সুতরাং সোমগিরির ঐতিহাসিক সত্তা ও এমন কি সহজিয়ামতে সাধনার সহায়স্বরূপা বারবণিতা চিন্তামণির বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন সার্থকতা নাই। যদুনন্দনদাস তাঁর পদ্যব্যাখ্যায় এ'সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—

সেই নদীর[৪] পূর্বদিকে বেশ্যার বসতি।
চিন্তামণি তাঁর নাম সুন্দরী যুঁবতী॥
বড়ই আসক্তি তাঁর সেই বেশ্যা সনে।

* * *

প্রাতে উঠি বেশ্যা পায়ে কৈল নতি স্তুতি।
সেই পথে বলি গেলা সেই নদীতীরে।
বৈষ্ণব আছেন যথা সোমগিরিবরে॥

৪। কৃষ্ণবেন্বা নদী।

বৈষ্ণব-কবি যদুনন্দন সোমগিরিকে 'বৈষ্ণব' আখ্যা দিয়েছেন, কেননা সাধক সোমগিরি সন্ন্যাসী হয়েও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। মনে হয়, যদুনন্দনদাসের ব্যাখ্যা ও 'ভক্তমাল' গ্রন্থকে অবলম্বন করেই শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে সোমগিরি ও চিন্তামণির জীবনচরিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তবে 'গিরিশ-প্রতিভা'-গ্রন্থে নাট্য-সমালোচক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন: "'ভক্তমাল'-গ্রন্থ অবলম্বনে এই (বিল্বমঙ্গল) নাটকখানি রচিত"। চিন্তামণি বারবণিতা হয়েও বিল্বমঙ্গলের গুরুস্থানীয়া ছিলেন এজন্য যে, তিনি বিল্বমঙ্গলকে অধ্যাত্মপথের সন্ধান দিয়েছিলেন। যদুনন্দনদাস এ'প্রসঙ্গে উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—

এমন আসক্তি যদি জন্মে কৃষ্ণ লাগি।
তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ-অনুরাগী॥

চিন্তামণির ভৎসনাই বিল্বমঙ্গলের পক্ষে কৃষ্ণভক্তিলাভের পথে প্রেরণা ও আশীর্বাদ। তাছাড়া ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে সোমগিরির চরিত্রাঙ্কনের পশ্চাতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরমাদর্শকেই রূপায়িত করেছেন—যা বিল্বমঙ্গলচরিত্র এবং ও ঐ নাটকের একটি দিক। সোমগিরির সমাধিভাবস্নিগ্ধ ভাব বা অবস্থা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যাবস্থা ও দিব্যভাবেরই হুবহু অনুকরণ বা রূপায়ণ।

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে চিন্তামণি, সোমগিরি ও পাগলিনীর ভূমিকাকে কীভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যভাবরসে সিঞ্চিত করেছেন তার সামান্য নিদর্শন সুপণ্ডিত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-প্রণীত 'গিরিশ-প্রতিভা' (১৩৩৫) গ্রন্থ থেকে নিদর্শন দেখ—যা পদাবলী-কীর্তনের আলোচনায় মোটেই অবাস্তব না হয়ে ররং শোভনীয় হবে বলে মনে করি। নাট্যসমালোচক হেমেন্দ্রপ্রসাদ দাশগুপ্ত 'বিল্বমঙ্গল' নাটকপ্রসঙ্গে লিখেছেন: "সোমগিরি। রামকৃষ্ণদেবের সাধনোন্মাদ অবস্থা যেমন পাগলিনী-চরিত্রে পরিস্ফুট, তাঁহার অসাধারণ গুরুভাবও সেইরূপ সোমগিরিতে প্রকটিত। ধীর, শান্ত, কারুণিক গুরুরূপে রামকৃষ্ণদেব যেইরূপ গুণ-নির্বিশেষে শিষ্যগণের সংশয় ভঞ্জন করিতেন, সোমগিরি-চরিত্রেও সেই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত।" সোমগিরি-সম্বন্ধে 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে সামান্যমাত্র উল্লেখ দেখা যায়—

ভক্তমাল-গ্রন্থকার লিখেছেন—

সর্বত্যাগ করি রামচন্দ্রের চরণ
আশ্রয় করিয়া কৈল একান্ত শরণ।

'বিল্বমঙ্গল' নাটকে গিরিশচন্দ্র একাধারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এ'সকল রসের সমন্বয়ই ঘটিয়েছেন—যা প্রেমসাধনার চরম-আদর্শ। পদাবলীকীর্তনেও এ' সকল রসের চরমবিকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং বৈষ্ণব-পদকর্তাগণ পদ-রচনায় ও সুর-যোজনায় সে' সকল রসের পরাকাষ্ঠা সাধন করেছেন।

এবার লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-থেকে কাব্য ও রসলীলায়িত রচনা-সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। আলোচনা-প্রসঙ্গে ১৬শ শতকে রচিত কয়েকটি টীকা ও ১৭শ শতকের কবি যদুনন্দনদাসের কবিতারও মাঝে মাঝে নিদর্শন দেব। যদুনন্দনদাস আসলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী-লিখিত 'সারঙ্গরঙ্গদা' টীকারই সরল সাবলীল পদ্যানুবাদ করেছিলেন।

কবি জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের রসলীলায়িত ও সংস্কৃতায়িত রচনা অনুশীলন করলে একান্তভাবে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সমগোত্রীয় শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের পদগানের কথাই মনে পড়ে। কবি জয়দেব যেমন বিভিন্ন ছন্দে গীতগোবিন্দের ভাবসম্পদযুক্ত শ্লোক রচনা করেছেন, বিল্বমঙ্গল তেমনি ১১২টি শ্লোকের অবতারণা ক'রে বিচিত্র ছন্দের মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ছন্দগুলির নাম বসন্ততিলক, শার্দুল-বিক্রীড়িত, কোকিলক, মঞ্জুভাষিণী, ঔপচ্ছন্দসিক, দ্রুতবিলম্বিত, চেচ্চরী, মালিনী, অনুষ্টুপ, ললিতগতি, পৃথ্বি, উপেন্দ্রবজ্রা, ইন্দ্রবজ্রা, বৈতালীয়, শিখরিণী বংশস্থবিল, হরিণী, আর্য্যা, প্রহর্ষিনী, শালিনী, উদ্ধতা, তোটক প্রভৃতি। ১৭শ শতকের বৈষ্ণব-কবি ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তী তাঁর ছন্দশাস্ত্র 'ছন্দসমুদ্র'-গ্রন্থেও অসংখ্য ছন্দের নামোল্লেখ ও পরিচয় দিয়েছেন।

ডক্টর বাসন্তী চৌধুরী তাঁর 'বাঙলার বৈষ্ণবসমাজ, সঙ্গীত ও সাহিত্য' (১৯৬৮) গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে 'ছন্দশাস্ত্রে নরহরির দান' শীর্ষক আলোচনায় ললিত প্রভৃতি ৮৩টি ছন্দের নাম ও মাত্রাভাগের উল্লেখ করেছেন।[৬] অবশ্য

৬। ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৪৮—২৭৮ দ্রষ্টব্য।

পিঙ্গলাচার্যই প্রথমে ছন্দশাস্ত্রের প্রবর্তক। ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তী 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' গ্রন্থে ৮৩ প্রকার ছন্দের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন ও তাদের মধ্যে ৪১ সংখ্যক দ্বিপথা ছন্দে।[৭]

বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের আলোচনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে ঠাকুর বিল্বমঙ্গল-রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ভক্তিগ্রন্থের অনুশীলনপ্রসঙ্গে ছন্দগুলির পরিচয়—

(১) বসন্ততিলক-ছন্দেব প্রতি চবণে ১৪টি অক্ষর এবং ৮ অক্ষর ও ৬ অক্ষরের পর যতি।

(২) শার্দুলবিক্রীড়িত-ছন্দেব প্রতিচবণে ১৯টি অক্ষব এবং ১২ ও ৭ অক্ষরের পর যতি।

(৩) উপেন্দ্রবজ্রা-ছন্দের প্রতিচরণে ১১টি অক্ষর এবং ৫ ও ৬ অক্ষবের পব যতি।

(৪) পৃথ্বি-ছন্দের প্রতিচরণে ১৭টি অক্ষর এবং ৮ ও ৯ অক্ষরেব পব যতি।

(৫) প্রহর্ষিণী-ছন্দেব প্রতিচরণে ১৩টি অক্ষর এবং ৩ ও ১০ অক্ষবের পর যতি।

(৬) বংশস্থবিল-ছন্দেব প্রতিচবণে ১২টি অক্ষব এবং ৬ ও ৬ অক্ষবের পর যতি।

(৭) মালিনী-ছন্দেব প্রতিচবণে ১৫টি অক্ষব, এবং ৮ ও ৯ অক্ষবের পর যতি।

(৮) রুচিরা-ছন্দেব প্রতিচরণে ১৩টি অক্ষব, এবং ৩ ও ৯ অক্ষবের পর যতি।

(৯) শালিনী-ছন্দের প্রতিচবণে ১১টি অক্ষব এবং ৪ ও ৭ অক্ষবের পর যতি।

(১০) শিখরিণী-ছন্দের প্রতিচরণে ১৭টি অক্ষর এবং ৬ ও ১১ অক্ষরের পর যতি।

(১১) হরিণা-ছন্দের প্রতিচরণে ১৭টি অক্ষর এবং ৬ অক্ষবের পর প্রথম যদি ও ৪ অক্ষরের দ্বিতীয় যতি এবং ৭ অক্ষবের পব তৃতীয় যতি।

৭। ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ২৫১

শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও মহিমা বর্ণনায় ছন্দ ও ছন্দায়িত শ্লোকগুলি চিরমুখর। যেমন শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ৮ম শ্লোক—

মদশিখণ্ডিশিখণ্ডবিভূষণং
মদনমন্থরমুগ্ধমুখাম্বুজম্।
ব্রজবধূনয়নাঞ্জনরঞ্জিতং
বিজয়তাং মম বাঙ্ময়জীবিতম্॥

অর্থাৎ যাঁর চূড়ায় ভূষণ মদমত্ত ময়ূরের পুচ্ছ, যাঁর মুখপদ্ম দর্শন ক'রে মদনও মোহিত ও স্তব্ধ, ব্রজবধূদের নয়নের উজ্জ্বল কজ্জলে যাঁর মূরতি রঞ্জিত—এমন যে আমার বাক্যের প্রাণস্বরূপ তাঁর জয় হোক।

কিম্বা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ১৮শ শ্লোক—

তরুণারুণকরুণাময়বিপুলায়তনয়নং
কমলাকুচকলসীভরবিপুলীকৃতপুলকম্।
মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনিমানসনলিনং
মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতম্॥

অর্থাৎ যাঁর নয়নযুগল তরুণ, অরুণবর্ণ, করুণাময়, বিপুল ও আয়ত, কমলার কুচকলসংস্পর্শে যাঁর অঙ্গ বিপুল পুলকে পুলকিত, যাঁর মুরলীরব শ্রবণে মুনি-মন কমলদলের ন্যায় দুলে ওঠে, তাঁর মধুর অধরস্থিত অমৃত আমার প্রেমোন্মত্ত চিত্তে খেলা করুক।

লীলাশুক-রচিত সংস্কৃত পদগুলিতে রচনার সাবলীলতা ও গতিশীলতার তুলনা নাই এবং সেগুলি কবি জয়দেবের কোন কোন রচনার সমগোত্রীয় বলা যায়।[৮] যেমন শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ৫২ এবং ৫৩ সংখ্যক শ্লোকদুটিতে স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গিমা নিয়ে পদগুলি লীলায়িত—

করকমলদলকলিতললিততরবংশী-
কলনিনদগলদমৃতঘনসরসি দেবে।
সহজরসভরভরিতদরহসিতবীথী-
সততবহদধরমণিমধুরমণি লীয়ে॥ ৫২

৮। অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিল্বমঙ্গল-রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণা-মৃতের নিকট ঋণী এবং এ' তথ্য সত্য বলেই মনে করি।

কুসুমশরশরসমরকুপিতমদগোপী-
কুচকলসঘুসৃণরসলসদুরসি দেবে।
মদমুদিতমৃদুহসিতমুষিতশশিশোভা-
মুহুরধিকমুখকমলমধুরিমণি লীয়ে॥ ৫৩

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে লীলাশুক তাঁর জীবন-সাধনার বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সাধনার ইতিকথা ও মর্মকথারই পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত যে চিরদিন বিশ্বের ভক্ত-হৃদয়ে শান্তি ও সান্ত্বনার অমৃতধারা বর্ষণ করে শাশ্বত হয়ে থাকবে সে কথার পরিচয় তিনি নিজে দিয়ে বলেছেন—

লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষ্ণদেব
কর্ণামৃতং বহতু কল্পশতান্তরেঽপি॥ ১১০

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, দাক্ষিণাত্যের প্রবাদ ও লিখিত টীকা অনুসারে এই ১১০ শ্লোকে লীলাশুক তাঁর গুরু ঈশানদেব, মাতা নীবি বা নীলীদেবী ও পিতা দামোদরের উল্লেখ করেছেন—

ঈশানদেবচরণাভরণেন নীবি-
দামোদরস্থিরযশঃস্তবকোদ্ভবেন।

গোপালভট্ট ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ দাক্ষিণাত্যের প্রবাদ বা টীকার অর্থই গ্রহণ করেছেন।

দুই

শ্রীব্রহ্মসংহিতা॥

'শ্রীব্রহ্মসংহিতা'-র একটি অধ্যায় অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায় মাত্র বৈষ্ণব-পদবলীকীর্তনের আদিপ্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণদেশ থেকে পুরীতে সঙ্গে এনেছিলেন পূর্বে সেকথার উল্লেখ করেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোস্বামীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাইয়া।
মহারত্ন পাই আইলা সঙ্গে লইয়া॥

* * *

১। বৃন্দাবনবাসী রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা', পৃঃ ১—৯ দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতা সমান।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরমকারণ ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতিসার ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীজীব-গোস্বামী শ্রীব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের উপর 'দিগ্‌দর্শনী' নামে একটি জ্ঞানগর্ভ টীকা রচনা করেন।

শ্রীব্রহ্মসংহিতার (৫ম অধ্যায়) প্রথম শ্লোক হোল—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

শ্রীজীব-গোস্বামীপাদ এর বিস্তৃত ব্যাখ্যায় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেছেন।[১] তাছাড়া 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ' সহস্রপাৎ, সহস্রবাহুর্বিশ্বাত্মা সহস্রাংশঃ সহস্রঃ' (২১) বলে মহাবিষ্ণুরূপী শ্রীগোবিন্দের রূপবর্ণনা করেছেন ব্রহ্মসংহিতাকার। বিধাতা ব্রহ্মা শ্রীকেশবের মাধুর্যে আত্মহারা হয়ে যখন স্তব করেছেন তখন পদলালিত্য অপরূপ মাধুর্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর স্তবে এবং সে পদমাধুর্যের সঙ্গে মধুরকোমলকান্ত গীতগোবিন্দের পদমাধুর্যের বেশ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।[২] স্তব-মাধুর্য হোল—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২৯
বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষম্
বর্হাবতংসমসিতাম্বদ[৩]সুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভম্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩০ —প্রভাত

পরবর্তী অন্য ছন্দে রচিত পদ—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।

২। গীতগোবিন্দ-পদগানও ব্রহ্মসংহিতার নিকট বিশেষ ঋণী।
৩। পাঠভেদ—অম্বুদ ?

কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলকমিতি যম্
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥৫৬

এই শ্লোকে "গমনমপি বংশী প্রিয়সখী",—প্রিয়সখী অর্থে শ্রীজীব-গোস্বামী 'শ্রিয়ঃ পরমলক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণের' উল্লেখ করেছেন, শ্রীরাধা বা রাধিকার কোন উল্লেখ এখানে নাই। শ্রীব্রহ্মসংহিতার (৫ম অধ্যায়ের) শেষ বা ৬২ সংখ্যক শ্লোকটি হোল—

অহং হি বিশ্বস্য চরাচরস্য
বীজং প্রধানং প্রকৃতিঃ পুমাংশ্চ।
ময়াহিতং তেজ ইদং বিভর্ষি
বিধে বিধেহি ত্বমথো জগন্তি ॥

এই শ্লোকে শ্রীগোবিন্দের পূর্ণ ভাগবত রূপের পরিচয় দিয়ে সংহিতা-কার বলেছেন, শ্রীগোবিন্দ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণস্বরূপ পূর্ণ ভগবান। প্রকৃতি বা অব্যক্ত নামক ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গ শক্তি ও তার দ্রষ্টা-পুরুষ শ্রীগোবিন্দ। শ্রীজীব-গোস্বামী ব্রহ্মসংহিতাকে 'কৃষ্ণোপনিষদং'—কৃষ্ণোপ-নিষৎ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের মতো শ্রীব্রহ্মসংহিতার পদলালিত্যও দেশ ও কালের মায়িক সীমারেখার বহু ঊর্ধে বিধৃত থেকে বৈষ্ণব-পদাবলীসাহিত্যের ভাব-গাম্ভীর্য ও রসাস্বাদনকে সমৃদ্ধ করেছে। বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের রূপ-গঠন ও শৈলী যে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও শ্রীব্রহ্মসংহিতার পদ ও ভাব-মাধুর্যের দ্বারা প্রভাবিত এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই সেকথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।



বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ পদাবলীকীর্তনে বিভিন্ন পদসাহিত্যের অবদান ॥

এক

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের রূপায়ণ বিশ্বের সমগ্র সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতের জগতে একটি অনবদ্য ও অনাস্বাদিত সৃষ্টি। বিশেষতঃ বাঙালীজাতির জীবনচিন্তার সঙ্গে তার বিচিত্র রকমের সঙ্গীত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সে যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে তার নাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কিত। বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের স্বতন্ত্র রূপ ও মাধুর্য-সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্তই বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলঙ্কারশাস্ত্রের পাষাণ-বন্ধনসকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহরণ করিল। বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রাচীন সমালোচকের অনুশাসনে নহে, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সঙ্গীত থই পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সঙ্গীতপ্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।" বৈষ্ণবধর্মের অপার্থিব রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব, উজ্জ্বল রসমাধুর্য ও গভীর ভাব-সম্পদকে ভিত্তি করেই বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের রূপায়ণ। মোটকথা ভক্তি-সাহিত্য ও ভক্তিভাব-

ধারাই পদাবলীকীর্তনের প্রাণকেন্দ্র। ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, আদিরসাশ্রিত ভক্তিসাহিত্য ভারতবর্ষে নূতন নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেরও সৃষ্টি নয়। প্রাচীন সংস্কৃতে ভক্তি-অনুসারী আদি-রসাত্মক সাহিত্য ও সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। শৃঙ্গারশতক, অমরুশতক, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতমুক্তাবলী, শারঙ্গধরপদ্ধতি ও প্রাকৃত অপভ্রংশে রচিত সাতবাহন নরপতি হালের 'গাথাসপ্তশতী' প্রভৃতি গ্রন্থে পার্থিব প্রেম-কাহিনীর পাশাপাশি অপার্থিব প্রেমতত্ত্বকাহিনীর অভাব নাই।[১] রাজা জয়াপীড়ের অমাত্য পণ্ডিত দামোদরগুপ্ত আনুমাণিক ৭৭৯-৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'কুট্টনীমতকাব্যম্' রচনা করেন এবং 'কুট্টনীমতম্' কাব্যগ্রন্থ পদাবলীকীর্তনের পদসাহিত্যকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত না করলেও রচনাশৈলী ও ভাবসম্পদের ক্ষেত্রে সে পদকীর্তনের ধারাকে সচ্ছল ও প্রেরণা-দীপ্ত করেছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। বাঙলাদেশে ১২শ—১৩শ শতকে কবীন্দ্রসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ ও কবি জয়দেবের সমসাময়িক কবিগণ ধোয়ী, উমাপতি ধর, শবণ ও গোবর্ধন আচার্য-রচিত কাব্যগ্রন্থগুলিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের সাহিত্য, রস ও ভাবধারাকে রসসিঞ্চিত করেছিল সেকথা পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি; 'কবিন্দ্রসমুচ্চয়' সম্ভবত ১২শ শতকে নেওয়ার অক্ষরে রচিত হলেও এই কাব্যগ্রন্থের অনেক রচয়িতাই বাঙালী ছিলেন বলে মনে হয়। কবীন্দ্রসমুচ্চয়ের আধিকাংশ কবিতা বা পদ আদিরসাত্মক এবং পরোক্ষভাবে কবীন্দ্রসমুচ্চয়ের রস, ভাবসম্পদ ও পদরচনাশৈলী পদাবলীকীর্তনের সৃষ্টি ও বিকাশকে রূপায়িত করেছিল। তবে একথাও সত্য যে, 'কবিন্দ্র-সমুচ্চয়' ও এমনকি 'সদুক্তিকর্ণামৃত' কাব্যগ্রন্থ-দুটি রচিত হবার পূর্বে ১ম-২য় শতকের 'গাথাসপ্তশতী' শ্লোক বা কবিতাসংগ্রহ তাঁর পরবর্তী সকল কাব্যগ্রন্থ ও পদাবলীসাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছিল বলা যায়। ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড) উল্লেখ করেছেন: "এই সাতশত শ্লোকে বিরহ-মিলনের অশ্রুবেদনা ও কামনার উত্তপ্ত উল্লাস যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে একমাত্র 'অমরুশতক' এবং 'শৃঙ্গারশতক' (ভর্তৃহরি-রচিত) বাদ দিলে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার

১। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (২য় খণ্ড), পৃঃ ৪৯১

অনুরূপ দৃষ্টান্ত নাই বলিলেই চলে। ১৬শ শতকের হিন্দী-কবি বিহারীও ঐ আদর্শে 'সাতসঞ্জ'-গ্রন্থ রচনা করেন। মনে রাখিতে হইবে, পরবর্তী কালে সংস্কৃতে সে সমস্ত শ্লোকসংগ্রহ রচিত হইয়াছিল (সুভাষিতাবলী, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, কবিন্দ্রসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত) তাহার প্রধান আদর্শটি 'গাথাসপ্তশতী' হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে যে কয়েকটি শ্লোকে কৃষ্ণের গোপলীলা, বিশেষত রাধার উল্লেখ আছে তাহাই প্রণিধানযোগ্য।"

খ্রীষ্টীয় ১ম—২য় শতকে[২] সাতবাহন নরপতি হালের 'গাথাসপ্তশতী' গ্রন্থে তদানীন্তন ভারতীয় সমাজেব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার একটি জীবন্ত আলেখ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে গ্রন্থটি দক্ষিণাপথের গ্রাম, গ্রাম্য দেব-দেউল, ধর্ম ও দর্শনবুদ্ধির আলেখ্য, প্রাচীন বাঙলার সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবনযাত্রাব কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঠিক বাঙলা দেশেবই মতো পল্লীর কুলরমণীরা ব্রতোৎসবের সমাপনে গৃহে গৃহে প্রহেনক বা বায়নক (পিষ্টকাদি খাদ্যের) ও পুষ্পভাব উপহার প্রদান করতো। তখনকার সমাজে শিল্পের মধ্যে ছিল চিত্রাঙ্কন ও নৃত্য-গীতেব অনুশীলন। মৃদঙ্গ বা মুরজেব গুরুগম্ভীব ধ্বনি (৩।৫৩), কোণদ্বারা আহত বীণার ঝঙ্কার (৬।৬০), বংশ বা বংশীব ধ্বনি (৬।৫৭), চাক বা চক্কা (৬।২৬) প্রভৃতি বিচিত্র গাথাগানের (৫।২১) প্রচলন ছিল। উৎসব ও বিবাহ-উপলক্ষ্যে সুবেশসম্পন্ন গায়িকাগণ মঙ্গলগীতি (৭।৪৩) সুবে ও তালে গান কবতো। নরপতি হাল ছিলেন শৈব, সুতরাং তাঁর রচিত হরগৌরীর স্তুতিগানের সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের গাথাগানের (১।৮৯) অপ্রাচুর্য ছিল না। ২।১৪ গাথায় শ্রীকৃষ্ণকে গোপীদের সঙ্গে নৃত্যক্রিয়ায়ও রত দেখা যায়। ২।১২ সংখ্যক গাথায় যশোদাদেবীকে বাৎসল্যভাবে আপ্লুত দেখি। তাছাড়া ৫।৪৭, ৭।৫৫, ২।১৭, ৭।৬৯ প্রভৃতি গাথায় শ্রীকৃষ্ণলীলার উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কে গাথাসপ্তশতীতে নরপতি হাল উল্লেখ করেছেন[৩]—

মুহমারুএণ তং কণহ গোরঅং রাত্রিআত্রে * *।

২। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে গাথাসপ্তশতীর রচনাকাল ১ম-২য় শতক। অনেকে আবার 'সম্ভবত' ৫ম শতকের শেষকালে রচিত বলেন।

৩। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত 'গাথাসপ্তসতী' দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার মুখ-মারুতের সাহায্যে রাধিকার চক্ষু থেকে ধূলি অপনীত ক'রে * *।

অজ্জবি বালো দামোঅরো ত্তি ই অ * *

অর্থাৎ 'আজ-পর্যন্ত দামোদর শ্রীকৃষ্ণ বালকই থেকে গেলেন'—যশোদা একথা বললে ব্রজবধূগণ কৃষ্ণমুখের প্রতি নয়ন অর্পিত ক'রে গোপনভাবে হাস্য করলেন।

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ' প্রসঙ্গে লিখেছেন : "লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত ও বন্ধু বটুদাসের পুত্র 'মহামণ্ডলিক' শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সঙ্কলন করিয়া ১২শ-১৩শ শতকের বাঙালীর সহিত পরবর্তী বাঙালীর সেতু রচনা করিয়া দিয়াছেন।" পুনরায় তিনি লিখেছেন : "সেই দিক দিয়া এই সঙ্কলনখানি (সদুক্তিকর্ণামৃত) 'কবীন্দ্রসমুচ্চয়' অপেক্ষাও মূল্যবান। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সঙ্কলিত হয়। ইহাতে মোট পাঁচটি প্রবাহ, প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি 'বীচি' এবং প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি করিয়া কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতার সংখ্যা—২৩৭০টি ; মোট কবির সংখ্যা—৪৮৫ জন। * * কবিদের মধ্যে যেমন সর্বভারতীয় ভাস, কালীদাস, ভামহ, অমরু, ভর্তৃহরি, রাজশেখর, কেশবসেন, উমাপতিধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন, ধোয়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাঙালী কবি-মনীষীদেরও বিবিধ ধরনের শ্লোক স্থান পাইয়াছে।[8] 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থেও নায়ক-নায়িকাভেদের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুবর্ণনা প্রভৃতির শ্লোক পাওয়া যায়। মোটকথা 'কবীন্দ্রসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'শৃঙ্গারপ্রবাহ'" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বিচিত্র বিষয়বস্তুর আলোচনা-শৈলী প্রভৃতি লক্ষ্য করলে বাঙলাদেশের সকল কাব্যগ্রন্থকেই আদিরস শৃঙ্গার ও ভক্তিরসের প্রবাহে সঞ্জীবিত ক'রে পরবর্তীকালে বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের সাহিত্য বা পদসম্পদ, রসসম্পদ, ভাবসম্পদ ও অপার্থিব কবিকল্পনাকে সমুজ্জ্বল করেছিল। তাছাড়া বৈষ্ণব-পদাবলীতে যে রাধা-কৃষ্ণতত্ত্বের উচ্ছলতা—তার বীজ শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতগোবিন্দের বহুপূর্ব থেকেই সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ ও প্রাচীন বাংলা কাব্যগ্রন্থে নিহিত দেখা যায়।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, হালের 'গাথাসপ্তশতীতে 'রাহিআএ' বা রাধিকা-শব্দ ব্যতীত পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে দণ্ডায়মান যুগলমূর্তির

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ), পৃঃ '৮

নিদর্শন, কবি ভট্টনারায়ণ-কৃত 'বেণীসংহার' নাটকের নান্দীশ্লোকে কালিন্দী-পুলিনে রাসের সময়ে কেলিকুপিতা অশ্রুকলুষা রাধিকা ও তার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের অনুনয়ের উল্লেখ, আলঙ্কারিক বামন তাঁর অলঙ্কারশাস্ত্রে ভট্টনারায়ণের কবিতায় রাধার প্রসঙ্গে, খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে আনন্দবর্ধন-কৃত ধ্বন্যালোকে রাধা-কৃষ্ণপ্রসঙ্গ—"তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং * * বিগল-ন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে প্রবাসী শ্রীকৃষ্ণ বন্দাবন থেকে আগত সখাকে গোপবধুগণের বিলাস-সুহৃৎ ও বাধার গোপন-সাক্ষী কালিন্দীতীরবর্তী লতাগৃহগুলির কুশলপ্রশ্ন, আলঙ্কাবিক কুন্তকের 'বক্রোক্তিজীবিত'গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকের "যাতে দ্বারবতীং পুরং * * কালিন্দীতটকুঞ্জমঞ্জুললতা-মালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া, উদ্‌গীতং গুরুবাষ্পগদ্‌গলত্তাবস্বরং রাধয়া" প্রভৃতি শ্লোকে রাধা বা রাধিকা-শব্দের নিদর্শন, ৯১৫ খ্রীষ্টীয় শতকে ত্রিবিক্রমভট্টের 'নলচম্পূ'-গ্রন্থে নল-নময়ন্তী-প্রসঙ্গে 'কলা-কৌশলে চতুরা রাধা পরমপুরুষ মায়াময় কেশিহন্তাব (কৃষ্ণের) প্রতি অনুক্ত' উদ্ধৃতি, ১০ম শতকের পূর্বার্ধে কাশ্মীরের টীকাকার বল্লভদেব কবি মাঘ-রচিত 'শিশুপালবধ'-কাব্যে রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত ৪।৩৫ শ্লোকের নিদর্শন, ১০ম শতকের চম্পূ-রচয়িতা সোমদেব-সূবিব 'যশস্তিলক'-গ্রন্থে অমৃতমতি নাম্নী একজন নারীর সমর্থনে 'রাধা কি নারায়ণে অনুরাগিণী' উক্তির উদ্ধৃতি প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে,[৫] কাব্যে ও নাটকে রাধা ও কৃষ্ণের নামের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করে।

শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত পুনরায় লিখেছেন, 'কবীন্দ্রসমুচ্চয়' গ্রন্থে কৃষ্ণের ব্রজলীলাবিষয়ক—'গাপস্ত্রীনয়নোৎসবঃ' প্রভৃতি তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া ১২শ শতকে জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্র (সূরী) 'কাব্যানুশাসন' গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর পরিচয় দিয়েছেন ও শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে তার উল্লেখও করেছেন।[৬] হেমচন্দ্রের শিষ্য রামচন্দ্র (১১০০—১১৭৫) গুণ-চন্দ্রের সহায়তার যে 'নাট্যদর্পণ' রচনা করেন, সেই নাটকে ভেজ্জল-কবি-রচিত 'রাধা-বিপ্রলম্ভ' নামক একটি নাটকের উদ্ধৃতি আছে এবং তাতে 'রাধা' নামের ও কৃষ্ণপ্রেমের নিদর্শন আছে। দ্বাদশ শতকে সারদাতনয় 'ভাবপ্রকাশন' সংগ্রহগ্রন্থে 'রামারাধা' নামে রাধা-সম্পর্কীয় একটি নাটকের

৫। 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে', পৃঃ ১১৩-১১৬ দ্রষ্টব্য।

৬। ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ১১৭-১১৮

উল্লেখ করেছেন।[৬] তাছাড়া 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-গ্রন্থে উদ্ধৃত নাথোক-কবির পদে উল্লিখিত 'রাধধব' শব্দ, ১৩শ শতকের সাগরনন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ' গ্রন্থে 'রাধা' নামক একখানি 'বীথি' জাতীয় নাটকে 'রাধা' নামের সার্থকতা স্বীকৃত দেখি। 'প্রাকৃতপিঙ্গল' নামক প্রাকৃতছন্দগ্রন্থে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক 'রাধামুখমধুপান' শব্দটিও রাধাকৃষ্ণপ্রেমকাহিনীর নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে। তাছাড়া কবি জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ', লীলাশুক-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', জহ্লন-কবি-সংগৃহীত 'সূক্তিমুক্তাবলী'-গ্রন্থে লীলাশুকের 'রাধা' নামাঙ্কিত একটি পদের উল্লেখ থাকায় জহ্লনও যে 'রাধা' নামের সঙ্গে পবিচিত ছিলেন তা প্রমাণ হয়। তাছাড়া ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর ভাবতীয় সাহিত্যগুলিতে 'রাধা' নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। চৈতন্যযুগের অব্যবহিত পূর্বে এবং চৈতন্যযুগেব পরবর্তী বৈষ্ণব-পদসাহিত্যগুলিতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বকাহিনীর অপ্রাচুর্য নাই। শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁব অশেষ পবিশ্রমসাধ্য ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিব পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীবাধা বা বাধিকা'নামেব সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম-সার্থকতা ও ইতিকথার বিবরণ দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে চিবস্মবণীয় হয়েছেন।

বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনেব প্রাণবস্তু শ্রীবাধা কৃষ্ণেব প্রেমতত্ত্ব ও প্রেমলীলাকাহিনী। সুতবাং পঞ্চবাত্রসংহিতা, প্রাচীন পুবাণসাহিত্য ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থপ্রভাবিত শ্রীমদ্ভাগবতে 'অনযারাধিত' শব্দের মধ্যে শ্রীবাধার অস্পষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ প্রকাশ দেখা গেলেও সুস্পষ্টভাবে 'বাধা'-নাম ও রাধাতত্ত্বের উল্লেখ ও অনুশীলন যে 'শ্রীমদ্ভাগবত' মহাগ্রন্থেব পূর্বেও বর্তমান ছিল এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[৭]

দুই

বৈষ্ণব-পদকর্তাগণের রসলীলায়িত ও ভাবস্নিগ্ধ ব্রজবুলিভাষায় রচিত পদ ও ভণিতায় সংস্কৃত ছন্দের রীতিমত বাঁধুনি না থাকলেও তার মধ্যে ছন্দমাধুর্যের একটি গতি ও স্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মহারাগবর্ণনায় (কোড়ারাগে অনুবিদ্ধ) দেখি—

৭। শ্রীরাধার ইঙ্গিত বা আভাস বেদের মধ্যেও নক্ষত্রনামের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখি।

বুঝিআঁ গোপীর মনে
আল।
ক্ষণেক শুনিল কাহ্নে।
ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে॥

আবার পাহাডীবাগে শ্রীরাধার মন-সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণেব উক্তি—

তমাল কুসুম চিকুর গণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে॥
সুপুট নাসা তিলকুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে॥
আধার সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কাণ্ণ যুগ তোর এ' বগহুলে ॥—ইত্যাদি

ধানুষীরাগে শ্রীবাধার ভক্তিতে (লঘুশেখর) আবাব দেখি—

খোঁপা পবতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর
কেশপাশে নীল বিদ্যমানে।
সিসেব সিন্দুর সুর ললাটে তিলক চাঁদ
নয়নত বসএ মদনে॥—ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ-সম্পর্কে তোডীরাগে উল্লিখিত পুনরায দেখি—

নবীন কিশোবী মেঘেব বিজুরী
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গেব সঙ্গিনী সকল কামিনী
ততহি উদয় ভেল॥—ইত্যাদি

কবি বিদ্যাপতি-বচিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের অন্যতম পদগানে পুনরায় দেখি—

আজু মঝু শুদিন (শুভদিন) ভেলা।
কামিনি পেখলু সিনানক বেলা॥
চিকুর গলয়ে জলধারা।
মেহ বরিখ জনু মোতিম হারা॥—প্রভৃতি

আবার বিদগ্ধ পদকর্তা রায় রামানন্দের পদ-রচনায় দেখি কবি জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দ-পদগানের কিছুটা ঝঙ্কার ও অলঙ্কার—

মৃদুল-মলয়জ-পবন-তরলিত
চিকুর-পরিগত-কলাপম্ ।
সাচি-তরলিত-নয়ন-মন্মথ

সুন্দরী-জনিত কৌতুকম্ ॥—ইত্যাদি

কিংবা শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

বিদলিত-সরসিজ-দল-চয়-শয়নে ।
বারিত-সকল-সখী-জন-নয়নে ॥
* * *
অভিনব-বিস-কিশলয়-চয়-বলয়ে ।
মলয়জ-রস-পরিষেচিত-নিলয়ে ॥—ইত্যাদি

পুনরায় দেখি পদকর্তা গোবিন্দদাসের ভণিতায় রচনা আরও রসায়িত, সমৃদ্ধ ও ছন্দায়িত হয়ে উঠেছে—

ঘন মেঘ বরখিয়ে বিজুরি চমকে ।
তাহা দেখি প্রাণ মোর থরহরি কাঁপে ॥

কিংবা—

ঝাঁপল বনতল তিমির আসিয়ে ।
একসরি আকুল পথ নাহি পাইয়ে ॥
নিবারিয়ে নীরধারা বসন-অঞ্চলে ।
নিরজন জানিয়া আইলু তরুতলে ॥[৮]—ইত্যাদি

সাহিত্যরত্ন পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "রামায়ণ, শিবায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল ও বিবিধ গীতিগাথার মাঝখানে আপন স্বাতন্ত্র লইয়া অভ্যুদিত হইল বৈষ্ণবপদাবলী। ** বৈষ্ণব-গীতিকবিতায় কথা ও সুরের সমান মধুরতা। যেন একটি পাখীর দুইটি পক্ষ। এই দুই পক্ষে ভর দিয়া সাধনসিদ্ধ গায়কের সঙ্গে ভাবুক ও রসিক শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তকেও উধাও করিয়া বৈষ্ণবের গান যে কল্পলোকে লইয়া যায় তাহা কোন কাল্পনিক জগৎ নহে। বৈষ্ণব-কবিগণের অনুভূতিতে সেই চিদানন্দময় ধামও যেমন সত্য, এই নিত্য নূতন লীলাও তেমনই সত্য। কবিগণ তাহার সাক্ষাৎদ্রষ্টা।"

৮। উদ্ধৃত পদাবলীগুলিতে পাঠভেদ থাকা সম্ভব।

যুগ্মরূপ কথা ও সুরের উদাহরণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও একটি পাখীর দুটি পাখার কথা উল্লেখ করেছেন। বাঙালীর ভাবস্নিগ্ধ গীতিকবিতা এবং গান কথা ও সুরের বেণীবন্ধনে জড়িত থেকেই মানব-চিত্তে অপার্থিব রসের অনুভূতি সৃষ্টি করে। অবশ্য এ' গ্রন্থের পরবর্তী ভাগে আমরা বৈষ্ণব-পদকর্তাগণের পদমাধুর্য নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। তবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে যে সকল পদগানের ও এমনকি নাট্যগানের রচনা হয়েছে সেগুলিতে গীতগোবিন্দের রচনাশৈলীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে ছালিক্যগীতি-অভিনয়ের পদগানকে 'পদাবলী' বলে উল্লিখিত দেখি: "পদাবলী তু পদার্থানাং বাচিকা, ন তু দর্শিকা, স্বরবন্ধবিশেষেণ রস-সাক্ষাৎকরী তু সা", অর্থাৎ গানের রচনা বা পদাবলী বিষয়বস্তুকে কথায় প্রকাশ করে, তবে বুঝিয়ে দেয় না, সুরের সজ্জায় তা রসের সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষানুভব করিয়ে দেয়। সেই সুরসিক্ত পদাবলীর নমুনা হোল—

কেশব কমলমুখীমুখকমলম্
কমলনয়ন কলয়াতুলমমলম্।
কুঞ্জগেহে বিজনেঽতিবিমলম্॥

অথবা—

সুরুচিরহেমলতানবলম্বা তরুণতরু ভগবন্তম্।
জগদবলম্বনবলম্বিতুমনুকলয়তি সা তু ভগবন্তম্॥

পদগান বা পদাবলীর সচঞ্চল গতি, ছন্দ ও রচনাবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে গীতগোবিন্দের পদলালিত্যের কথাই মনে পড়ে এবং সাহিত্যসেবিগণ সেজন্য গীতগোবিন্দকে লীলাশুকের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের নিকট ঋণী বলে স্বীকার করেন এ'কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

পদলালিত্যের প্রসঙ্গে কৃষ্ণকর্ণামৃত ও গীতগোবিন্দের পূর্ববর্তী ও প্রায় সমসাময়িক কতকগুলি কাব্য ও সাহিত্যগ্রন্থের কথা মনে পড়ে। বিশেষ ক'রে 'অমরুশতক', 'কুট্টনীমতকাব্য' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' পদগ্রন্থগুলির রচনাশৈলী ও ছন্দমাধুর্যের প্রতিচ্ছবির পরিচয় পাই প্রেমসিক্ত ও রসসিঞ্চিত ভক্তিকাব্য কৃষ্ণকর্ণামৃত ও গীতগোবিন্দের মধ্যে। অধ্যাপক ওয়েবার, কিথ্, ভিণ্টারনিজ্, ষ্টিন কনো, ডক্টর সুশীলকুমার দে, ডক্টর গোয়েজ, মিষ্টার মেটা,

ষ্টেলা ক্রামিশ, ডঃ মতিচন্দ্র ও অন্যান্য সাহিত্যসেবী, ঐতিহাসিক ও শিল্প-সমালোচকগণের অভিমত যে, 'অমরুশতক' সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পতত্ত্বের একটি অপরূপ আদিরসাত্মক গ্রন্থ। অমরুশতকে পদের ছন্দায়িত রসোচ্ছল গতি ও মাধুর্যের নিদর্শন যেমন—

(ক) কথমপি সখি ক্রীড়াকোপাদ্‌ব্রজেতি ময়োদিতে।
কঠিনহৃদয়স্ত্যক্ত্বা শয্যাং বলাদ্‌গত এব সঃ॥
ইতি সরভসং ধ্বস্তপ্রেম্ণি ব্যপেত ঘৃণে স্পৃহাম্।
পুনরপি হতব্রীড়ং চেতঃ করোতি করোমি কিম্॥

অথবা—

(খ) চরণপতনপ্রত্যাখ্যানপ্রসাদপরাঙ্‌মুখে।
নিভৃতকিতবাচারেহত্যুক্তে রুষা পরুষীকৃতে।
ব্রজতি রমণে নিশ্বস্যোচ্চৈঃ স্তনাহিতহস্তয়া।
নয়নসলিলচ্ছন্না দৃষ্টিঃ সখীষু নিপাতিতা॥[১]

আবার দামোদরগুপ্ত-কৃত কুট্টনীমতকাব্যে পদলালিত্যের নিদর্শন—

(ক) গম্ভীরমধুরশব্দং পরিরক্ষিতগীতবিবিধভঙ্গযুতম্।
দর্শয়তো বৈচিত্র্যং ন ভ্রষ্টো বাদকস্য লয়কালঃ॥

(খ) গীতশ্রবণোৎকর্ণং নিশ্চলতৃণকবলগর্ভমুখহরিণম্।
উপবেশিতমস্পন্দং স্পৃহনীয়া এব গৃহ্ণাতি॥

শ্রীধরদাস-কৃত 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-সংগ্রহগ্রন্থে পদসম্ভারের নিদর্শন দেখি—

(ক) কালিন্দ্যাঃ পুলিনং প্রদোষমরুতো রম্যাঃ শশাঙ্কাংশবঃ।
সন্তাপং ন হরন্তু নাম নিতরাং কুর্বন্তি কস্মাৎ পুনঃ॥
সন্দিষ্টং ব্রজযোষিতামিতি হরেঃ সংশৃণ্বতোহন্তঃপুরে,
নিঃশ্বাসাঃ প্রসৃতা জয়ন্তি রমণীসৌভাগ্যগর্বচ্ছিদঃ॥

(খ) নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্॥

১। (ক) রচনাদুটি আদিরস শৃঙ্গাররসাত্মক। শৃঙ্গাররস সৃষ্টির উৎস ও প্রাণকেন্দ্র। আদি-পুরুষ-প্রকৃতির মিলনরসাত্মক পদই শৃঙ্গারসদ্যোতক—যা পবিত্র ও অপার্থিব।

(খ) এই পদরচনার মধ্যে পাঠভেদ থাকা সম্ভব।

রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুম্
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥

'কবিন্দ্রসমুচ্চয়' প্রভৃতি পদগ্রন্থেও ভাষামাধুর্যের তুলনা নাই। বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের রচনাশৈলী ও গঠনভঙ্গী এ'সকল পদগ্রন্থগুলির কাছে যে বিশেষভাবে ঋণী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখানে সাহিত্য ও পদ-মাধুর্যেরই মাত্র নিদর্শন দেওয়া হোল।

পদাবলীকীর্তনের ইতিহাসের পরবর্তী ভাগে শ্রীচৈতন্যপূর্ব, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ও শ্রীচৈতন্যোত্তর পদসাহিত্যগুলিব মধ্যে বসোত্তীর্ণ সাহিত্য ও কাব্যসৌন্দর্য, তাদের মধ্যে রাগ, তাল ও ছন্দসমাবেশ, নায়ক-নায়িকাভেদ এবং রস ও ভাবসম্পদের সঙ্গে পদাবলীসাহিত্য, কাব্য, বস ও অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুর তুলনা ক'রে বৈষ্ণবভাবতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে রাধাকৃষ্ণ-লীলাসম্পৃক্ত কীর্তনগীতির আলোচনা কবার চেষ্টা করবো।

।। পরিশিষ্ট ।।



॥ গীতগোবিন্দপদগান বাঙলার পদাবলীকীর্তনের পটভূমিকা ॥*

বাঙলার বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তন ক্ল্যাসিক্যাল তথা অভিজাত সূচ-প্রবন্ধগীতির অন্তর্গত নিবদ্ধ-করণপ্রবন্ধগানের শ্রেণীভুক্ত। শাস্ত্রীয় নিবদ্ধ-করণপ্রবন্ধের মতো পদাবলীকীর্তনও ধাতু, অঙ্গ, তাল, রাগ ও বিভিন্ন রস-ভাব-সমন্বিত। বাঙলার পদাবলীকীর্তন অধ্যাত্ম-ভাবসম্পদযুক্ত গীতি বা গান। বাঙলাদেশের কীর্তনের নিজস্ব একটি ঐতিহ্য ও রূপ আছে এবং এর ব্রজবুলিভাষানিবদ্ধ রসস্নিগ্ধ পদসাহিত্য ও প্রকাশভঙ্গী নিজস্বতার দাবী রাখে।

এখানে প্রমাণ করার বিষয় যে, কবি জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দপদগান বাঙালাদেশে প্রচলিত বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের পটভূমিকা ও উত্তরসূরী। 'কীর্তন'-শব্দটি ভক্তিরসাত্মক গান বা ঈশ্বর অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে গীত ভজনগানকেই বোঝায়। শাস্ত্রে কীর্তন 'যশোগান' বা 'কীর্তিগাথাগান' নামে পরিচিত। বাচস্পত্যাভিধানে বলা হয়েছে—'কীর্ত' শব্দ খ্যাতি, মহিমা, ও যশোসূচক গানকে বুঝায়: "কীর্তি—কীর্ত + ক্তিন্। খ্যাতিভেদে অমরঃ। খ্যাতিভেদশ্চ ধার্মিকত্যাদি প্রশস্তধর্মবত্ত্বেন নানাদেশীয়কথন জ্ঞানবিষয়তা।

---

* ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ সঙ্গীত-নাটক একাডেমীতে (একস্‌পার্ট-কমিটির সম্মুখে) পঠিত 'The Gitagovinda-Padagana is the Background of the Padavali-Kirtan of Bengal' ইংরাজী নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ। ইংরাজী বক্তৃতাটি The Journal of the Madras Music Academy, Vol. XXXVI, pts. I-IV সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিপূরক বলে ঐ ইংরাজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ এখানে দেওয়া হোল।

কীর্তিশ্চ জীবতোঽমৃতস্য বেত্যত্র বিশেষো নাস্তি। * * তত্র দানাদিপ্রভাবা খ্যাতিঃ কীর্তিঃ সৌর্যাদিপ্রভবা খ্যাতির্যশ ইতি কেচিদ্ যশকীর্ত্যোর্ভেদমাহুঃ**।" কীর্তি তথা খ্যাতি বা যশঃ অর্থে সংহিতাকার মনু উল্লেখ করেছেন : "প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্তিশ্চ ব্রহ্মবর্চসমেব চ।" সুতরাং কীর্তন বা কীর্তিগাথাগান বলতে কেবলই রাধাকৃষ্ণলীলাগান বা বৈষ্ণব-পদাবলীগান বুঝায় না, পরন্তু জ্ঞানে গুণে শৌর্যে বীর্যে ও যশে যিনি শ্রেষ্ঠ মানব বা মহামানব তাঁর মহিমাসূচক গানই 'কীর্তন'। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাপ্রকাশসূচক কীর্তিগানের ব্যবহার দেখা যায়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অনুবর্তী বৈষ্ণবাচার্যেরা এবং পদকর্তা মহাজনেরা একমাত্র শ্রীভগবানের লীলা ও মহিমাবর্ণনাসূচক গানকেই 'কীর্তন' আখ্যা দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ও ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীপাদ গোপালভট্ট তাঁর বৈষ্ণবস্মৃতি 'হরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থে যেখানে (১১।২৩৯) "কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্" বা "কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ" শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন; সেখানে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী টীকামুখে বলেছেন : "সঙ্কীর্ত্য সম্যক্ উচ্চৈরুচ্চার্যেতি সত্যঃ স্বরূপানন্দবিশেষার্থমুক্তম্।" তাছাড়া নামোচ্চারণ ক'রে উঁচৈঃস্বরে গান বা স্তুতিগান করাকেই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী 'কীর্তন' আখ্যা দিয়েছেন : "সঙ্কীর্তনং নামোচ্চারণং গীতং স্তুতিশ্চ নামময়ী"। শ্রীপাদ গোপালভট্ট 'হরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বিত রূপ সঙ্গীতকে বৈষ্ণব-সমাজে একান্ত গ্রহণীয় ও আদরণীয় বলে বিধান দিয়েছেন।

পঞ্চরাত্রসংহিতাগুলি, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের পরিপোষক। শ্রীমদ্ভাগবতে কীর্তিগান বা কীর্তনের প্রসঙ্গে উল্লেখ দেখি—

> রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পুনয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
> বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্
> গীতিকীর্তিঃ।

এখানে 'গীতকীর্তিঃ' শব্দ বিশ্লেষণ করলে পাই—"গীতা কীর্তিঃ যশঃ যস্য স কৃষ্ণঃ", অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যশকীর্তিগানই গীতকীর্তি বা কীর্তন। শ্রীমদ্ভাগবতে পুনরায় দেখি—

(ক) * * শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানন্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনম্। —১০।২৩।২৬

(খ) গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা। —১০।৩০।৪

মোটকথা উচ্চকণ্ঠে বা উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বর বা দেবতাদির গুণগাথা গান করার নাম 'কীর্তন'। শ্রীপাদ গোপালভট্ট ও শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী প্রভৃতি এই এই অর্থ গ্রহণ করেছেন সেকথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং তালে, রাগে, বৃত্তে, রসে ও ভাবে সম্পৃক্ত ক'রে শ্রদ্ধা-ভক্তিতে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে যশোগানকেই বাঙলার বৈষ্ণবসমাজ 'কীর্তন' আখ্যা দিয়েছেন।[১] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্তিত 'নামগান' বা সংকীর্তনের পর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনলীলার রসায়িত লীলাবিষয়বস্তুকে নিয়ে পরবর্তীকালে ঠাকুর নরোত্তম-প্রবর্তিত কীর্তনগান তথা লীলাকীর্তন রসকীর্তনে পরিণত হয়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে খেতরীর মহোৎসবে যে বিরাট বৈষ্ণব-সম্মিলনের আযোজন করা হয়েছিল তাতে ঠাকুর নরোত্তমদাস 'গৌরচন্দ্রিকা'-র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবপদগানের ঠাটে বা গঠনে বিলম্বিত লয়ে পদাবলীকীর্তনের প্রবর্তন করেন এবং তাঁর সেই কাজে সহায়ক ছিলেন বাদক গৌরাঙ্গদাস ও দেবীদাস, দোহার শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ এবং আরও অনেক বিদগ্ধ বৈষ্ণব-মহাজনগণ। ঠাকুর নরোত্তমদাস-প্রবর্তিত কীর্তনশৈলী গড়ের বা গরাণহাটি নামে পরিচিত ছিল এবং বাঙলার বিদগ্ধ বৈষ্ণবাচার্যেরা সমবেত হয়ে অভিজাত ও বিলম্বিত লয়ে কীর্তনগানের সেই পদ্ধতি সাদরে ও শ্রদ্ধায় অনুমোদন করেন।

অনেকের অভিমত যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্তিত নামগান বা নামকীর্তনই ঠাকুর নরোত্তমদাস-প্রবর্তিত রসকীর্তনরূপ রাধাকৃষ্ণলীলাসম্পৃক্ত পদাবলী-কীর্তনের উৎস বা উত্তরসূরী। কিন্তু তা ঠিক নয়, কেননা বৈষ্ণব-পদাবলী-কীর্তনের গঠনশৈলী ও প্রকাশভঙ্গী ও সঙ্গে সঙ্গে কবি জয়দেব-রচিত 'গীত-গোবিন্দ'-পদগানের রসলালিত্যপূর্ণ রচনা ও প্রকাশভঙ্গীর তুলনামূলকভাবে অনুশীলন করলে দেখা যায়, কীর্তনগানের রূপ ও শৈলী নবম-দশম শতকে প্রচলিত ব্রজযানী ও সহজযানী বৌদ্ধাচার্যদের আভিপ্রায়িক সন্ধ্যাভাষায় রচিত মিষ্টিক চর্যাপদগান ও বজ্রগানও কীর্তনগানের উৎসস্থল। তাছাড়া কীর্তনগান ও গীতগোবিন্দগান এই উভয় গীতিরূপ ও গীতরীতির তুলনামূলক (comparative) অনুশীলন করলে দেখি যে, এই উভয় শ্রেণীর গানই

১। 'কীর্তন' বা 'সংকীর্তন'-এর সংজ্ঞা ও রূপ-সম্পর্কে এ'গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বিশেষভাবে আলোচিত হবে। 'সংকীর্তন'-শব্দটি ভণিতা অর্থে ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও পাওয়া যায়।

দু'রকমভাবে পূজা ও উপাসনা বা আরাধনার ভাব নিয়ে রচিত এবং এই দু'রকম ভাব হোল বিধিমার্গ ও মাধুর্যরসাস্বাদনের জন্য। 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের পরমনায়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি গান বা কীর্তনের প্রাণকেন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণই সর্বরসের শিরোমণি শৃঙ্গাররসমূর্তি। বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রাণকেন্দ্র তাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রধান রস কামগন্ধহীন উজ্জ্বলবেশাত্মক শৃঙ্গাররস।

পরবর্তী যুগে দেখা যায়, বৈষ্ণব-পদকর্তাগণ কীর্তনগানে রসাস্বাদনের বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রভূমি রচনা করেন শুধুই শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে নয়, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়কে নিয়েই। কীর্তনগানের নায়ক-নায়িকাভেদসম্পৃক্ত রসভাবস্নিগ্ধ পালাগান—মান, দান, খণ্ডিতা, মাথুর, রাস, কলহন্তারিতা, নৌকাবিলাস প্রভৃতি শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপের বিচিত্র লীলাকাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছিল। ভক্তিরস ও ভক্তিতত্ত্বই কীর্তনের প্রাণবস্তু। অনেকের বিশ্বাস যে, সে ভক্তিরস ও ভক্তিতত্ত্ব বাঙলার বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণতত্ত্বরূপ ভক্তিভাবেরই বিকাশ। কিন্তু কোন কোন মনীষী এ'সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। তাঁরা বলেন যে, রাধকৃষ্ণতত্ত্বরূপ ভক্তিতত্ত্বের প্রচলন কবি জয়দেব ও শ্রীচৈতন্যের পূর্বেও ভারতীয় সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ডক্টর সুশীলকুমার দে ***Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal*** (1942) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : "Long before Chaitanya, the melodious *Padavalis* of Jayadeva in Sanskrit and the songs of Chandidas in Bengal had also popularized the Radha-Krishna cult with their largest Vaishnava devotional sentiments. Even if Chaitanya's religious personality started a new movement or gave a new interpretation to an old faith, his affiliation to the whole trend of Vaishnava tradition of the past cannot be doubted, and its influence on him must have been varied and abundant"। ডক্টর সুশীলকুমার দে পুনরায় লিখেছেন : "A Chaitanyite Vaishnava would regard the *Gitagovinda* not merely as a poetical composition of great beauty, but also as a great religious work, and would feign explain it in terms of his *Bhakti-rasa-*

shasha. But it must not be forgotton that Jayadeva's poem was composed nearly three hundred years before the appearence of Chaitanya and before the promulgation of the *Rasa-shastra* of Chaitanyaism"। বাদানুবাদ ও মতভেদের কথা ছেড়ে দিলে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে, বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তন বাঙলার বৈষ্ণব-ধর্মে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণতত্ত্বকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করছে এবং তাব সঙ্গে গ্রহণ করেছে জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ'-পদগানে নিহিত ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভাবমাধুর্যপূর্ণ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনী—যদিও বৌদ্ধ-চর্যা ও বজ্র-গীতির ভাবসম্পদ তাঁতে অনুপ্রবিষ্ট বা অনুবিদ্ধ।

ভক্তিতত্ত্বের প্রাচীনতা-সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখি যে, প্রাচীন পঞ্চ বা পাঞ্চরাত্রসংহিতা ও পুরাণাদিতে উল্লিখিত ভক্তিতত্ত্ব এবং দক্ষিণ-ভারতের আড়্বার ও তামিলীয় সাধকগণের ভক্তিসঙ্গীতগুলি ভারতের পরবর্তী ভক্তি-সাহিত্য ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমসাধনারীতিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত ও প্রেরণাদীপ্ত করেছিল। বিশেষক'রে পাঞ্চরাত্রসংহিতাগুলিতে উল্লিখিত ধর্ম ও তত্ত্বের ধারণা যে বেশ প্রাচীন তা ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত ও শতপথব্রাহ্মণাদিতে নারায়ণোপাসনা ও সাত্বতকর্মাদির উল্লেখ প্রমাণ করে। মহাভারত, হরিবংশ, অহির্বুধ্নসংহিতা, ঈশ্বরসংহিতা, সাত্বতসংহিতা প্রভৃতিতে সাত্বতধর্মের আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। ভাগবতপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব লীলার কথা বর্ণিত আছে। স্যর আর. জি. ভাণ্ডারকার তাঁর *The Vaishnavism, Saivism and Minor Religions System* এবং অধ্যাপক এস. কে. আয়াঙ্গার *Early History or Vaishnavism in South India* গ্রন্থে আড়্বার, বা আল্বার কুলশেখর-কৃত 'মুকুন্দমালা' গ্রন্থ থেকে রাধা (নাপ্পিন্নাই), কৃষ্ণ ও গোপীগণের প্রেমলীলার কথা ও কাহিনীর উল্লেখ করেছেন যে, দক্ষিণ-ভারতে ও উত্তর-ভারতেও সেই ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তি-সাধনার যে প্রচলন ছিল তা শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবশাস্ত্রে কথিত ভক্তিতত্ত্ব ও ভাগবতসাধনা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাচীন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণকালে আড়্বারদের ভক্তিভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর

A History of Indian Philosophy (Vol. III) গ্রন্থে 'আড়্বার'-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "With Arvars we notice for the first time the comming into prominence of a idea which achieved its culmination in the lives and literature of the devotees of the Gaudiya school of Bengal, and perticularly in the life of Chaitanya * * ।" তাছাড়া উত্তর-ভারতে শুধু কেন, সমগ্র ভারতে ভক্তিতত্ত্বের মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত যে পাঞ্চরাত্রসংহিতা ও ব্রহ্মবৈবর্তাদি প্রাচীন পুরাণগুলিতে বর্ণিত ভাগবতধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে স্বীকৃত। ডক্টর এফ. অটো স্রেডার এ'সম্পর্কে বিশেষভাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন : "* * Pancharatra worship seems to have existed as early as the first century before Christ"; অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতকের সমাজেও পাঞ্চরাত্রের ভাগবতধর্ম ও তত্ত্ব বর্তমান ছিল ! 'পাঞ্চরাত্র'-সংহিতার নাম পাঁচটি 'রাত্র' বা জ্ঞানবিভাগকে নিয়ে সার্থক ও সে পাঁচটি রাত্র হোল তত্ত্ব, মুক্তিপ্রদ, ভক্তিপ্রদ, যৌগিক ও বৈশেষিক। 'তত্ত্ব' অর্থে সৃষ্টি, 'মুক্তিপ্রদ' অর্থে পরমশান্তি, 'ভক্তিপ্রদ' অর্থে পরাভক্তি বা পরমা-শ্রদ্ধা, 'যৌগিক' অর্থে যোগসাধনপদ্ধতি ও 'বৈশেষিক' অর্থে ইন্দ্রিয়ের বিষয়। পাঞ্চরাত্রের 'রাত্র' শব্দ তন্ত্র ও সংহিতা নামের পর্যায়ভুক্ত। দার্শনিক দৃষ্টিক্ষেত্রে পাঞ্চরাত্র ভগবান বিষ্ণু বা নারায়ণের পাঁচটি দিব্যবিকাশ—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও আর্যা। পাঞ্চরাত্রে সংকর্ষণাদি ব্যূহ বা দিব্য-প্রকাশাদির উল্লেখ আছে। শ্রীভগবানের পাঁচটি প্রকাশ বিষ্ণুর দিব্য-এষণা বা ইচ্ছা—যাকে পাঞ্চরাত্রসংহিতায় 'সুদর্শন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অধিকাংশ মনীষীর অভিমত যে, পাঞ্চরাত্রতত্ত্বের সৃষ্টিক্ষেত্রে উত্তর-ভারত (North India) এবং ক্রমে তার প্রসার হয় দক্ষিণ-ভারতে ('to the South')। অবশ্য পাঞ্চরাত্রসংহিতার ও পাঞ্চরাত্রতত্ত্বের সৃষ্টি বা উদ্ভব ভারতের যেখানেই হোক, পাঞ্চরাত্র যে প্রাচীন ও শ্রীমদ্ভাগবত ও পরবর্তী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনগুলি যে পাঞ্চরাত্রের কাছে বিশেষভাবে ঋণী এ'বিষয়ে কোন মতদ্বৈত নাই।

পরবর্তীকালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মে রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের সঙ্গে গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জীবনতত্ত্ব সম্পৃক্ত হয়ে বাঙলার ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তিসাধনা যে একটি নূতন

ভাবে ও আকারে পরিণত হয়েছিল তা প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামী, সনাতন-গোস্বামী প্রভৃতির দার্শনিকতত্ত্বের বিশ্লেষণভঙ্গী লক্ষ্য করলে সহজে অনুমান করা যায়। তাছাড়া ষোড়শ শতকে ঠাকুর নরোত্তমদাস-প্রবর্তিত কীর্তনপদ্ধতির সঙ্গে 'গৌরচন্দ্রিকা'-র প্রবর্তনও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও গৌরাঙ্গতত্ত্বের মধ্যে একটি অপরূপ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল।

একথা ঠিক যে, বাঙলার পদাবলীকীর্তন বিশেষভাবে ঋণী ঠাকুর নরোত্তমদাসের কাছে, কেননা বৃন্দাবন-অঞ্চল থেকে উত্তর-ভারতীয় অভিজাত বা ক্ল্যাসিকাল ধ্রুবপদগানে শিক্ষালাভ ক'রে ষোড়শ শতকে খেতরীর মহোৎসবে সকল বৈষ্ণবাচার্যদের সম্মুখে যে পদাবলীকীর্তনের রূপ ও শৈলী প্রবর্তন করেন তা ভারতীয় সঙ্গীতসাধনায় ক্ষেত্রে একটি অভিনব দান। গরাণহাটিপদ্ধতিতে বিলম্বিত লয়ে শুদ্ধরাগভিত্তিক কীর্তনগান তখন বাঙলার গুণীসমাজের চিত্তকে আকর্ষণ করেছিল তার উল্লেখ পূর্বে করেছি। গরাণহাটি-পদ্ধতির পর প্রতিভার অবদানরূপে ক্রমশ মনোহরসাহি, রাণিহাটি (রেণেটি), মন্দারিনী ও ঝাড়'ণ্ডী প্রভৃতি পদ্ধতিরও সৃষ্টি হয়েছিল। শোনা যায়, মেদিনী-পুরের অন্তবর্তী ঝাড়খণ্ড থেকে উদ্ভূত কীর্তনগীতরীতির প্রকাশ ও শৈলী ছিল একটু ভিন্ন রকমের। বিচিত্র ধারা বা পদ্ধতিকে নিয়ে পদাবলীকীর্তনের রূপ ও বিকাশ বাঙলাদেশের সমাজে সমাদর লাভ করেছিল বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল কেবল রূপে ও বিকাশে, নচেৎ সকলেরই প্রাণবস্তু ছিল রাধাকৃষ্ণলীলাকাহিনী ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের রূপায়ণ ও আস্বাদন। 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের ঐতিহাসিক আলোচনায় দেখি যে, সমগ্র 'গীতগোবিন্দ' দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত এবং প্রতিটি সর্গ ছিল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলামাধুর্যে পূর্ণ। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন সকল পদগানের নায়ক। ঠিক ঐ ধরণের রূপ ও প্রকৃতি লক্ষ্য করি আমরা বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের বিচিত্র পদ-রচনায় ও শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়ক পালাগানগুলিতে। পদাবলী-কীর্তনের সকলগুলি পালাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অপার্থিব লীলার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তারা রস ও ভাবের অপূর্ব সঙ্গমক্ষেত্র। স্বামীপাদ রূপ-গোস্বামী, কবি-কর্ণপুর, পীতাম্বরদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব-আলঙ্কারিকগণ-রচিত 'উজ্জ্বল-নীলমণি', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'অলঙ্কারকৌস্তুভ', 'রসমঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে পদগানগুলিতে রস ও ভাবের লীলায়িত বিচিত্র বিকাশের

পরিচয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। নায়ক-নায়িকাভেদের অপরূপ রূপায়ণের তুলনা নাই! তাছাড়া বিশেষভাবে কবি জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের পদগানগুলির অনুশীলন করলেই দেখা যায়, কেবলই টীকাকার পূজারী-গোস্বামী ও রাণা কুম্ভাই পদগুলিতে রাগের, তালের, রসের ও ভাবের লীলায়িত বিকাশের কথা বলেন নি, অন্যান্য টীকা ও ভাষ্যকারগণও গীত-গোবিন্দের পদগুলিতে রস ও ভাব প্রভৃতির প্রসঙ্গ ব্যতীত বিচিত্র নায়ক-নায়িকার সমাবেশ, ভেদ ও তাদের রসায়িত ভাবব্যঞ্জনার কথা উল্লেখ করেছেন। একথাও সত্য যে, গীতগোবিন্দের পদগানে লীলায়িত যে সকল রস ও ভাবের সমাবেশ দেখি, তাদেরই নিঃসন্দেহে ও নির্বিচারে গ্রহণ করা হয়েছে পদাবলীকীর্তনের লীলাসম্বলিত পালার পদগানগুলিতে। বিদগ্ধ বৈষ্ণব-গোস্বামীরা কীর্তনের পদগানে শৃঙ্গাররসকেই প্রধান বা মুখ্য রস বলে গ্রহণ করেছেন, কেননা শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বলবেশাত্মক মহিমোজ্জ্বল আদিরস শৃঙ্গাররসের প্রতিমূর্তি—যদিও অন্যান্য রসের উচ্ছল বিকাশ তার মধ্যে দেখা যায়। বৈষ্ণব-আচার্যেরা শৃঙ্গাররসকে আবার বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ এই দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। বিপ্রলম্ভ পুনরায় পূর্বরাগ, মান, প্রেমবিচিত্য ও প্রভাস, এবং সম্ভোগরস সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ, সংকীর্ণ-সম্ভোগ, সম্পন্ন-সম্ভোগ ও সমৃদ্ধ-সম্ভোগ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত। তাছাড়া রসসম্পৃক্ত ভাবের সমাবেশের সঙ্গে অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহন্তারিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, ও স্বাধীনভর্তৃকা প্রভৃতি নায়িকা-ভাবেরও বিকাশ দেখা যায় কীর্তনের পদগানে। মোটকথা ৮×৮=৬৪ (চৌষট্টি) রসের ও বিচিত্র ভাবের সমাবেশ নিয়ে পদাবলীকীর্তনগান বাঙলার রসলোলুপ বিদগ্ধ সমাজে প্রচলিত। খ্রীষ্টীয়-দ্বিতীয়-পঞ্চম শতকে প্রাচীন নাট্যকারের সংখ্যা অনেক, তবে প্রসিদ্ধ নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা মুনি ভরতের নামই উল্লেখযোগ্য। নাট্যশাস্ত্রে আটটি প্রধান রসের এবং ভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারি প্রভৃতি ভাবের পরিচয় আছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত শৃঙ্গাররসকেই প্রধান বা আদিরস বলেছেন এবং সেই শৃঙ্গাররস বিশ্বসৃষ্টির মূলকারণ। 'একোহং বহু স্যাম'—'আমি এক আছি, বহু হব' এই সিসৃক্ষারূপ কাম, কামনা বা ইচ্ছাই উজ্জ্বল শৃঙ্গাররস থেকে উদ্ভূত। আচার্য অভিনবগুপ্ত বিস্তৃতভাবে 'অভিনবভারতী' নামে নাট্যশাস্ত্রের

ভাষ্য রচনা করেছেন এবং সে ভাষ্যে নাট্যশাস্ত্রের ভাব ও রসবস্তুর বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তী বৈষ্ণবাচার্যেরা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের কাছে বিশেষভাবে ঋণী—যদিও ভরতের পরবর্তীকালে বহু রসশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র-রচয়িতাদের আবির্ভাব ঘটেছিল।

বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনে পালাগানের অভিব্যক্তির পিছনেও 'গীত-গোবিন্দ'-পদগানের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। তাছাড়া কীর্তনে মাথুর, দান, রাস প্রভৃতি পালাগানের পিছনে দেখি গীতগোবিন্দের ঐ সম্পর্কে ধারণা—

(ক) 'বিহরতিহরিরিহ সরস-বসন্তে' প্রভৃতি (—গীতগোবিন্দ ১।২৮);

(খ) 'বৃন্দাবন-বিপিনে পরিসর-পরিগত যমুনাজল' প্রভৃতি (১।৩৪);

(গ) 'রাসরসে সহ নৃত্যপরা-হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে' প্রভৃতি (১।৪৫);

(ঘ) 'বৃন্দাবন-বিপিনে ললিতং বিতনোতু' প্রভৃতি (১।৪৭);

(ঙ) 'বিহরতি বনে রাধা সাধারণ প্রণয়ে হরৌ' প্রভৃতি (২।১০);

(চ) 'যুবতিষু বলতৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহরিণী—মাম্ বিনা' প্রভৃতি (২।১৯);

(ছ) 'গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং' প্রভৃতি (২।১৯);

(জ) 'ধীর-সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী' প্রভৃতি (৫।৯);

(ঝ) 'হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্' প্রভৃতি (৮।২);

(ঞ) 'স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি-মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারম্' প্রভৃতি (১০।৯)।

এ'ভাবে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে, পদাবলীকীর্তনের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাসম্পৃক্ত পালাগানগুলি বৈষ্ণব-মহাজনেরা গীতগোবিন্দে বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীকে অবলম্বন করে রচনা করেছিলেন। তাছাড়া কীর্তনগানের দ্বাদশটি তত্ত্ব—যুগলরূপ, প্রকাশ এবং বিলাস ও রসাস্বাদন, পারস্পরিক ভজন; ভক্ত ও ভগবান; সাধ্য, সাধনা ও পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, মিলন ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব গীতগোবিন্দপদগানেও পাওয়া যায়। পুনরায় 'প্রৌঢা, মধ্যা ও মন্দা—প্রেমের এই তিন অবস্থাও গীতগোবিন্দের ও পদাবলীকীর্তনের সাধারণ অঙ্গবিশেষ। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গুণরাজ খাঁ, রায় রামানন্দ, মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ,

বাসুদেব ঘোষ, রূপ গোস্বামী, বসু রামানন্দ, যদুনাথদাস, বংশীদাস, বলরামদাস প্রভৃতি বিদগ্ধ পদকর্তাগণ যে পদাবলীকীর্তনের বিষয়বস্তুযুক্ত অসংখ্য পদ রচনা করেছেন, সে সকল রচনার পিছনে গীতগোবিন্দের যে প্রেরণা ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে কবি জয়দেব যে শৃঙ্গাররসাত্মক শ্রেষ্ঠ পদরচয়িতাদের অন্যতম তা সর্বজনস্বীকৃত। তাছাড়া পদের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকা শ্রীরাধা গীতগোবিন্দে যেভাবে অপার্থিব ও অপরূপভাবে রূপায়িত, অনেকের অনুমান যে, কবি ঐ পরমনায়ক ও পরমনায়িকার রূপসজ্জার ধারণা লাভ করেছিলেন দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে সেন-রাজাদের মধ্যে প্রচলিত বৈষ্ণব-ভক্তিসাধনার ভাব থেকে। তাছাড়া ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখিছেন : "Some are of the opinion that the advent of the Karnatas in Bengal with the Chedi prince Karnadeva introduced the *Shrimadbhagavata* emotionalism, which had its most probable origin in Southern India ; and it is notworthy that the Sena kings themselves, who were in all probability Vaishnavas, are described in the inscriptions as Karnata-Kshatriyas. There can be no doubt, however, that the first and the most important literary record of pre-Chaitanya Vaishinism in Bengal is the passionate lyrical poem of Jayadeva, which must have been the source of inspiration of such later Bengali poems as the *Shrikrishna-Kirtana* of Badu Chandidas (*Circa*, end of the fourteenth century)"। এ' প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শুধুই বড়ু চণ্ডীদাস নন, পরবর্তী বৈষ্ণবমহাজন-রচয়িতারা কীর্তনের পদ বা পদসাহিত্য রচনা করেছেন গীতগোবিন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। তাছাড়া একথাও সত্য যে, বৈষ্ণবাচার্য জীব-গোস্বামীও গীতগোবিন্দে-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি'-রসগ্রন্থে রাধা-প্রকরণে শ্রীরাধার রূপ, রস ও ভাবের মাধুর্য বর্ণনা করেছেন অপরূপভাবে। গীতগোবিন্দের সখী, গোপী ও দূতী প্রভৃতি চরিত্রও যেভাবে গীতগোবিন্দপদগানে রূপায়িত হয়েছে, ঠিক সেভাবেই রূপায়িত দেখি পরবর্তী পদাবলীকীর্তনে।

সুতরাং কবি জয়দেব-রচিত ‘গীতগোবিন্দ’ ও বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তন এই উভয়ের পদসমাবেশ ও পদলালিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, দ্বাদশ শতকেব শেষার্ধে রচিত শৃঙ্গাররসকাব্য ‘গীতগোবিন্দ’ বিশেষভাবে বৈষ্ণব-পদকর্তাগণ-রচিত পদবলীকীর্তনের সাহিত্য, সঙ্গীত ও ভাব-রূপায়ণকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। তাছাডা গীতগোবিন্দের পদগানের পটভূমিকাও যে রচিত হয়েছিল বৌদ্ধ-চর্যাগীতির গায়নরীতি ও প্রকাশশৈলীব ভাব গ্রহণ ক'রে একথা অস্বীকার করা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

১। স্বামী অভেদানন্দ : Bhagavad Gita, the Divine Massage, vols. I and II

২। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য : বঙ্গীয়-লোকসঙ্গীত-রত্নাকর, ১ম-৪র্থ ভাগ (নিউ দিল্লী সঙ্গীত-নাটক একাডেমীর সৌজন্যে প্রকাশিত)।

৩। শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ : সহস্র-পদাবলী (বলরাম-ধর্মসোপান থেকে প্রকাশিত।

৪। মুনি ভরত :

(ক) নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ),

(খ) ঐ (অভিনবগুপ্তের 'অভিনবভারতী'-সহ, বরোদা-সংস্করণ

(গ) ঐ (বোম্বাই সংস্করণ),

(ঘ) ঐ (এশিয়াটিক সোসাইটী সংস্করণ),

(ঙ) ঐ ইংরাজী অনুবাদ, ১ম ও ২য় ভাগ, ডক্টর মনোমোহন ঘোষ-কৃত ইংরাজী অনুবাদ।

৫। শার্ঙ্গদেব :

(ক) সঙ্গীত-রত্নাকর (কাল্লনাথের টীকাসহ, বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণ),

(খ) ঐ ১ম-৪র্থ (থিয়োসফিক্যাল সোসাইটী, আডেয়ার সংস্করণ)।

৬। রাণা কুম্ভা :

(ক) সঙ্গীতরাজ৩, ১ম খণ্ড, ডঃ প্রেমলতা শর্মা-সম্পাদিত (বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)।

(খ) 'রসিকপ্রিয়া'-টীকা (গীতগোবিন্দের)—বোম্বাই সংস্করণ।

৭। পণ্ডিত সোমনাথ : রাগবিবোধ (থিয়োসফিক্যাল সোসাইটী, আডেয়ার সংস্করণ)।

৮। ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তী :

(ক) 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ', edited with English Introduction

and notes by Swami Prajnanananda (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত)।

(খ) গীতচন্দ্রোদয়—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক সম্পাদিত (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত)।

(গ) গৌরচরিত্রচিন্তামণি।

৯। পার্শ্বদেব : সঙ্গীতসময়সাব (ত্রিবাদ্রম থেকে প্রকাশিত)।

১০। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ :

(ক) ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড (শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠ, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত)।

(খ) রাগ ও রূপ, ১ম ও ২য় ভাগ (শ্রীবামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত)।

(গ) A History of Indian Music, part I (pubished from R. K. Vedanta Math, Calcutta).

(ঘ) Historical Development of India Music (especially the chapter on 'Padavali-Kirtan of Bengal').

(ঙ) Historical Study of Indian Music (Anandadhara Publication, Calcutta).

(চ) শ্রীদুর্গা (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত, মঠ থেকে প্রকাশিত)।

১১। বলরামদাসের পদাবলী—ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য-সম্পাদিত।

১২। ডক্টর সুকুমার সেন :

(ক) বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (১৩৪৭);

(খ) চর্যাগীতি-পদাবলী (১৯৫১)

(গ) History of Bengali Literature (published by Sahitya Academy, New Delhi).

১৩। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ (শান্তিনিকেতন, ১৩৫১ সাল)।

১৪। সন্ধ্যাকর নন্দী : রামচরিত (বঙ্গীয় সংস্কৃত-পরিষৎ, কলিকাতা)।

১৫। গোবর্ধন আচার্য : আর্যাসপ্তসতী (বোম্বাই)।

১৬। শ্রীধরদাস: সদুক্তিকর্ণামৃত (এশিয়াটিক সোসাইটি-কর্তৃক প্রকাশিত)।

১৭। সাতবাহনরাজ হাল: 'গাথাসপ্তশতী'—ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক-সম্পাদিত।

১৮। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত:

(ক) Obscure Religious Cults, (১ম, সংস্করণ, Calcutta University)

(খ) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে (এ. মুখার্জী, কলিকাতা প্রকাশিত)।

(গ) বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি (১৩৭৬ সাল)

১৯। অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়:

(ক) চর্যাগীতি (বিশ্বভারতী, ১৩৭২)।

(খ) বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীন পর্ব (১ম সংস্করণ)।

২০। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম—৩য় খণ্ড (এ. মুখার্জী-প্রকাশিত)।

২১। মনীন্দ্র মোহন বসু: চর্যাপদ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

২২। Nagendranath Basu:

(ক) Archaeological Survey of Mayurbhanja, (1911)

(খ) Introduction to the Modern Buddhism and Its Followers in Orissa.

২৩। Dr. Herman Oldenburg: Buddha, His Life, Doctrine, His Order (Chakravarty and Chatterjee Company, Calcutta).

২৪। শশীভূষণ দে: শ্রীরামকৃষ্ণ (উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার)।

২৫। হঠযোগপ্রদীপিকা (included in the 'Serpent Power' by Sir John Woodroff).

২৬। ডক্টর কল্যাণী মল্লিক: নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়- ১৯৫০)।

২৭। ম:ম: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী :

(ক) বৌদ্ধগান ও দোঁহা (১ম সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)।

(খ) অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ: (মম: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত, বরোদা সংস্করণ)।

(গ) Two Vajrayana Works (ম:ম: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত, G. O. C., No XLIV).

২৮। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য :

(ক) An Introdution to Buddhist Esoterism (Oxford),

(খ) সাধনমালা, ১ম ও ২য় খণ্ড (বরোদা-সংস্করণ)।

২৯। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ :

(ক) বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম খণ্ড, (ঢাকা, ১৯৫৩),

(খ) Buddhist Mystic Songs (Dacca University Studies, Vol. I, Jan. 1940).

৩০। Dr. Probodh Chandra Bagchi : Studies in Tantra, pt. I (Calcutta University 1939).

৩১। Indian Historical Quarterly, vol. IV 1929.

৩২। Indian Historical Quarterly, vol. II Dec. 1926.

৩৩। Edward J. Brown :

(ক) Literary History of Persia, vols. I—II.

(খ) Derbish (Oxford)

৩৪। Dr. Charu Charan Dasgupta : Paharpur and Its Monuments (K. L. Mukhopadhyay, 1961).

৩৫। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় :

(ক) কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ (৩য় সংস্করণ ১৩৬২),

(খ) পদাবলী-পরিচয়।

৩৬। নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : মন-মধুকর (আনন্দধারা-প্রকাশন, কলিকাতা)।

৩৭। G. S. Ghurye : Bharatanatya and Its Costumes (Poona, 1958).

৩৮ কবি কহ্লন : রাজতরঙ্গিণী (English Translation, vols. I & II, edited by M. A. Stein. (1961), published by Motilal Benarasi Dass, Delhi).

৩৯। সেকশুভোদয়া—edited by Dr. Sukumer Sen.

৪০। Aychiyar Kauryvai : Gitagobinda and its Abhinaya (edited by Vasudeva Sastri, Tanjore Sarasvati Mahal Library).

৪১ Dr. Krishnamachariar : History of Classical Sanskrit Literature (Poona, 1967).

৪২। Dr. Susil Kumar De :

(ক) নানা-নিবন্ধ (১ম সংস্করণ, ১৯৫০),

(খ) Sanskrit Literature (in Indian Studies, Past and Present, vol. I, No1).

(গ) Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal, (General Printers, 1942),

(ঘ) Pre-Chaitanya Vaishnavism in Bengal (Calcutta).

৪৩ নায়িকারত্নমালা edited by সতীশচন্দ্র রায়।

৪৪ পীতাম্বরদাস : রসমঞ্জরী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা),

৪৫ ভানুদত্ত : রসমঞ্জরীর পদ্যানুবাদ (মডেল লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩২০)।

৪৬ ভারতচন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী (বিশেষ ক'রে 'রসমঞ্জরীর' পদ্যানুবাদ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির)।

৪৭ ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় : পঞ্চোপাসনা (K. L. Mukhopadhyay, Calcutta).

৪৮ Dr. Hemchandra Raychaudhury : Material for the Study of the Early History of the Vaishnava Sects (2nd edition).

৪৯। Dr. S. N. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, Vol I (George Allen and Co, 1932).

৫০। গোবিন্দাচার্য :

(ক) The Divine Wisdom of the Dravida-Saints (Eng. Trans).

(খ) The Holy Lives of the Alvars, Madras.

৫১। Gopinathji : Sir Subramanya Ayyar Lectures (1923)

৫২। S K. Ayengar : Early History of Vaishnavism in South India, Calcutta.

৫৩। I. S. M. Hoopar : Hymns of the Alvars, London.

৫৪। Farquier : An Outline of the Religious Literature of India (Oxford, 1926).

৫৫। Dr. B. N. Dutt : Rise of Gaudiya-Vaishnavism in Bengal (Prachyavani, vol. II, July-Octo, 1945).

৫৬। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার : ষোড়শ-শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য কলিকাতা ১৯৬১)।

৫৭ নীল রতন মুখোপাধ্যায় : চণ্ডীদাসের পদাবলী, কলিকাতা।

৫৮। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

৫৯। অধ্যাপক শ্রীবিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১৯৫৭)।

৬০। শ্রীঅমিয়রতন বন্দোপাধ্যায় : বাঁকুড়ার মন্দির (১৩৭০)।

৬১। লীলাশুক-বিল্বমঙ্গল : শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—edited by Dr. Biman Behari Mazumdar (জিজ্ঞাসা, ১৯৬৬)।

৬২। অধ্যাপক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : গিরিশপ্রতিভা, কলিকাতা।

৬৩। ডক্টর বাসন্তী চৌধুরী : বাঙলার বৈষ্ণব-সমাজ, সঙ্গীত ও সাহিত্য (১৯৬৮)।

৬৪। শ্রীব্রহ্মসংহিতা—শ্রীজীব-গোস্বামী-কৃত টীকাসহ, প্রকাশক—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্দাবন)।

৬৫। দামোদরগুপ্ত : কুট্টনীমতকাব্যম্, edited by Madhusudan Kaul (Asiatic Society of Bengal, Calcutta).

৬৬। কবীন্দ্রসমুচ্চয় (সংগ্রহ-গ্রন্থ)—published by Asiatic Study of Bengal, Calcutta.

৬৭। শ্রীধরদাস : সদুক্তিকর্ণামৃত—edited by Ramavrata Sharma (Asiatic Society of Bengal Calcutta).

৬৮। ভর্তৃহরি : শৃঙ্গারশতক (Bombay),

৬৯। অমরুশতক—edited by Dr. S. K. De (published in 'Haritage', Sanskrit College, Calcatta).

৭০। আনন্দবর্ধন : ধ্বন্যালোক (বাংলা—শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত সম্পাদিত)।

৭১। ভট্টনারায়ণ : বেণীসংহার (বোম্বাই)।

৭২। কুন্তক : বক্রোক্তিজীবিত (বোম্বাই)।

৭৩। সোমদেব সুরি : যশস্তিলক (in English)

৭৪। রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র : নাট্যদর্পণ (বোরাদা সংস্করণ)।

৭৫। ভেজ্জল কবি : রাধা-বিপ্রলম্ভ (নাটক)।

৭৬। সারদাতনয় : ভাবপ্রকাশন (বরোদা গাইকোয়াড সিরিজ)।

৭৭। সাগর নন্দী : নাটকলক্ষণরত্নকোষ (বোম্বাই)।

৭৮। কবি জহ্লন : সূক্তিমুক্তাবলী (বোম্বাই)।

৭৯। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা ১ম ও ২য় ভাগ (published by Theosophical Society, Adyar, Madras).

৮০। সাত্বতসংহিতা (Adyar ed).

৮১। কবি ধোয়ী : পবনদূতম্ (কাব্যম)—published by Sanskrit Sahitya Parrishat, Calcutta.

৮২। গোপালভট্ট : হরিভক্তিবিলাস (বেঙ্কটেশ্বর পুস্তকালয়, বোম্বাই)

৮৩। শ্রীমদ্ভাগবতম্ edited by পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

৮৪। স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকর : The Vaishnavism and Minor Religious Systems (Bhadarkar Oriental Research Society, Poona).

৮৫। Dr. F. Otto Sheodar: Introduction to Pancharatra-Samihita (Thesophical Publishing House, Adyar, Madras)

৮৬। শ্রীজীব গোস্বামী: উজ্জ্বলনীলমণি, edited by হরিদাস দাস, নবদ্বীপ)।

৮৭। মৎস্যেন্দ্রনাথ: 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' (তন্ত্র) কলিকাতা।

৮৮। গুহ্যসমাজতন্ত্র (বৌদ্ধ)—ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, (বরোদা সংস্করণ)।